বাংলা রাজনৈতিক ছড়া

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তুষার নস্কর

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

Certified that the Thesis entitled

'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া' submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Ananya Baruya, Professor, Department of Bengali, Jadavpur university.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Ananya Baruya.

Supervisor:

Dated: 18.01.2021

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Pusar Naskar

Candidate:

Dated: 18.01.2021

কৃতজ্ঞতা

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পশ্চাতে থাকে তার পূর্ব প্রস্তুতি। এই গবেষণাপত্রটির প্রস্তুতি পর্বে যাঁরা আমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। কয়েকটি অক্ষরের সমাবেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়।

যাঁর নিপুণ তত্ত্বাবধান, সদা তৎপরতা, আন্তরিক সহায়তা এবং অকুণ্ঠ উৎসাহদান ব্যতীত আমি এই গবেষণাপত্রটি নির্মাণে সমর্থ হতাম না, এই গবেষণাপত্রটির পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে মুখ্য অবদান যাঁর, তিনি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়া। সর্বদা তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত আমার এই গবেষণা বর্তমান রূপ লাভ করত না। সে জন্য তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণতী নিবেদন করি। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক সৌমেন সেন মহাশয়কে, তিনি আমাকে এই কার্যে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে একজন গবেষক হওয়ার উপযুক্ত করে তুলেছেন।

এই গবেষণাপত্রটির রচনায় আমি যে সকল গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি, সেই সকল গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থাগারগুলি হল- বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার।

সবশেষে আমি ঋণ স্বীকার করি আমার বাবা, মা ও পরিবারবর্গের কাছে যাদের স্নেহ ও ভালোবাসায় আমি এ কাজ করতে সমর্থ হয়েছি। বিশেষত আমার স্ত্রী দেবিকা মণ্ডলের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, যার উৎসাহ ও সহায়তা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হত না। কিন্তু আমার দুঃখ আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব তাঁর জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে পারলেন না তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্নকে আমি বাস্তবায়িত করেছি। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শতকোটি প্রণাম।

তুষার নস্কর

(বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের প্রেক্ষিত।	৫-৫৭
১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।	
১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।	
দ্বিতীয় অধ্যায়- রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা।	৫৮-৬৭
২.১. রাজনীতি প্রচারের অন্যান্য মাধ্যম।	
২.২. গণমাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকা।	
তৃতীয় অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার।	৬৮-১৫১
৩.১. অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।	
৩.২. লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।	
ক. শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর।	
খ. অন্নদাশঙ্কর রায়।	
গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়।	
ঘ. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	
ঙ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়।	
চ. শঙ্খ ঘোষ।	
ছ. জয়দেব বসু।	
জ. বিবিধ।	

চতুর্থ অধ্যায়- নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)। ১৫২-২৫৯

৪.১. সাধারণ নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

৪.২. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭)।

৪.৩. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২)।

৪.৪. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭)।

৪.৫. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১।

৪.৬. তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬)।

পঞ্চম অধ্যায়- রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ। ২৬০-২৯২

৫.১. দেশভাগের প্রেক্ষিত।

৫.২. পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশ।

৫.৩. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ।

৫.৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া। ২৯৩-৩১৮

৬.১. ছন্দনৈপুণ্য

৬.২. কবিত্বগুণ

৬.৩. চিত্রকল্প

৬.৪. নান্দনিকতা

উপসংহার ৩১৯-৩২৪

পরিশিষ্ট ৩২৫-৩৩৬

পরিশিষ্ট-১: নির্বাচন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তালিকা ৩২৫-৩২৭

পরিশিষ্ট-২: রাজনৈতিক ছড়ার চিত্রপঞ্জি ৩২৮-৩৩৬

গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৭-৩৪৫

ভূমিকা

প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে আছে ছড়া। দু'বাংলাতেও অনুরূপভাবে ছড়িয়ে আছে প্রচুর সংখ্যক ছড়া। জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় যোগের কারণে ছড়ার মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-সমাজের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে; তেমনি চিত্রিত হয়েছে মানুষের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। ছড়া একই সঙ্গে অনেক গভীর আবার অত্যন্ত সরল ভাবনা বহন করে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে ছড়া শিশু মনোরঞ্জনের তাৎক্ষণিক তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে- এর ছন্দের দোলা, শব্দচয়ন, সবকিছুই বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু ছড়ার গভীরে যে এর চেয়ে অধিক বক্তব্য বিষয় ধরা থাকে তা ছড়া নিয়ে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত আলোচনায় বারংবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অন্তরের অকৃত্রিম আন্তরিকতা বশতই বাংলার লোকছড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আলোচনায় ব্রতী হয়ে ১৩০১ বঙ্গাব্দে রচনা করেছিলেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। 'ছেলেভুলানো ছড়া'র এমনতর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে রসিক বাঙালি পাঠকের নজরে পড়েনি। যতই যান্ত্রিক জীবনে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি ততই বৈচিত্র্যে-র সন্ধানে তো বটেই তাছাড়াও নিজেদের মূলের সন্ধানের তাগিদে লোকসংস্কৃতির শরণাপন্ন হয়েছি। সেই সুবাদে লোকসাহিত্যের চর্চা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লৌকিক ছড়ার বিবিধ বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। স্বভাবতঃই এই চর্বিতচর্বণে না গিয়ে আমরা একটি নতুন বিষয় নির্বাচন করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'।

বর্তমান গবেষেণাপত্রটি তৈরি হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভব ও বিকাশের পাশাপাশি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়াকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক ছড়াগুলি মূলত নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত হলেও এই সকল ছড়ার মধ্য দেশ-কাল-সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হল। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত ছড়ায় কিভাবে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ থেকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে তা আলোচিত হল। এই গবেষণার উদ্দেশ্য দুই বাংলার রাজনৈতিক ছড়ার ভাষা ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা এবং একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে ব্যবহার করেন কেন, তার কারণ অনুসন্ধান করা। এর জন্য আমরা গ্রহণ করব ক্ষেত্রানুসন্ধান ও তুলনামূলক পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহায্য নেওয়া হল নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পার্টি ইস্তেহার, দেওয়াল লিখন, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ইন্টারনেটের।

তবে আমাদের আলোচ্য রাজনৈতিক ছড়া আর লৌকিক ছড়া সমগোত্রীয় নয়, এই কথাটি প্রথমে স্পষ্ট করে বলা দরকার। লোকছড়া লোকসমাজের মৌখিক সৃষ্টি কিন্তু

রাজনৈতিক ছড়া কোন গোষ্ঠীর দ্বারা তৈরি হয় না এবং কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজনৈতিক ছড়া লেখাপড়া জানা মননশীল মানুষের লিখিত রচনা, যা গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচার ও প্রসার লাভ করে থাকে। রাজনৈতিক ছড়া শোষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য রচিত। জনমত গঠন এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল ছড়ার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবনা চিন্তা সবই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নির্মিত। তাই রাজনৈতিক ছড়াকে আমরা পরিশীলিত মনন ও চিন্তনের প্রকাশ বলতে পারি।

প্রথম অধ্যায় ‘রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের প্রেক্ষিত’। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের নানা প্রেক্ষিত। এর পাশাপাশি বাংলা লোকছড়ার সাথে রাজনৈতিক ছড়ার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে দুটি উপ-অধ্যায়ে বিভাজন করা হল- ১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছে তখন থেকেই বাংলায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত অনেক ছড়ায় রাজনৈতিক ইতিহাস ধরা পড়েছে, যা পর্যায়ক্রমে দুটি পর্বে আলোচনা করা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা'। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আধুনিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে ছড়ার মত প্রাচীন আঙ্গিকের ব্যবহার কতটা প্রাসঙ্গিক। এছাড়া রাজনৈতিক ছড়াগুলির গণমাধ্যম হিসাবে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা এবং একবিংশ শতাব্দীতে সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা সত্ত্বেও নির্বাচনের প্রাক্কালে দুই বাংলায় রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার সমান জনপ্রিয়, তার কারণ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হল।

তৃতীয় অধ্যায় 'রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার'। রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকারদের নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়টি। মূলত দু-ভাবে এই সকল ছড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে, যথা- অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের আগে দেওয়াল জুড়ে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লেখা হয়, তার রচয়িতার উল্লেখ থাকে না, স্বাভাবিকভাবে এই সকল ছড়ার রচয়িতাগণকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই সকল দেওয়াল লিখনের ছড়া নিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। মূলত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারদের নিয়ে এই অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত কয়েকজন

ছড়াকারকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল, তাঁরা হলেন- শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া আরও অনেকেই রাজনৈতিক ছড়া লিখেছেন বিশেষ করে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরী, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী.. প্রমুখ ছড়াকারগণের রচিত রাজনৈতিক ছড়া 'বিবিধে'র মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় 'নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)'। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম অংশে থাকবে স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা। দ্বিতীয় অংশে থাকবে ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রচিত রাজনৈতিক ছড়ায় সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ কিভাবে এসেছে তা আলোচিত হবে। দ্বিতীয় অংশের মূল আলোচনাটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হবে, যথা- ১. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭)। ২. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২)। ৩. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭)। ৪. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১)। ৫. বর্তমান তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬)। এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে ১৯৫২-২০১৬ পর্যন্ত সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শাসক ও বিরোধী দলের অবস্থান চিহ্নিত হবে। মূলত নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচার মাধ্যম হিসাবে আজও ছড়ার মত পরিচিত আঙ্গিককে ব্যবহার করেন? তার কারণ চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি এই সকল ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে যে, রাজনৈতিক ছড়ায় কেবল রাজনীতিই থাকে না, মাখামাখি করে থাকে ইতিহাস ও আর্থসামাজিক অভিঘাত।

পঞ্চম অধ্যায় 'রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ'। এই অধ্যায়ের আলোচনাকে আমরা বিভক্ত করতে চাই চারটি অংশে। যার প্রথম অংশে থাকবে দেশভাগের প্রেক্ষিতে রচিত রাজনৈতিক ছড়ার বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হবে পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশের জনজীবনে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, তা কিভাবে ছড়ার মধ্যে ধরা পড়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হবে রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। চতুর্থ অংশে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত আলোচিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া'। আগের অধ্যায়গুলির মত এই অধ্যায়টিকেও চারটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম অংশে থাকবে 'ছন্দনৈপুণ্য' এই সংরূপটিতে আলোচিত হবে রাজনৈতিক ছড়ায় ব্যবহৃত ছন্দ। দ্বিতীয় অংশে কবিত্বগুণ, চিত্রকল্প এবং

নান্দনিকতার নিরিখে রাজনৈতিক ছড়াগুলি কতটা সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তা আলোচিত হবে। পাশাপাশি এই সকল ছড়ার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে যা চিহ্নিত করা হবে।

বাংলা ছড়ার বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'র বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস আমরা করেছি। আমাদের এই প্রয়াস যদি পরবর্তীকালের গবেষণাকে সামান্যতমও ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করে তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক।

প্রথম অধ্যায়: রাজনৈতিক ছড়া উদ্ভবের প্রেক্ষিত।

১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

সংস্কৃতিকে আমরা সৃষ্টি বলে মানি আর লোকসংস্কৃতিকে পরম্পরাগত সৃষ্টি হিসেবে। এই যে দেখার তফাৎ, সংজ্ঞার বিভিন্নতা, ধারণার হেরফের তা যে সমাজ-সময় নিরপেক্ষ নয়, তা বোধ হয় আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সংস্কৃতির মানচিত্র নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাদের জানা হয়ে গেছে যে শুধু লোকসংস্কৃতিই নয়, সব সংস্কৃতিই পরম্পরাগত। কিছু সুবিধা হবে ভেবেই আমরা নানা বিভাজন করে থাকি, নইলে সবই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই থাকে মূল্যবোধের ও ভাবাদর্শের প্রসার, যার নানা ধাপ, যে ধাপ নির্ধারিত হয় সময় ও প্রতিবেশের চাপে এবং মূল্যবোধের প্রয়োগেই কাউকে বলছি সংস্কৃতি, ভদ্রজনের সৃষ্টি, কাউকে বলা হয় 'লোকসংস্কৃতি' যা পরিশীলিত নয়, ভদ্রজনের নয়। সাধারণ রাজনীতির সঙ্গী যে 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি' তাই-ই নির্দিষ্ট করে এই সব ধাপ-ধারণা ও অভিধার বিভাজন।

লোকসংস্কৃতিবিদদের জানার কথা যে লোকসংস্কৃতি আর শুধুই গ্রামীণ কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি নয়। লোকসংস্কৃতির মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় তো শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতিও গ্রাহ্য। কর্ম সঙ্গীত এখন স্বীকৃত লোকসঙ্গীত। মার্কসবাদ বিরোধী পণ্ডিতেরাও এটা মানতে বাধ্য হয়েছেন। আর প্রতিবাদী লোকসংস্কৃতি! তাতো শ্রমিক বলেই বেশি পাওয়া যাবে। সে কৃষি শ্রমিকই হোক বা কারখানার শ্রমিক। প্রথম যখন লোকসংস্কৃতির ক্রিয়া বা function আলোচিত হয় তখন প্রতিবাদ কিন্তু একটি ক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। পরে যুক্ত হয়েছে, যা আজ স্বীকৃত। কখন এই পরিবর্তন ঘটল? যখন গ্রাম শহরের সীমা ভেঙে যাচ্ছে, যখন শহুরে শ্রমিক শ্রেণি গড়ে উঠেছে, প্রতিবাদ জোরদার হয়েছে। সংস্কৃতি যে নিত্য পরিবর্তনশীল এবং নিত্য সৃষ্টিশীল তা আমরা অনেক সময় মানতে চাই না। মানলে লোক ও সংস্কৃতি উভয়েরই সংজ্ঞা পাল্টে যায়। এমনকি গ্রাম শহরের সীমানাও কি ভেঙে যায় না? উনিশ শতকে মূলত জাতীয়তাবোধের তাগিদে লোকসংস্কৃতি চর্চার শুরু। সঙ্গত কারণেই তা ছিল সংগ্রহের পর্ব, তুলে আনার, মর্যাদা দেওয়ার পর্ব এবং সেই তাগিদে কিছু পদ্ধতি, কিছু তত্ত্ব, কিছু সংজ্ঞার নির্মাণ ঘটে। আজ কিন্তু লোকসংস্কৃতিচর্চা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছে। সরতে বাধ্য, কারণ লোকসংস্কৃতিই নানা পরিবর্তনের মুখোমুখি। এই সত্য জানার ফলেই বদল হচ্ছে সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। আজকের চর্চায় এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা জানা চাই। এ প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন: "লোকসংস্কৃতির উদ্ভব শুধুমাত্র গ্রামীণ জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, নগর জীবনেও সংস্কৃতি অহরহ গড়ে উঠেছে"।[১] উক্ত মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। কারণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদেরই প্ররোচনা দিক না কেন, সংস্কৃতির অন্তর্বিলীন কাঠামোর মধ্যে বস্তুত পক্ষে সে ধরনের কোন বিচ্ছিন্নতাই কিন্তু নেই। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি আর শহরের পরিশীলিত আধুনিক কৃষ্টিকলার মধ্যে সম্পর্কটা প্রভেদের নয়, বিবর্তনের। আর এই পরিবর্তনের হাত ধরেই ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছে তখন থেকেই বাংলায় সাংস্কৃতিক

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাজনৈতিক ইতিহাস ধরা পড়েছে প্রচলিত অনেক ছড়ায়।

২.

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক উত্থান পতনের কাহিনী। কতকগুলি ঘটনার সন তারিখ নামা, রাজ্য ভাঙা-গড়ার কাহিনী। সত্যিকারের ইতিহাস হচ্ছে জনজীবনের ইতিহাস তার সংগ্রামের ইতিহাস, ধীর গতিতে তার অগ্রগমনের ইতিহাস, মানবসমাজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ইতিহাস চলমান পুণ্যতোয়া কল্লোলিনীর মতো কোন্ মহাসমুদ্রে ছুটে চলেছে তা বলা যায় না। ঐ সভ্যতায় দেশ গঠনের কাজে কত বীর আত্মত্যাগ করেছেন, সেই যুগব্যাপী আত্মদানের কাহিনি, নির্মম নির্যাতনের কাহিনি, মানবাত্মার কাহিনি নিজেকে বোঝার কাহিনি, অপরকে বোঝানোর কাহিনিই হল ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস কোন একটি দেশ-জাতি-কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, ইতিহাস হল সমগ্র জাতির ক্রমবিকাশের ধারা। ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষের কথা অলোচনা করে না, একটি জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্প ও সবকিছুর অগ্রগতির কথা জানায়। ইতিহাস এগিয়ে চলে তার নিজস্ব দ্বান্দ্বিক নিয়মে। জনজীবনের ক্রমান্বিত বিবর্তনের পরিচয় সন্ধান করাই যে যথার্থ ইতিহাসচর্চা, এ কথা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। সেই সন্ধান কেমন করে সফল হতে পারে, এঙ্গেলস তাঁর ঐ 'ডায়লেক্টিক্স অব নেচার' (১৯৪৫ সংস্করণ, পৃ.২৮৮) বইতে সে সম্পর্কে বলেছেন: "প্রত্যেক প্রজন্মেই শ্রমের চেহারা বদলে যেতে লাগল, তার বৈচিত্র্য এবং ত্রুটিহীনতার পরিমাণ বাড়তে থাকল। শিকার এবং পশুপালনের সঙ্গে প্রথমে চাষবাস এবং তারপরে সুতা কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুশিল্পকে গড়ে তোলা, মৃৎশিল্পের বিস্তৃতি ঘটানো, নৌকা চালানো ইত্যাদি সব ব্যাপার ক্রমে ক্রমে সামাজিক ক্ষেত্রে সংযুক্ত হতে থাকে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে শিল্প-বাণিজ্যও গড়ে উঠল আর তারই অনুষঙ্গে আবির্ভূত হল চারুশিল্প ও বিজ্ঞান। গোষ্ঠী থেকে জাতি এবং তার থেকেই রাষ্ট্রেরও উদ্বর্তনও হল; প্রতিষ্ঠিত হল বিধি বিধান, আইন আর রাজনৈতিক অনুশাসন। আর এই সবকিছুর সঙ্গে- মানুষের অন্তর্লোকে তার নিজেরই বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিণতি পেল ধর্মচিন্তায়"।[২]

এখানে একটা কথা অবশ্য বলে নেওয়া দরকার। এই শ্রমনির্ভরশীল সংস্কৃতির বিকাশের মূল রূপটি পরিশীলিত নাগরিক অথবা ধ্রুপদী কলাকৃষ্টির মধ্যে থাকলেও তা থাকে প্রচ্ছন্ন হয়েই। পক্ষান্তরে লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটি অনেক স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ চেহারায় হাজির থাকে সভ্যতার স্তরে স্তরে ইতিহাসের যে উদ্বর্তন ঘটে, তার সম্যক পরিচয়টি মেলে সেখানেই।

মার্কস তাঁর ‘A contribution to the critique of Political Economy’ গ্রন্থের নানা স্থানে ‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের’ কথা বলেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথাই হল আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর ওপরই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ নির্ভরশীল, তাই আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ধারণ করাই হল আসল কাজ। এই পদ্ধতিতে সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশকে দ্বান্দ্বিক সূত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে সংস্কৃতি আসলে এক এক সময়ে এক এক রকম আর্থসামাজিক উপলক্ষকে অবলম্বন করে একরকম ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’ গ্রন্থে বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- ‘যে পর্যায়ে আমাদের জীবিকার মাধ্যম ছিল শিকার সেই পর্যায়ে আমাদের চিত্রকলা ধর্মবিশ্বাস-সঙ্গীত সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত আরণ্যক জীবনের অনুষঙ্গ। তারপর যখন পশুচারণ ভিত্তিক সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটল এবং তাকেই মানুষ জীবিকা হিসাবে নিল তখন তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতেও পড়ল সেই ছাপ, তেমনি কৃষিনির্ভর অর্থনীতি যে সমাজে প্রধান সেই সমাজের সাহিত্যে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে পড়লো তার ছাপ। অর্থাৎ বলার কথা হল এই যে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি কখনো আকাশ থেকে পড়ে না, আর্থসামাজিক পটভূমি থেকেই তার উদ্ভব’। আমাদের আলোচ্য রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভবের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি।

৩.

বাংলার বিভিন্ন যুগের বিপ্লবের ইতিহাসের পশ্চাৎভূমিতে (hinterland) এমনি ধরনের অজস্র ছড়া পাওয়া যাবে যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মৌখিক সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত লোক-বিজ্ঞানী C. F. Potter বলেছেন: Folklore is a lively fossil which refuses to die. It is a precipitate of the Scientific and cultural lag of centuries and millennia of human experience. (SDFML, P.40)

অর্থাৎ যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন গান ও ছড়ায় সমসাময়িক ইতিহাস ধরা পড়ে, সেগুলিই কালক্রমে সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত আমাদের অতিপরিচিত একটি ছড়ার উল্লেখ করতে পারি সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ে গ্রাম শহর নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মুখে মুখে ঘুরত তা হল-

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,

বোম ফেলেছে জাপানি।

বোমের মধ্যে কেউটে সাপ,

ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ।[২]

বিদেশী ইংরেজ শাসকের অত্যাচার সাধারণ মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাই ১৯৪২ খ্রীঃ জাপানি শক্তির আক্রমণ ও কলকাতার উপর বোমা বর্ষণের মত ঘটনায় মুক্তিকামী বাঙালি খুশি হয়েছিল। কিন্তু জাপানের আক্রমণকে স্বাগত জানানোর পিছনে এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙালির হৃদয় পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের মত শুভ বার্তা। জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের এমন শুভ উত্থানে আর ব্রিটিশ শক্তির পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ শব্দ গুচ্ছের বারবার উচ্চারণের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে লোকতৃপ্তি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমসাময়িক বহু ঘটনা, প্রবলের কাছে থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি- এমনকি নির্বাচনী প্রচারেও ছড়ার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের সময় তাঁর পার্টির সৌজন্যে প্রচলিত ব্যঙ্গ ছড়া ‘The Derby Ram’ (ডারবির ছাগল) ম্যাসাসুয়েট ও ওয়াশিংটন অঞ্চলে বেশ প্রচার লাভ করে। Rosa Alles সংগৃহীত ‘Allen Eamily Songs’ (1899) গ্রন্থে জানা যায় ওয়াশিংটন ও বহুস্থানে ইলেকশন ক্যাম্পেইনে ছড়াটি আয়ারল্যান্ডবাসী প্রতিপক্ষের অসম্ভব বাচালতাকে ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ পূর্বকালে (Derby) আয়ারল্যান্ডবাসী রামছাগল সদৃশ জনৈক প্রতিপক্ষকে তার ‘উদ্ভট’ ‘অবাস্তব’ ইলেকশন প্রতিশ্রুতির জন্য জর্জ ওয়াশিংটনের দল এ ছড়ার মাধ্যমে ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।

শুধু সে যুগের ওয়াশিংটন নয়- এ যুগের নিহত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ইলেকশন সংক্রান্ত বিদ্রুপাত্মক ছড়া নিয়েও JAF (1963) পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে-

Long long may their ladies sit with their fans into their hand

O’er their they see sir Kennedy come, come sailing to the land.[৪]

অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিক্সন দলের ‘গৃহিণীরা’ যতই সুখ-স্বপ্ন দেখুক না কেন কেনেডির নৌকা শেষ পর্যন্ত তীরে ভিড়বেই। কোন কোন ছড়ায় জ্যাকের (কেনেডির) স্ত্রী (প্রাক্তন) জ্যাকি (জ্যাকুলিনকেনেডি) হোয়াইট হাউসে গিয়ে তার ‘ফ্যান’ কেনেডির সঙ্গে বলড্যান্স করছেন এমন স্বপ্নেরও বৃত্তান্ত আছে। কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের বন্ধু আব্রাহাম লিংকন, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলকে নিয়েও এমন অসংখ্য ছড়া প্রচলিত ছিল।

রাষ্ট্র বিপ্লবকে নিয়ে সর্বাধিক গান ও ছড়া গড়ে উঠেছে রাশিয়ায়, বিশেষ করে ১৯২৪-এর অক্টোবর বিপ্লবের পর। যেমন:

Without a Tasar, without a sovereign we shall livein freedom./ The rifles sounded tuk-tuk. The machineguns spoke tra-ta-ta./ And the whites run away. The warriors are coming from the four corners of the land./ The workmen have come thousand and thousand./ The landless have come thousand and thousand, / You have opend to us all the doors of the world, / Great Lenin. the giant of the ages. (Sokolov, Russian Folklore P.670-743)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৩৪ সনের প্রথম সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে গোর্কি স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন যে তিনি তাঁর নিজের রচনায় লোক-ঐতিহ্য কে গ্রহণ করেছেন- 'লোক ঐতিহ্য হবে মেহনতী রাশিয়ান জনগণের সাহিত্যিক ভিত্তি, হারকিউলিস, প্রমিথিউস, মিকুলা, স্বেতাগার-এ মেহনতী জনমনের নায়ক...'।

এই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় হাঙ্গারিয়ান লোক বিজ্ঞানী গলা অরটুটাই(Gyula Ortutay)-এর কণ্ঠে– (১৯৫৩-এ লোক-বিজ্ঞানী ও মেহনতী জনগণের অধিবেশনে) মত প্রকাশিত হয়: It goes without saying that in the course of building up of socialism, the cultural elevation of our people, and the bringing about of acul ture, National in appearance but Socialist in essence, ethnography and folklore will have important tasks to perform. (Dorson, current Folklore Theories, current Anthropology, 5 (1963) P. 99)

বাংলাদেশে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নায়ক ইয়াহিয়া টিক্কা খানকে নিয়ে প্রচলিত একটি ছড়া:

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা,

বোয়াল মাছের দাড়ি।

টিক্কা খান ভিক্ষা করে,

শেখ মুজিবের বাড়ি।[৫]

উক্ত ছড়াটির অনুকরণে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদে একটি রাজনৈতিক ছড়া পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবাংলার শাসক দল সি পি আই এম-এর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আদি বাসস্থান ছিল পদ্মার ওপারের দেশ, যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দলের পরাজয় হলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর বাসস্থান পাল্টে যাওয়ার ইঙ্গিত করা হচ্ছে বিরোধী দল তৃণমূলের একটি দেওয়াল লিখনে:

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা,

বোয়াল মাছের দাড়ি।

বুদ্ধবাবু কিনবে এবার,

পদ্মা পারের বাড়ি।$_{৬}$

কাজেই এই ধরনের ছড়াগুলি 'echo of past' হলেও কোন কোন সময় 'vigorous voice of the present' হিসেবেও ইতিহাসের মাল-মসলা প্রদান করতে পারে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত রাশিয়ান লোক-বিজ্ঞানী Sokolov এর মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতি যোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন:

The development of the chatushka(folk-rhymes) represents a most interesting process, with complex meanderings and intertwinings, reflecting with greatfulness and diversity both the historical life with its social conflicts and the dialects of class conflict. The popular rhyme is a striking example of the poetic primitive, going back in its construction and psychological essence almost to the primitive archaic times, and at the same time, it is frequently an expression of new ideas and attitudes among the masses of the people...

তাঁর মতে:

...The popular rhyme, life many other genres of folklore, is at the same time both a memorial of the remote past and the loud voice of contemporary times...

এর কারণ:

...As we shall see there are many popular rhymes which cannot be definitely assigned to any specific moment in history. The very same

popular rhyme may have been in existence for decades, each time adapting itself, now to one and now to another manifestation of actual life, and being subjected sometimes to slight, sometimes watch the changing of the variants the movement of the variable readings in the text...

আমাদেরও বিশ্বাস:

...Folklore apart from continuous variations is unthinkable. The capacity for variation, as we have seen many times, is one of the characteristic features of its creative nature. In the popular rhymes, as in other genres of folklore, the creation of words is by no means expressed each time in the creation of absolutely new texts, but very often only in a change in the form of a previously existing production. There are tens and hundreds of thousands of popular rhymes-this would mean that there are at least thousands of variations. (Russian Folklore,P.530-531)[৭]

৪.

মানুষ যখন নিজেদের ভাব-বিনিময় করতে শিখেছে সম্ভবত তখন থেকেই সভ্য হবার পথে সে পা বাড়িয়েছে। আদিম যুগ থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে মানুষ যতই এগিয়েছে ততই তার ভাব সঞ্চারের মাধ্যমগুলি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। যদি আমরা সমাজ বিবর্তনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব আদিম সমাজ ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছে কৌম সমাজে, কৌম সমাজ বিবর্তিত হচ্ছে লোকায়ত সমাজে, আর এই লোকায়ত সমাজ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে পরিশীলিত সমাজের দিকে। সংযোগ-সঞ্চারে সর্বজনীন মাধ্যম মাত্রেই লোকায়ত ঐতিহ্য অনুসারী এমন কথা ভাববার কারণ কিন্তু নেই। বিশেষত সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমগুলির ব্যবহারিক প্রকাশও ক্রমশ বেশি সূক্ষ্ম, জটিল এবং পরিশীলিত হয়ে ওঠে। এই সংযোগের সর্বজনীনতা বাড়ে নাগরিকীভবন(আরব্যানাইজেশন) হবার সমান অনুপাতে এবং ঠিক সেই অনুপাতে কমে যায় তার লোকায়ত চরিত্র। যেমন- ১৯৭৮ সালের বন্যার পর তৈরি মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের এমন একাধিক পট দেখবার সুযোগ হয়েছে, যার মধ্যে বিধ্বংসী বন্যার ছবির সঙ্গে সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থা ইত্যাদির রূপায়ণও করা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তাও সেখানে চিত্রিত। প্রাসঙ্গিকভাবে যে গান

বাঁধা হয়েছে ঐ পটগুলির উপলক্ষে সেখানেও সংবাদপত্র সুলভ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। মায় পটের ছবিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও আঁকবার চেষ্টা করেছেন লোকশিল্পী: সঙ্গে গান বাঁধা হয়েছে,

দোহাই বাবু জ্যোতিবাবু তুমি ভগবান,

অন্ন দিয়ে এ দুর্দিনে বাঁচাইলে প্রাণ...৮

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদেরই প্ররোচনা দিক না কেন, সংস্কৃতির অন্তর্বিলীন কাঠামোর মধ্যে বস্তুতপক্ষে সে-ধরনের কোন বিচ্ছিন্নতাই কিন্তু নেই। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি আর শহরের পরিশীলিত আধুনিক কৃষ্টিকলার মধ্যে সম্পর্কটা প্রভেদের নয়, বিবর্তনের।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে ছড়া এবং গানের মাধ্যমেই সামাজিক কোন কিছু বক্তব্য সঞ্চারণের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। চটকা ধরনের হালকা রীতির গান যেখানে মূলত রসালো কেচ্ছা ইত্যাদির দিকে বেশি নজর দেয়, সেখানে গম্ভীরা, টুসু, ভাদু ইত্যাদি গানের গভীরতা দ্যোতক চরিত্রের জন্য, তাদের মধ্যে সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক সংঘাত, রাজনৈতিক লড়াই ইত্যাদি ব্যাপারও ঠাঁই পায় স্বচ্ছন্দে। লোকনাট্যের যে সমস্ত প্রকরণে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় আনা যায়, যেমন- আলকাপ বা চোরচুরনি, সেখানেও ঠিক একই ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য সঞ্চারণ করতে দেখা যাচ্ছে আজকাল। এই সমস্ত লোকনাট্য ধারা থেকেই এসেছে আজকের রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের নাম ‘পোস্টারড্রামা’ বা পথনাটিকা। লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয় ‘ফর্ম’ গুলির উপর ভিত্তি করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় গণসঙ্গীতগুলি। তাহলে বলা যায় অনুরূপভাবে জনপ্রিয় ‘লোক ছড়া’ গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক ছড়াগুলি।

সংযোগ-মাধ্যম হিসেবে লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য এবং লোকছড়া একটি বিশেষ ভঙ্গি গ্রহণ করে; তা হল তির্যক বিদ্রুপের। ঠিক এই জিনিসটি পথনাটিকা, গণসঙ্গীত এবং রাজনৈতিক ছড়াতেও একটা প্রধান উপজীব্য বিষয়। এককালের বিখ্যাত ‘ও মাউন্টব্যাটন সাহেবো’ কিংবা পরবর্তীকালে ‘ও হাতে ভোট দিও না’ গান গুলির কথা মনে করুন অথবা সেকালের নীল চাষকে ব্যঙ্গ করে রচিত ছড়া-

এল নীলের চাষ,

দেশের হল সর্বনাশ।

জোত জনম থাকল না,

মান ইজ্জত রাখল না। ৯

পরবর্তী **১৯৬৭** সালের নির্বাচনের সময় সি পি আই এম-এর দেওয়াল লিখন:

দু আনা সের বেগুন কিনে

মন হল প্রফুল্ল,

বাড়ি এনে কেটে দেখি

সব কানা অতুল্য।১০

কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষেরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দুজনেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সমসাময়িক। প্রসঙ্গত অতুল্য ঘোষ ইংরেজদের অত্যাচারে জেলের মধ্যে একটি চোখ হারান। সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় স্বাধীনতার পরে ২৪ বছর সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন এই দুই ব্যক্তিত্ব। উক্ত গণসঙ্গীত এবং রাজনৈতিক ছড়াগুলি পাঠ করলে বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

'ফর্ম'-এর দিক থেকে কিছু কিছু রাজনৈতিক ছড়ায় লোক ছড়ার সাথে মিল থাকলেও লোকছড়ার মত অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশ কিন্তু রাজনৈতিক ছড়ায় লক্ষ্য করা যায় না। এই সকল ছড়াগুলি উদ্দেশ্যহীন রচনা নয়, এগুলি মূলত পরিকল্পিত ভাবে রচিত হয়। যেখানে জনমত গঠন মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই রাজনৈতিক ছড়াগুলি মনন চিন্তনে অনেকটা আধুনিক। যেমন-

লোকছড়া: চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

কদম তলায় কে?

হাতি নাচ্‌ছে ঘোড়া নাচ্‌ছে

সোনামণির বে।

রাজনৈতিক ছড়া: কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

কদম তলায় কে?

প্রমোদ নাচে কেষ্ট নাচে

জ্যোতি বসুর বে।

বিপক্ষে সি পি আই এম -র দেওয়াল লিখন:

ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস,

ঠিক বলেছিস ভাই।

১১ই মার্চ ইন্দিরাকে

সাজিয়ে আনা চাই।[১১]

১৯৬২ সালের নির্বাচনের সময় থেকে 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া'য় নির্বাচনী চাপানউতোর শুরু হয়। তবে ১৯৭২ সালে এসে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে কোথায় পৌঁছেছে তা আমরা উক্ত ছড়ায় দেখলাম। প্রসঙ্গত ১১ ই মার্চ হল ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিন।

এ প্রসঙ্গে ড. পল্লব সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন: "এক সময় ভাব-সংযোগের সেতু ছিল দেবতা, পরবর্তীকালে গণদেবতাই তার অভীষ্ট ; ধর্ম নির্ভর চিহ্ন, ধ্বনি ইত্যাদি পরবর্তীকালে ধর্মের গন্ডিকে পেরিয়ে অন্যবিধ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে; আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রেক্ষিতেও লৌকিক সংস্কৃতি জাত 'ফর্ম'-গুলির ভিত্তিতেই তৈরি হয় নূতনতর সংযোগ সঞ্চারক ফর্মসমূহ; কিন্তু এ সত্ত্বেও নাগরিকীভবন এবং সংযোগসঞ্চারের লৌকিক মাধ্যমগুলির চরিত্র আনুপাতিক বৈপরীত্যে সম্পর্কিত, কারণ 'ফর্ম' সমধর্মী, 'কন্টেন্ট' ও কিছুটা তাই, অনেকাংশে 'অ্যাপ্রোচ'ও। কিন্তু 'পার্টিসিপেশন'-এর ক্ষেত্রে দুয়ের চরিত্র পৃথক। কিন্তু তবুও সার্থকভাবে 'কম্যুনিকেট' করতে হলে লোকসংস্কৃতির 'ফর্ম' গুলিকে গ্রহন করতেই হবে, সেগুলিই ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের বোধ-বুদ্ধি-অনুভবের সঙ্গে মিশে আছে যেহেতু"।[১২]

প্রসঙ্গত লোকসংস্কৃতির অভ্যস্ত সংজ্ঞা ও অবস্থান থেকে যদি সরে আসা যায় আর মানা যায় যে এই সংস্কৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং পরিবর্তনের ফলে এর রূপান্তর ঘটে, নতুন নির্মাণ হয়, তাহলে এই সত্য না মেনে উপায় নেই যে, রাজনৈতিক প্রভাব লোকসংস্কৃতির নির্মাণ ও ব্যবহারে ঐতিহাসিক তথ্য। এই তথ্যের বিচারে লোকসংস্কৃতি চর্চার তাত্ত্বিক অবস্থানও পাল্টে যায়। নজর দিতে হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ প্রসঙ্গের প্রতি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে রাজনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক সচেতনতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই বলা যায় এখানে রাজনৈতিক-লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সেই পরম্পরা অব্যাহত এবং সম্প্রতি এর পরিধিও অনেকটাই বিস্তৃত।

তবে আলোচ্য 'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া' গুলি নির্দিষ্ট কোন 'লোক' বা 'গোষ্ঠির' দ্বারা তৈরি হয় না, অথবা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মূলত এই ধরনের ছড়াগুলি

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত এবং প্রচারিত হয়। নির্বাচনের সময় এই সকল ছড়া মানুষের মনকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে, তবে নির্বাচন মিটে গেলে মানুষের মন থেকে সেগুলি ধীরে ধীরে মুছে যায় (রোদ-বৃষ্টিতে দেওয়াল লিখন যেমন মুছে যায়)। যেমন- ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে বিধ্বংসী ঝড় 'আয়লা' আছড়ে পড়ে এবং প্রচুর মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলেও আর একটি ঝড় আছড়ে পড়ে যার নাম 'লায়লা'। একই বছরে পরপর দুটি ঝড় দুই বাংলার মানুষের জনজীবনের ছবি পাল্টে দিয়েছিল। অনুরূপ ভাবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান দীর্ঘ দিনের বামফ্রন্ট শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আর এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় সেই সময়ে রচিত একটি ছড়ায়-

আয়লা নয় লায়লা নয়,

এবার এসেছে মমতা।

পালা বুদ্ধ পালা বিমান,

আর পাবি না ক্ষমতা।[১৩]

এই সকল ছড়াগুলি মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভ করে না ঠিকই কিন্তু সমাজ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সকল ছড়াগুলির গুরুত্ব অপরিসীম, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না।

'বাংলা রাজনৈতিক ছড়া' অলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে তা হল- এই সকল ছড়াগুলি কি লৌকিক ছড়া? না পরিশীলিত ছড়া? স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে একটা সংশয় থেকে যায়। তবে লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে লোকছড়া হতে গেলে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার বেশির ভাগই রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে নেই। যেমন- রাজনৈতিক ছড়াগুলির রচয়িতার সন্ধান প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাধারণ পাঠক জানতে পারেন যে, এগুলি কোন দলের দ্বারা লিখিত বা রচিত এগুলি শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় না, এগুলি রচিত হয় প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার প্রাপ্ত জনগণের কথা মাথায় রেখে। লোকছড়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে:

খোকা গেল মাছ ধরতে,

ক্ষীর নদীর কূলে।

ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে,

মাছ নিয়ে গেল চিলে।

মাছটা চিলে নিয়ে গেল এটা আমাদের সকলের জানা কিন্তু ছিপটি কেন কোলাব্যাঙে নিয়ে গেল তা আমাদের জানা নেই। এই ধরনের অসংলগ্ন চিত্র লোকছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরিশীলিত ছড়ার ক্ষেত্রে অসংলগ্ন চিত্রের কোন স্থান নেই। বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ক্ষেত্রে এর অন্যথা ঘটেনি। যেমন:

ভাইয়ের আয়ু বাড়বে বলে,

ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ।

বোনের জন্য থাকে কেবল ,

ইভটিজিং আর ধর্ষণ।[১৪]

[উক্ত ছড়াটি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সি পি আই এম-এর রচিত। বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান, নিরাপত্তা এবং মানুষের মানসিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে উক্ত ছড়ায়। এছাড়া নারী নিরাপত্তা ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বেহাল দশা নিয়ে শাসক দলকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।] এখানে কোন অসংলগ্ন চিত্র নেই। লোকছড়াগুলি মূলত মুখে মুখে প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তার লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ সেগুলি সংগ্রহ করে একটা লিখিত রূপদান করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক ছড়াগুলি লিখিত আকারেই প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সর্বোপরি এই সকল ছড়ার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবনা- চিন্তা সবই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা নির্মিত। তাই এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলিকে পরিশীলিত মনন ও চিন্তনের প্রকাশ বলতে পারি।

৫.

১৯৫৪ সালে উইলিয়াম ব্যাসকম Four Functions of Folklore শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এমন নয় যে, Functionalism বা উপযোগিতাবাদ বা কার্যকারিতাবাদের চর্চা এই প্রথম হল; অনেক আগেই বিশেষত নৃতত্ত্বের এই চর্চা ঘটেছে। এমন কি লোকসংস্কৃতির আলোচনায়, মিথ ব্যাখ্যায়, ব্রনিসল ম্যালিনোওস্কি এই তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগে জানান যে মিথ এর প্রধান উপযোগিতা হল পরম্পরা বা ট্র্যাডিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত রচনা, Myth in primitive psychology –তে ম্যালিনোওস্কি এই উক্তি করেন। ব্যাসকমের প্রবন্ধটি এই ধারাতেই একটি সংযোগ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় যদিও তফাৎ কিছু আছে। ‘লোক’ বলতে সেই সময়ের গৃহীত ও প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি বুঝতেন গ্রামীণ কৃষি সমাজের মানুষজন। এর কিছুকাল পর, ১৯৬৪ সালে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে

তাঁর নির্ধারিত চারটি উপযোগিতার বাইরে আরো দু'একটি তাঁর জানা ছিল না; ১৯৫৪-তে তাই সেগুলি তাঁর মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন বোঝা যায়নি যে ভার্বাল আর্ট-এর রাজনৈতিক ব্যবহারযোগ্যতাও আছে আর তা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রয়োজন ও সমাজ পরিবর্তনের তাগিদে ব্যবহার হতে পারে। এমনকি হাতিয়ারও হতে পারে। এই প্রক্রিয়া উত্তর-ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে একটি প্রধান লক্ষণ। ব্যাসকম স্বীকার করলেন যে এই সংবাদটি পান নিউ ইয়র্কের আফ্রিকান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভার আলোচনা সূত্রে। ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালে এই বিষয়ে রিচার্ড ডরসনও একটি প্রবন্ধ লেখেন। এরপর ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত International Encyclopedia of Social Science-এ Folklore শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধে ব্যাসকম লিখলেন: 'Despite the fact that verbal art serves to continue and stabilize culture, it has also been used for the purpose of political propaganda and social change. During the emergence of the independent nations of Africa, myths, legends and song texts have been used to promote ethnic unity, regionalism, nationalism, anti-colonialism and pan-Africanism'.[১৫]

এমনটা যে শুধু আফ্রিকায় ঘটল তা নয়। এমনকি এই প্রক্রিয়া যে অতি-সাম্প্রতিক তাও নয়। ব্যাসকমদের নজরে এসেছে হয়ত গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। তবে এটা ঠিক যে প্রক্রিয়াটি জোরদার হয়েছে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে, আফ্রিকা-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরাজয়ে। আর এই সময়েই জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির ব্যাপকতা দেখা গেছে নানা দেশে, ভারতবর্ষেও তার অন্যথা ঘটেনি। আর রাজনৈতিক-সামাজিক এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগও হয়েছে ব্যাপকতর, শুধু ব্যবহারেই নয়, নির্মাণ ও প্রসারেও।

বিশ শতকে পৌঁছে শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি সংগঠিত হয়েছে, ততই তীব্র হয়েছে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয় ভারতবর্ষেও। সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী গণসঙ্গীত ও ছড়া তৈরি হয়েছে, রচয়িতা অনাম্নী কথাকার ও চারণ কবিরা। যেমন- স্বদেশী আন্দোলনের সময় একটি কবাডি খেলার ছড়াতে পাওয়া যায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ:

চিত্ কবাডি চিত্

হবে মোদের জিত্

ভাঙছে কংসরাজার ভিত...

চিত্ কবাডি লালবাজার

লাল পাগড়ি হাজার হাজার

চিত্‌ কবাডি দাও ফেলে

চিত্‌ কবাডি কাছে এলে

ল্যাং মেরে দাও মার

জিত্‌ ভারতমাতার।[১৬]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত বেড়েছে, সে আন্দোলনে এই ধরনের ছড়ার ব্যবহার ততই বেড়েছে। মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকাল ও তার পরেও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনেও আধুনিক আঙ্গিকে এই সকল রাজনৈতিক ছড়া ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। বর্তমানে এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলি রচিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শকে তুলে ধরার জন্য এবং শাসক দলের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ছড়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক কিংবা বিরোধী উভয় দলই পক্ষে-বিপক্ষে এই ধরনের ছড়ায় দেওয়াল ভরিয়ে তোলেন এবং দেওয়াল দখলের যুদ্ধে মেতে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সৌমেন সেন মহাশয়ের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: “নির্বাচনকালে কত ছড়া, গান যে বাংলায় লেখা হয় তার হিসেব রাখা হয়নি। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেওয়াল লিখন তো রীতিমত শিল্প হয়ে উঠেছে, আর সেই দেওয়াল লিপির ছড়া, কার্টুন বাংলার নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার। রাজনীতিতে এই ছড়া, কার্টুনের বিষয় অনেক বক্তৃতার তুলনায় শক্তিশালী”।[১৭]

তথ্যসূত্র:

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎঃ কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা, মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, পৃ. ৫৪।

২.পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৫।

৩. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য(১ম খণ্ড), নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৯৭।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৬. দেওয়াল লিখন, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সাহাপাড়া, মিঞাপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত।

৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য(১ম খণ্ড), নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২০২।

৮. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৭৬।

৯. দেবাশিস বসু, বাংলা ছড়ায় সমাজ-ভাবনা, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬০।

১০. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আলাপ-বিলাপ, কোরক, ২০১২, পৃ. ৭৪।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

১২. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. (৩৭৭-৩৭৮)।

১৩. ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দঃ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি বাজার সংলগ্ন এলাকার দেওয়াল লিখন।

১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, রবিবাসরীয়, ভোটের ছড়া শীর্ষক আলোচনা, পৃ. ৯।

১৫. সৌমেন সেন, লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ১২৩।

১৬. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নানা বিষয়ে হেটো ছড়া, বারোমাস, এপ্রিল- ১৯৭৮।

১৭. সৌমেন সেন, লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ১২৮।

১.১. বাংলা ছড়ায় ইতিহাস: পলাশি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

উনিশ শতক যখন মধ্যবয়সী তখন 'বিবর্তনবাদ' মানবিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার অনেকটাই জুড়ে আছে। আমাদের জানা যে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান চর্চায় এই বিবর্তনবাদের প্রভাব কতটা ছিল। ১৮৭৮ সালে যখন লণ্ডনে ফোকলোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, এডুইন সিডনি হার্টল্যাণ্ড, অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ, জর্জ লরেন্স গোমে প্রমুখ, প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে বিবর্তনবাদে আস্থা রাখেন আর নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পরস্পর নির্ভরতা ঘোষণা করেন। তাদের কেউ বলেন লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যবিজ্ঞান বা 'সায়েন্স অব ট্রাডিশন' (হার্টল্যাণ্ড), কেউ একে দেখলেন ইতিহাস হিসেবে- 'হিস্টোরিক্যাল সায়েন্স' (গোমে)- কেউ তৈরি করলেন উদ্বর্তনবাদ, 'থিওরি অব সারভাইভাল' (ল্যাঙ)। অর্থাৎ নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সংযোগে লোকসংস্কৃতি চর্চার উদ্যম ছিল সভ্যতার অভিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধানের। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে সমাজ-বিবর্তনের উল্লম্ব ও সমান্তরাল, কালক্রমিক ও স্থানিক বিবর্তন সত্ত্বেও, মানবিক সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক পরম্পরাই লোকসংস্কৃতির লক্ষ্যস্থল।

ফোকলোর সোসাইটির আর একজন তাত্ত্বিক জর্জ লরেন্স গোমে ১৮৯১ সালে 'ফোকলোর অ্যাজ এ হিস্টোরিক্যাল সায়েন্স' নামে একটি বই লিখলেন। যেহেতু তাঁদের নজর ছিল অতীতের প্রতি, চেষ্টা ছিল 'পপুলার অ্যান্টিকুইটি'র সন্ধান নেওয়া, উদ্বর্তনের হিসেব করা, আর ইতিহাসও যেহেতু অতীতের দিকে তাকায়, তাই ফোকলোরকে একটি ইতিহাস-বিজ্ঞান হিসেবে তাঁরা মান্যতা দিতে চেয়েছেন। সেই সময়ের এবং তার কিছুকাল পরেও, যে দুটি তত্ত্ব-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল, তা তৈরি হয় এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই। একটি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক আর অন্যটি ইতিহাস-পুনর্নির্মাণ (Historical Reconstructional) তত্ত্ব। প্রথমটি ফিনিশিয় পদ্ধতি হিসেবে খ্যাত, যেহেতু ফিনল্যাণ্ডেই কার্ল ক্রোনের নেতৃত্বে পদ্ধতিটি তৈরি হয়। এর লক্ষ্য কিন্তু ইতিহাস চর্চা ছিল না, ছিল একটা কাহিনির আদিরূপ (ur-form), কালান্তরিত ও স্থানান্তরিত রূপের ইতিহাস জানা। একটি কাহিনির নানা রূপের বিশ্লেষণ করার জন্য, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিক্রমার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস-পুনর্নির্মাণ তত্ত্ব অবশ্য একটি দেশ, জাতি, বা কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য ব্যবহৃত না হলেও একটি বিশেষ সমাজের প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রথার গড়ে ওঠা ও বহতার ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছিল। বিশ শতকের গোড়ায় যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ বেশ শক্তিশালী হতে শুরু করে তখন জাতীয় অস্মিতার তাগিদে ইতিহাস পুনর্নির্মাণের ঝোঁক তীব্র হয়। সেই সময় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারে লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের গাঁটছড়া একটি প্রয়োজনীয় পন্থা হিসেবে স্বীকৃত হতে থাকে- রাজনৈতিক কর্মসূচি ও জাতীয় আবেগ, মতাদর্শ, যতই ভিন্ন হোক না কেন, তখন পরস্পর-নির্ভর আর লোকসংস্কৃতি সেই নির্ভরতার

প্রতীক। জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত এবং সেই সাংস্কৃতিক পরম্পরায় জাতীয় চেতনার সন্ধান, অনেকটাই উনিশ শতকীয় ইতিহাস-পুনর্নির্মাণ তত্ত্ব-পদ্ধতির অনুসরণে। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায়, স্বাজাত্যবোধের উন্মোচনের এই চেষ্টা তো শুরু হয়ে যায় হিন্দু মেলার সময় থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যম ও তাঁর প্রেরণা, পরামর্শ ও সহযোগিতায় অন্যদের উদ্যমে এই কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয়, সে সংবাদ আমাদের জানা। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তাঁরা কেউই প্রচলিত অর্থে লোকসংস্কৃতিবিদ ছিলেন না; বলা যায় তাঁরা ছিলেন আদ্যোপান্ত জাতীয়তাবাদী আর সেই আদর্শেই তাঁরা আগ্রহী হন জাতীয় সংস্কৃতিচর্চায়।

বিশ শতকের গোড়ায়, বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক বলয়ে যখন সমাজতন্ত্রের উত্থান ও বিস্তৃতি, তখন লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয়ে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়। তার তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল মূলত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় এই পদ্ধতির ব্যবহার এত ব্যাপক এবং বাংলার উভয় অংশেও তাই ঘটেছে, যে কারণে এই বিষয়ে আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে একথা বলতে হবে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজবীক্ষার একটি সাধারণ তত্ত্ব; সব সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ এই তত্ত্ব প্রয়োগে সম্ভব। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পুরানো উপাদানগুলির খবর নেওয়া ও নতুন উপাদানগুলি চিহ্নিত করা। এই উপাদানগুলি কখনই জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্ব নয়, এগুলি তৈরি হয় দুটি যুগ এবং দুটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম ও তাদের ভাবাদর্শ বা আইডিওলজির পরিমণ্ডলে। অতীতকে নতুন চিন্তাধারায় নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাতে অভ্যস্ত সত্যের বিপরীতে নতুন সত্য নির্ণয় হতে পারে। এই পন্থা হল ঐতিহাসিক পন্থা, পুরানো থেকে নতুন ধাপে ওঠা। এই পদ্ধতি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য-সূত্র যোগান দিতে পারে। নিম্নে প্রচলিত ছড়াগুলির সাহায্যে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক কালখণ্ড পুনর্নির্মাণের একটা চেষ্টা করা হল।

২.

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। এই নবজন্মের প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস জানার জন্য পেছন ফিরে তাকালে দেখব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৯৫৭) বাংলায় শাসক বদল ঘটেছে, জনসাধারণ অবশ্য এতে খুব বিচলিত হয়নি। তাই পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ প্রবেশকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে অলস কৌতূহলে দেখেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(১১৭৬/১৭৭০) এল এর ক'বছর পরে, সরকারি ভাষ্য অনুযায়ীই এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারাল। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কিন্তু এ সবের কোন ছাপ পড়ল না। সাহিত্যে তখন 'গানের যুগ'- কবি, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, ভক্তিগীতি, আর প্রেমগীতির একাধিপত্য। এ যুগের কবি গীতিকাররা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক নয়, শিক্ষাদীক্ষার

অভাবও তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা গান গাইতেন জীবিকার প্রয়োজনে, জনগণকে তৃপ্ত করতে। কলকাতার হঠাৎ নবাবরা ছিলেন তাদের ভাগ্যবিধাতা। আর ভাগ্যবিধাতাদের কাছে জীবন বড় রঙিন। সেই রঙের নেশা জমাতে সেখানে ঢালাও ফূর্তি, ফেনা ওপচানো পানপাত্র, বাইজির উদ্দাম নাচ আর তার সঙ্গে কবির রসালো গান। বাইরের জগতের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আর তাই পলাশির যুদ্ধ, কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, নন্দকুমারের ফাঁসি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে পথে পথে ছড়ান নর কঙ্কাল, বাংলার পল্লী অঞ্চলে **১৭৬৩-১৭৯৯** এর মধ্যে অন্তত **১৬** বার প্রজা বিদ্রোহ, **১৭৯৩** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে রাতারাতি জমি ও মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গাগড়া- এই সব ঘটনা চোখের সামনে দেখেও নিধুবাবুর মত গীতিকার বা রাম বসুর মত কবিওয়ালা আমাদের মিলন বিরহের সংবাদ শুনিয়েছেন। পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন থেকে তাঁদের এই বিকৃত বিলাস-কলা-কৌতূহল চরিতার্থ করার ধারা অব্যাহত থাকলেও বাংলা রাজনৈতিক ছড়ায় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষী এই ধরনের ছড়াগুলি। যেমন-

কি হলোরে জান

পলাশির ময়দানে, নবাব হারাল পরাণ

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি নেবে সয়ে

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়

হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।[১]

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে পলাশির নাম কোনদিনও মুছে যাবার নয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে এই প্রান্তরে যে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হয় তার ফলাফলের চিত্রেই বাংলাদেশের পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দী পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পলাশির ন্যায় বিস্তৃত প্রান্তর আর নয়। এইজন্য এইখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাসমর সংঘটিত হয়। **১৭৫৭** খ্রিঃ **২৩** শে জুন হিজরি **১১৭০** অব্দের **৫** সওয়াল বৃহস্পতিবার নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 'ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়া দেশীয় রাজগণের অকর্মণ্য ভাববশত আপনাদিগের রাজ্যলাভের পিপাসা বর্ধিত করিতে থাকেন। বাঙালার সুচতুর দূরদর্শী নবাব আলিবর্দি খাঁ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদিগের দমনার্থে উপদেশ দিয়ে যান'।[২] আলিবর্দির উপদেশই শুধু নয়, কার্য-কালে ক্রমে অবস্থা ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়ে উঠল, '২২ শে জুন অপরাহ্ণে পাঁচটার

সময় ভাগীরথীর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী পলাশি অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি ভোগ করিয়া রাত্রি একটার সময় পলাশির সুবিখ্যাত আম্রকাননে উপনীত হইয়া বিক্রম করিতে লাগিল। এই আম্রকানন তৎকালে 'লক্ষাবাগ' নামে পরিচিত ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ শত ও প্রস্থে ৬ শত হাত ছিল বলিয়া কথিত আছে। চতুর্দিকে অনতি উচ্চ মাটির বাঁধ ও তৎপার্শ্বে সামান্য খাল। আম্রকুঞ্জের পশ্চিমোত্তরে শত হস্ত দূরে নবাবের একটি ইষ্টক গ্রথিত মৃগয়াগৃহ নির্মিত ছিল। সিরাজদ্দৌলা 'মনকরা' হইতে অগ্রসর হইয়া, দাদপুরের দক্ষিণে রাজা দুর্লভ রামের পূর্বনির্দিষ্ট প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন'।[৩] ক্লাইভের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার, ২২০০ সিপাহী, ৮০০ ইউরোপিয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ। নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০০০০। ১৫০০০ অশ্বারোহী এবং ৩৫০০০ পদাতিক। নবাবের কামান সংখ্যা ছিল ৫৩ টি। সিনফ্রে নামক একজন ফরাসী সেনা নায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীরজাফরের অধীনে ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল।[৪]

মীরজাফরের সঙ্গে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী পলাশির যুদ্ধের পরিচালক নেতা ক্লাইভ জানতেন যে সৈন্য সামন্ত, সকলেই নবাবের বিপক্ষে, সামান্য একটু যুদ্ধের অভিনয়ের পরই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সিরাজের দুই সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলালের রণ-পরাক্রমে ক্লাইভের সেই বিশ্বাস অন্তর্হিত হতে শুরু করল। তখন মীরজাফর ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করে রাত্রিবেলা নবাবকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত স্থির হল। "যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ইংরেজ পক্ষে আম্রবাগান ও সুব্যবস্থার কৌশলে বারুদ রক্ষা পাইল। কিন্তু নবাবের পক্ষে বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইল; মীরমদনের কামানগুলি কার্য করিতে পারিল না। ইংরেজ পক্ষেরও হয়ত এই অবস্থা, এই ধারণায় বীর মীরমদন সাংঘাতিক আহত হইয়া পড়িলেন। গোলার আঘাতে তাহার পদভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। আসন্ন মৃত্যুবস্থায় তাহাকে সিরাজ শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। নবাব চাটুকার ও বিশ্বাসঘাতক পাত্রবর্গের প্ররোচনায় যুদ্ধ জয়ের সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এমন সময় মীরমদন আনীত হইলেন। বাঙালি মুসলমান বীর স্বীয় প্রভুভক্তির এবং যুদ্ধের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বলিতে স্বর্গগত হইলেন"।[৫]

মীরমদন ছাড়াও সেনাপতি মোহনলাল ও অনেক সৈন্য সামন্তের প্রাণের বিনিময়েও পলাশির স্বাধীনতা তথা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়নি। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের মাত্র ২৩ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হওয়ার কথা ইংরেজরা বলে থাকেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব সিরাজদ্দৌলা স্ত্রী ও পরিজনসহ পালিয়ে যান, পরে ধরা পড়ে মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে প্রাণ হারান। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত একটি ছড়া-

খোকা যাবে রথে চড়ে

ব্যাঙ হবে সারথি

মাটির পুতুল লটর পটর

পিঁপড়ে ধরে ছাতি।

ছাতির উপর কোম্পানি

কোন সাহেবের ধন তুমি।৬

পলাশির যুদ্ধে মীরজাফর ও তার বিরাট সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকার অন্যতম শর্ত ছিল যুদ্ধ জয়ের শেষে বাংলার নবাবী পদ মীরজাফরকে প্রদান। তাই যুদ্ধ শেষে ক্লাইভ মীরজাফর খাঁর এক পত্র পাইলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন কল্য প্রাতে দাদপুরে সাক্ষাৎ হইবে। অর্ম বলেন, সৈন্যগণের মধ্যে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের কথা প্রচার হওয়ায় তাহারা মহোল্লাসে দাদপুর যাত্রার আদেশ পালন করিল, নবাব শিবিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের ইচ্ছায় বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে নাই। ইংরেজ পক্ষ হইতে কেবল নবাবের শকট ও বলিবর্দগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল।

এক আগ্রাসী মনোভাব ও ব্যবসায়িক বংশ বিস্তারের অসামান্য কৌশলের জন্য ব্যাঙ নামক প্রাণীটির সাথে ইংরেজ ও তার গোরা বাহিনীকে বার বার প্রতীকে ব্যবহার করেছেন লোককবিগণ। আর সারথি ব্যাঞ্জনার্থে প্রকৃত চালক। পলাশির যুদ্ধের পর মীরজাফর রাজা হলেন ঠিকই কিন্তু রাজ্য চালনা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত রশিটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তুলে নিল নিজের হাতে এই সন্ধিলগ্ন থেকে। কিন্তু বাঙালি সেদিন এই পট পরিবর্তনের গুরুত্ব বোঝেনি একেবারেই, সেদিন তারা ইংরেজ নামক সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে শুধু দেখবার জন্য ভিড় করেছিল যাদের চেহারা চলন বলন বুদ্ধি সব কিছুই বাঙালিদের থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেই ইংরেজরা তাদের হিসাব বুঝে নিতে চাইল। মীরজাফর যে পরিমাণ অর্থ ইংরেজদের দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তত অর্থ তখন রাজকোষে ছিল না। শুধু তাই নয় অর্থ প্রাপ্তির আশা ছিল ষড়যন্ত্রকারীদেরও। এই উপলক্ষে যুদ্ধপূর্ব একটি চুক্তি-পত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় ক্লাইভ, মীরজাফর, দুর্লভ রায়, ওয়াটস, তারাচাঁদ প্রমুখ আলোচনায় বসলেন। সন্ধিপত্রগুলি পাঠ করা হল, এই সন্ধি পত্রের চুক্তি অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা পেলেন প্রচুর টাকা, একমাত্র উমিচাঁদ ছাড়া। ইংরেজ কোম্পানিকে মীরজাফর দিলেন (১৭৫৭-১৭৬০) নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। ক্লাইভকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হয়েছিল তার থেকে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। পরবর্তীতেও এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক দায়ের বোঝা বহন করতে হয়েছে এবং নিঃস্ব হতে

হয়েছে শুধু মীরজাফরকেই নয় জগৎ শেঠ, দুর্লভ রায়, উমিচাঁদ ইত্যাদির মত ধনকুবেরদের। ইংরেজদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্য এই সব মানুষেরা তখন যে হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, লোককবির কলমে তাই চিত্রিত হয়েছে 'পিঁপড়ে ধরে ছাতি' এই ব্যঙ্গবাণে। নবাবী আমলে 'ছত্রী' উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিলেন, যারা নবাব বা রাজার চলার সময় মাথায় ছাতা ধারণ করে থাকেন- বিশেষ করে নবাব যখন সভায় যেতেন।

৩.

১৭৭৫ খ্রীঃ ৫ আগস্ট কলকাতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মহত্যা। হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। পাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাদের স্পর্শ করে , সে জন্য ৫ আগস্ট তারিখে প্রত্যূষেই কলকাতার লোকেরা শহর ছেড়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছিল। যাকে নিয়ে এই ব্রহ্মহত্যা হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন মহারাজা নন্দকুমার রায়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু তথা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর এক পুত্র গুরুদাস ও তিন কন্যা ছিল (সম্মানী, আনন্দময়ী ও কিনুমণি)। নন্দকুমারের দুটি স্ত্রীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ছড়া তুলে এনেছে অজ্ঞাত অখ্যাত দুটি স্ত্রীর ভাগ্যহীন হওয়ার আক্ষেপের কথা। সারা জীবন তিনি মামলা মোকদ্দমায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে অর্থোপার্জন বৃদ্ধি করার আর অন্যকোন উপায় তিনি পাননি। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় বিরাট প্রাসাদ ও নগদ বাহান্ন লক্ষ টাকা তিনি সন্তানদের জন্য রেখে যান। এছাড়া তিনি ভদ্রপুরে নবরত্নের এক বিশাল মন্দির তৈরি করে সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। তৈরি করেন আরও অনেক মন্দির। এই নন্দকুমার তার বিপুল সম্পত্তি ও বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশ্য জায়গায় জনতার সামনে অনাকাঙ্খিত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে দুঃখ বেদনার জন্ম দিয়েছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি ছড়ায়-

মহারাজা নন্দকুমার রে,

তোর রাজ্যপাট জমিদারী কারে দিলিরে।

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙলার অধিকারী,

হেস্টিং সাহেব এলো জান করিবারে বারি।

নন্দকুমারের মা কাঁদে গঙ্গার পানে চেয়ে,

আর না আসিবে বাছা ঘোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।

খোপেতে কৌতর কাঁদে ফৌরাহাতে ফাঁস,

যোড় বাংলায় কাঁদে সোনার গুলতিবাঁশ।

ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণীগো দিদি,

সিতে ছিল কড় সিঁদুর বঞ্চিত করিলেন বিধি।

অনুরূপ অন্য আর একটি ছড়ায় পাইঃ

আজগুবি এক আইন হইয়াছে

কৌনচলিদের সাথে হেস্টিন ঝগড়া বাধিয়েছে।

হায়রে হায় একি হল, বামুনের ফাঁসি হল,

নন্দকুমার মারা গেল,

গুরুদাস ধুলায় পড়েছে। ৭

[কৌনচলি= কাউন্সিলর/ হেস্টিন= হেস্টিংস সাহেব]

নন্দকুমারের পৈতৃক বাসস্থান ছিল বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রাম। পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তিনি ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর আমিন। নন্দকুমার ফরাসী, সংস্কৃত, বাংলা ও পিতার রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ শিখে আলিবর্দি খাঁর আমলে প্রথমে হিজলি ও মহিষাদল পরগণার রাজস্ব আদায়ের আমিন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পলাশি যুদ্ধের পর নন্দকুমার নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। হেস্টিংস তখন কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পরে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় নন্দকুমার ছিলেন একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর নানা রকম গুণে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দেশের লোককে রেজা খাঁর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেশের লোকেরও তিনি প্রিয় হয়েছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি উল্লেখযোগ্য এবং আলোড়িত একটি ঘটনা। হেস্টিংসের চারজন সদস্য ছিলেন, কর্নেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্যান্সিস ও রিচার্ড বারওয়েল। বারওয়েল ছাড়া অন্য তিনজন ইংলণ্ড থেকে আসেন এবং হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মন্ত্রনা সভায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এই বলে যে, কোম্পানির নিয়মের বিরুদ্ধে হেস্টিংস প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ নিয়ে রাজা গুরুদাস (নন্দকুমারের পুত্র) এবং মনি বেগমকে নবাব মোবারকদৌল্লার অভিভাবিকা নিজের কাজে

ব্যবহার করেন, আর ঘুষ নিয়ে অনেক দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় হেস্টিংস বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের নামে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে পাল্টা অভিযোগ নিয়ে আসেন। এই অভিযোগ লোমেস্টার ও হাইড নামক বিচারপতির সামনে ১৭৭৫ খ্রীঃ ৬ মে উপস্থিত করা হয়। এই অভিযোগটি চূড়ান্ত বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রথম এবং প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের কাছে পাঠানো হয়। ১৭৭৫ খ্রীঃ ১৬ জুন সকালবেলা বিচারপতি নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং শাস্তি হল মৃত্যু। ৫ আগস্ট ফাঁসির দিন ঠিক হয়।

কলকাতার খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজার ও হেস্টিংস সেতুর মধ্যবর্তী নদীর কাছে ময়দানে নন্দকুমারের বধ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখতে সেদিন জন সমাগম হয়েছিল প্রচুর। "এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্মস্পর্শী কাতর ধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে আসক্ত হইয়া পলায়ন করিল; কেহ কেহ বসন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ এই পাপ দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পবিত্র সলিলা ভাগীরথীর জলে পতিত হইল"। [৮] বাংলার জনসাধারণ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, মহারাজ নন্দকুমারের সত্যিই ফাঁসি হবে একজন সাধারণ অপরাধীর মত। সেদিন কলকাতার বর্ণ হিন্দুরা কেউ রান্না করেনি। ব্রহ্মহত্যা পাতকে কলকাতা কলুষিত হল এই ভেবে অনেক ব্রাহ্মণ শহর ত্যাগ করে গঙ্গার অপর পারে উত্তর পাড়ায় বসতি স্থাপন করল।

8.

১৮৩১ খ্রীঃ রাউঘাটি গ্রাম সকলের নজরে এসেছিল তিতুমীরের উত্থানের কারণে। তিতুমীরের বিদ্রোহের লক্ষ্য জমিদার-নীলকর সাহেব-ইংরেজ এক কথায় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হলেও উনিশ শতকে অনেকেই এই সংগ্রামকে প্রীতির চোখে দেখেননি। কিন্তু না দেখলেও ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতেও তাঁরা পারেননি। সেই কারণে উনিশ শতকে একাধিক সাহিত্যিক তিতুমীরের জীবন ও সংগ্রামকে সাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। উনিশ শতকে তিতুমীরের জীবন ও সংগ্রামকে ভিত্তি করে রচিত অন্তত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে প্রথমটি অজ্ঞাতনামা মুসলমান রচিত 'নারকেলবেড়ের জঙ্গ'- এটি ১৮৫৩- ১৮৫৪ খ্রীঃ নাগাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ৩৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি বড় বাজারের হানিফা প্রেস থেকে ৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল। গ্রন্থটি আমরা দেখিনি, তবে নাম থেকে অনুমান নারকেল বেড়িয়ার লড়াই লেখকের উপজীব্য এবং এই লড়াইকে লেখক সহানুভূতির চোখে দেখেছিলেন।

সহানুভূতির চোখে দেখার লোক অবশ্য সে যুগে বেশি ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান রাজত্বের পুনঃস্থাপন তিতুমীরের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইংরেজ ভক্ত ইয়ংবেঙ্গলের ভালো লাগেনি। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' তাই তিতুমীরের অত্যাচারের রূপটি তুলে ধরে। আবার সমকালের মুসলমান জনগণের একটা অংশ যে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তা আমরা জানতে পারি ৫ ডিসেম্বর ১৮৩১- এর 'রিফর্মার' পড়ে।

এর কয়েক বছর পর অক্টোবর, ১৮৮৮-র 'সখায়' ভুবনমোহন রায় কিশোরদের উপযোগী করে তিতুমীরের কাহিনী বর্ণনা করেন। লেখক মূলত হান্টারের লেখার উপর নির্ভর করে তিতুমীরের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে অকারণ কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। লেখক ছেলেবেলা থেকে তিতুমীরের কথা শুনে আসছেন এবং সে লড়াই নিজের চোখে দেখতে না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী তিতুমীর ও তাঁর শিষ্যরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠায় হিন্দু জমিদাররা নানা প্রকার অত্যাচার শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সরকার প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিতু পরাজিত ও নিহত হন। হিন্দুদের উপর তিতুমীরের অত্যাচারের বিবরণ একটু অতিরঞ্জিত। তবে ভিন্নপথাবলম্বী মুসলমানদের উপর তারা অত্যাচার করত লেখক তাও বলেছেন। গোটা লেখাটিতে তিতুমীর সম্পর্কে অশ্রদ্ধাসূচক কোন উক্তি নেই। তিতুমীর সম্পর্কে প্রচলিত একটি ছড়ার অংশ বিশেষ ভুবনমোহন উদ্ধার করেছেনঃ

নারকেলবেড়ের তিতুমীর বুজরুগি করিল,

যত সব মিঞা মোল্লা

বানায়ে বাঁশের কেল্লা

ফিরিঙ্গি বাদশার সাথে লড়াই জুড়িল। [৯]

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষ' সপ্তম ভাগে (১৩০৩) তিতুমীরের জীবন ও সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তিতুমীরের জীবন কাহিনী এতে মোটামুটি জানা যায় এবং লেখক যে তিতুমীরের উপর প্রসন্ন নন তাও গোপন থাকে না। তাঁর মতে ধর্ম-উন্মত্ততা তিতুকে বিদ্রোহের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তিতুমীরের সংগ্রামের যে বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে নগেন্দ্রনাথ তা বুঝতে পারেন নি। অপর দিকে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক বিহারীলাল সরকার তা পারেননি। না পারলেও, বাংলায় তিনিই প্রথম তিতুমীরের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনা করেন। তাঁর লেখাটি প্রথমে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ লেখাটি পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ ভক্ত বিহারীলাল ছিলেন

জমিদার শ্রেণীর গুণমুগ্ধ। কাজেই জমিদার-নীলকর-ইংরেজবিরোধী তিতুমীরের জীবনকাহিনী লিখতে গিয়ে তিনি তাঁকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবেন এটাই স্বাভাবিক।

তিতুমীর ও তাঁর সংগ্রামকে নিয়ে সমকালে কিছু কিছু ছড়া ও গান রচিত হয়েছিল। হারু রচিত এই ধরনের একটি দীর্ঘ ছড়া বিহারীলাল সরকার তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ ধরনের অনেক গান সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষ' সপ্তম ভাগে এ রকম একটি গান উদ্ধার করেছেন। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ইংরেজরা তিতুমীর মতাবলম্বীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। এই নির্যাতনের হাত এড়াবার জন্য অনেক তিতু শিষ্য দাড়ি ফেলে হিন্দু সাজতে বাধ্য হয়। সুযোগ বুঝে পরামাণিকরা দাড়ি ফেলার জন্য একটাকা পাঁচসিকা মজুরি ধার্য করে। এ বিষয় নিয়ে রচিত একটি গানঃ

জোলানি উঠিয়া বলে উঠবে জোলা ঝাট,
হাজাম বাড়ী গিয়ে শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট।
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একই দায়।
এসেছে রাঙ্গাঁ গোরা, উর্দি পরা, ব্যাতের টোপ মাথায়,
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরৎগুলি মানলে না।
সারলে ইংরেজ মামু এবার আর জানে রাখলে না।[১০]

এই গানটি ছাড়া মুন্সি আসগর আলির কাছ থেকে দুটি গান বিহারীলাল তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেছেন। এর প্রথম গানটি হলঃ

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেলবেড়ে,
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকের গাঁয়ের হাট,
হেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট।

এই গানগুলির রচয়িতারা যে তিতুর সংগ্রামকে ভালো চোখে দেখেননি তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক, তিতুমীরের নেতৃত্বে উনিশ শতকে যে গণ-অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সাহিত্যিকরা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেননি,

এমনকি লোক কবিরাও গানে গানে এই গণসংগ্রামের নায়ক তিতুমীরের কাহিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন সৌভাগ্য উনিশ শতকের আর কোন সংগ্রামী নায়কের ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

তিতুমীরের বিদ্রোহের পর বাংলায় আর একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যার নাম ফরাজি আন্দোলন। তিতুমীরের সমকালেই হাজি শরিয়াতুল্লার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন পূর্ব বাংলার বহু সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করলেও বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে এই আন্দোলন একেবারেই ছাপ ফেলতে পারেনি, এর কারণও আছে। দুদু মিঞার সময়কাল ছাড়া (বিশেষ করে ১৮৪০-১৮৪৭) এই আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আন্দোলন এবং এর আবেদনও ছিল গ্রামীণ দরিদ্র মুসলমান সমাজে সীমাবদ্ধ। বিত্তবান মুসলমানরা এবং হিন্দুরা সেই কারণে এই আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহবোধ করেননি, বরং বিরাগ পোষণ করতেন। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নায়ক দুদু মিঞার কার্যকলাপে ব্রিটিশ বিরোধিতার চিহ্ন মাত্র ছিল না। তবে দুদু মিঞার কীর্তিকাহিনী নিয়ে সে ভাবে কোন ছড়া পাওয়া যায় না।

৫.

ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করে এই বিদ্রোহ ঠেকানো হয়। তবে সরকার বিরোধী সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কেও বাঙালী সাহিত্যিকদের বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল না এবং এই কারণেই বিষয়টিকে সাহিত্যে ধরে রাখার আগ্রহ তাঁরা বোধ করেন। যাও বা দু'চারটি ছড়া কবিতা ইত্যাদি এই বিদ্রোহ নিয়ে রচিত হয়েছে, তাতেও সাঁওতালদের বর্বরতা চিত্রিত করে লেখকরা তাঁদের রাজভক্তি প্রকাশ করেছেন।

আশ্চর্যের কথা, সেকালের দু'চারজন শিক্ষিত মানুষও কিন্তু সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহকে তাঁরা নিছক বর্বরতার প্রকাশ বলে মনে করতেন না। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে জাতি হিসাবে সাঁওতালরা সৎ এবং শান্তিপ্রিয় নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোন ক্ষতির জন্য তারা বর্তমান বিদ্রোহে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছে। রেল কোম্পানির কর্মচারিদের অত্যাচার, বেগার খাটানো, স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি তাদের এই পথে নিয়ে গেছে। এইসব দিক বিচার করে হরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন- 'Punishment may be awarded rather to those who drove by repeated and unforgiveable injuries a simple race insurrection than to those who can hardly bye held moral agents in these

lamentable affairs.' আজকের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে সাঁওতাল বিদ্রোহকে আমরা যে চোখেই দেখি না কেন, সমকালে সেই অস্থির পরিস্থিতিতে এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এ বিষয়ে হরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি উদার ছিল তা বোঝা যাবে সমকালীন পত্র-পত্রিকার মতামতের সঙ্গে তাঁর মতামতের তুলনা করলে।

হরিশচন্দ্র বা কাশীপ্রসাদের মত দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের বেশি মানুষের ছিল না। যেমন শ্যামাচরণ সেনের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরোধী। 'সন্তালকুলের সর্বনাশ হউক' একথা পত্রিকাটি বার বার বলে। প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজত্বে সাঁওতাল অত্যাচার দমিত হচ্ছে না বলে এই পত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা হয়ঃ

অসম্ভব কল্পনাও করা যুক্তি নয়।

সর্বদেশে সর্বকালে ব্রিটিশের জয়।

ভারতের বড় বড় রাজা ছিল যারা,

সংগ্রামে হারিয়া দেখ কোথা গেল তারা।

রাজপরিবারগণ সবই ব্রিটিশের অন্নদাস,

চারিদিকে ব্রিটিশের বিক্রম প্রকাশ।

মারহাট্টা রাজপুত যুদ্ধে মহাবল,

ক্রমে ক্রমে বীর্যহীন হইল সকল।

শিখ জাতি বদ্ধ হল অধীনতা জালে,

কি করিতে পারে বল অসভ্য সাঁওতালে। [১২]

বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে উক্ত কবিগণ নীরব থেকেছেন। যে সব সাঁওতাল নরনারী ইংরেজের বর্বরতার শিকার হয়, তাদের রক্তে রাঙা জীবনদানের কাহিনী পরবর্তীকালে অনেক ছড়ায় ধরা পড়েছেঃ

আমরা প্রজা সাহেব রাজা,

দুঃখ দেওয়ার যম।

তাদের ভয়ে হটবো মোরা,

এমনি নরাধম।

মোরা শুধু ভুখবো,

না না মোরা রুখবো। ১৩

অপর আর একটি ছড়ায় সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা সিধু ও কানহুর করুণ পরিণতির ছবি চিত্রিত হয়েছেঃ

ও সিধো সিধো ভাই তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে,

কী কথা রইল গাঁথা ও কানহু তোর ছল ছল স্বরে।

দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ,

জানো নাকো দস্যুবণিক লুঠলো সোনার দেশ। ১৪

উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে রচিত আরো দু-চারটি ছড়া, গ্রাম্য কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। বীরভূমের কুলঝুরি গ্রামের রায় কৃষ্ণদাস বিদ্রোহের সমসাময়িক লোক। তিনি এ বিষয় নিয়ে যে ছড়াটি লেখেন তাতে সাঁওতালদের মহাজন-কুঠি আক্রমণ, লুণ্ঠন মহাজনদের ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা, ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে সাঁওতালদের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে ছড়া শেষ করেছেন। লেখক সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন না হলেও তাঁর হাতেও গণ-অসন্তোষের রূপটি ফুটে উঠেছে। ১৫

৬.

১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বা ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ নামে চিহ্নিত। কলকাতার কাছে ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুরু হয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিং দেও এই সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। সেই অপরাধে ইংরেজ পুলিশ বাহিনীর হাতে নীলমণি সিং বন্দি হয়েছিলেন।

বিদ্রোহের সূচনাতেই বাংলার ধনপতিও জমিদাররা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকারের কাছে রাজানুগত্য প্রকাশক স্মারকলিপি প্রেরিত হয়। কলকাতার মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না। রাজভক্তি প্রকাশের নেশায় বাঙালী সমাজের একাংশ ব্রিটিশ জয়গানে মুখর হয়ে উঠল। সে যাইহোক, সমকালে এবং তারপরে গোটা উনিশ শতক ধরে বাঙালী সাহিত্যিক ও

বুদ্ধিজীবীরা **১৮৫৭**-র বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং তাদের সে চিন্তা বহুমুখি ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে, এদের মধ্যে ছড়া অন্যতমঃ

১। হায় হায় একি হইল,
সিপাই পল্টন খেপিল।
চারিদিকে মার মার কাট কাট,
যত সিপাই খেপেছে,
কাশিপুরের মহারাজা
মহল ছ্যাড়ে আইসেছে। ১৬

২। মাথার উপর কুরতি পরা
পদভারে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ড নিবাসী তারা।
টান্টিয়া টোপির মান,
তবে হবে খর্বমান।
মুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা। ১৭

১৮৫৭ সালের **১০** মে তারিখের ধূমায়িত বহ্নি প্রথমে মীরাট অঞ্চলে প্রকাশিত হয়। সে দিনেই বিহারের পাটনায় এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজের বেতনভোগী মীরাটের সিপাইরা ইংরেজ সেনাপতির কয়েকজনকে হত্যা করে। এখান থেকেই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ভোজপুর ও অযোধ্যাবাসী অনেকেই প্রাচীনকাল থেকেই উগ্রপ্রকৃতির। অযোধ্যার কাছে গঙ্গাতীরে বর্তমান কানপুরের প্রান্তভাগে বীঠুর গ্রামে শেষ মহারাষ্ট্র পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর সাহচর্যের কারণে এই উগ্রতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বাজীরাও আজীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও। **১৮৫৩** খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর তারই দত্তক পুত্র নানাসাহেব ইংরেজদের কাছে মাসোহারা বাবদ নির্দিষ্ট অর্থের দাবি করেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এবং তার ডিরেক্টরগণ নানার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি। সে থেকে তিনি মুখে ইংরেজ

সেনাপতিদের সঙ্গে সদভাব রক্ষা করলেও গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। বিদ্রোহী দল দিল্লী অধিকার করার পর নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, রানি লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ইংরেজ শাসকদের সমূহ বিপদ উপস্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ইংরেজ সৈন্যদলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্য ছিল। এখন এই সৈন্যদের বন্দুকে ব্যবহৃত টোটা, চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকত এবং সেই চর্ম যে কিসের তা নিয়ে ধর্মভীরু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়। যার ফলস্বরূপ মুসলমানরা ভাবল শূকরের চর্মে আচ্ছাদিত টোটা আর হিন্দুরা ভাবল গোমাংসে আচ্ছাদিত টোটা। এই নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ তৈরি হল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। যার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় প্রচলিত একটি ছড়ায়-

হিন্দুর অখাদ্য খাদ্য গোমাংস

মুসলমানের হারাম শূকর মাংস।

দুয়ে মিলে টোটা বানায়,

সাদা চামড়ায় গুলি চালায়। [১৮]

রাজভক্ত লেখকদের শীর্ষস্থানটি ঈশ্বর গুপ্তের জন্য সংরক্ষিত। এমন অলজ্জ কণ্ঠে ইংরেজদের স্তবস্তুতি সে যুগেও বেশি মানুষ করার সুযোগ পাননি। ২০ জুন, ১৮৫৭-য় 'সংবাদ প্রভাকরে' ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্লজ্জ স্তব করে বাঙালীদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেনঃ ' হে বাঙ্গালি মহাশয়েরা! এ বিষয়ে আপনাদিগকে যুদ্ধ করিতে হবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারানীর জয় হউক, লাট বাহাদুর অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সর্বতোভাবে সুখী হউন। বিদ্রোহানল এখনি নির্বাণ হউক। ...আমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব'। [১৯] এই সম্পাদকীয় লিখেও ঈশ্বর গুপ্ত মনে করলেন যথেষ্ট রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়নি। অতঃপর ঐ সংখ্যাতেই দুটি কবিতায় ইংরেজ-স্তব করলেন। একটু নমুনাঃ

চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।

ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়।।

এমন সুখের রাজ্য, আর নাহি হয়।

শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।। [২০]

৭.

উনিশ শতকের সূচনা থেকেই নীলকর সাহেবরা এদেশের জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার করে আসছিল। নীলকরের অত্যাচারী রূপটি সম্পর্কে সচেতন হয়েও উনিশ শতকের প্রথমদিকে কোন কোন বাঙালী বুদ্ধিজীবী এদের সমর্থনে বাক্যব্যয় করতে ইতস্তত করেননি। রামমোহন বা দ্বারকানাথের মতো দু'চারজনকে বাদ দিলে এ সময়ের বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা জনগণের কাছে নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, মীর মশারফ হোসেন প্রমুখকে পাই। তবে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলা পত্রিকাগুলি নীলকরের অত্যাচারের কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে থাকে, লং সাহেব নীল কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে বলেন, গত ১৬ বছর ধরে দেশীয় পত্রিকাগুলি নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালাচ্ছে এবং সেগুলির মতামত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। [২১]

১৮৫৮-য় প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্যারিচাঁদ মিত্র নীলকরের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে লেখেনঃ 'নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠিরের গোমস্তা ও কর্মচারিদের পেট অল্পে পুরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃতপান করিয়াছে, সে আর প্রাণান্তে কুঠির মুখ হতে চায় না'। জজ ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরের সঙ্গে খানাপিনা করেন, ফৌজদারি মামলায় তাদের বিচারের এক্তিয়ার মফঃস্বল আদালতের নেই- ফলে গ্রাম বাংলায় নীলকরকে সবাই যমের মত ভয় করে।

এই সময় কলকাতা থেকে 'Selections from papers on Indigo Cultivation in Bengal with an introduction and a few notes by Ryot' প্রকাশিত হয়। এতে লেখক নীলচাষের রূপটি উদ্‌ঘাটন করে বলেন, নীলচাষ বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য কৃষকের কাছে খুব অপ্রিয়। নীলকরের স্বজাতি এবং মিশনারিরা তাদের কার্যকলাপে নিন্দা করেন। নীলচাষের সাফল্য জালিয়াতি এবং অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নীলবাণিজ্য সম্পর্কে মিশনারিরা তো বলেইছেন তা প্রকৃত পক্ষে রক্তচিহ্নিত। যাদের মধ্যে নীলকরের বাস, তাদের কাছে নীলকর জীবন্ত বিভীষিকা। ২৭. ০১. ১৮৫৯-এ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মন্তব্য করে, এই পুস্তকটি একটি কমিশনের কাজ করেছে। বাংলার এই সামাজিক প্রশ্নটি সম্পর্কে যাদের আগ্রহ আছে

তাদের এটি দেখার জন্য পেট্রিয়ট অনুরোধ করে। ইংলিশম্যান এটির বিরুদ্ধে বলার মত কিছু না পেয়ে লেখকের ইংরাজি জ্ঞানের অভাব নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে।

নীলকরের অত্যাচারের কথায় সারা দেশ যখন উত্তেজিত, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার প্রজারা জোট বাঁধতে ব্যস্ত, বিদ্রোহের আগুন যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সন্ধিক্ষণে ১৮৬০-এ প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র সারাদেশ আলোড়িত হয়ে উঠল। সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিকের মত বাংলা ছড়াতেও নীল বিদ্রোহের(১৮৫৯-১৮৬০) ঢেউ আছড়ে পড়েছিলঃ

এল নীলের চাষ

দেশের হল সর্বনাশ

জোত জনম থাকল না

মান ইজ্জত রাখল না। ২২

কৃষকদের জোর করে দাদন দিয়ে নীলকর সাহেবদের নীল বুনিয়ে নেওয়ার প্রথা চালু ছিল। আর একবার নীলের দাদন নিলে তা বছরের পর বছর চলত। কৃষকের এই করুণ পরিণতির কথা ব্যক্ত হয়েছে ছড়ায়ঃ

নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা

একবার লাগলে আর ওঠে না। ২৩

জমি চষার সময় জমিতে ঢিল থাকলে, জমি সমান করতে সময় লাগে, তাই জমির শত্রু হয়ে ওঠে শক্ত মাটির খণ্ড। ঠিক একই ভাবে বাংলার কৃষকের চাষের একমাত্র শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল নীলচাষ। কারণ এই নীলচাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শুরু হত। সেই অত্যাচারের হাত থেকে কৃষক নয় কৃষক পরিবারের মা-বোনেরও ইজ্জত থাকত না। ফলে এই নীলকর সাহেবরা কেবল ভাতে মারল না, ধর্মভীরু বাংলার সাধারণ কৃষকদের জাতেও মারল। সে কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছড়ায়ঃ

১। জমিনের শত্রু নীল

কর্মের শত্রু ঢিল

তেমনি জাতের শত্রু পাদরি হিল। ২

(যদিও পরবর্তীকালে এটি একটি প্রবাদ বাক্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে নীলচাষ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এটি ব্যবহার করা হল।)

২। ভাত মারলে নীল বাঁদরে

জাত মারলে পাদরি ধরে। ২৫

ছড়া বাঙালি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। জীবনের পদে পদে তার ব্যবহার আনন্দে-বেদনায়, কৌতুক-কলহে, বিস্ময়ে-ব্যঙ্গে। শুধু অনামী পথচারী কবিরাই ছড়া রচনা করেন নি, আসরে দাঁড়ানো কবিয়াল গানের ফাঁকে ছড়া কেটেছেন, কাহিনী বা অভিনয়ের ফাঁকে ছড়া জুড়ে দিয়েছেন পাঁচালিকার আর যাত্রাওয়ালার দল। জনকবিদের মুখে মুখে রচনা করা ছড়াতে স্বভাবতই সন তারিখের চিহ্ন পড়েনি, তার মানে এই নয় যে এগুলি লৌকিক ছড়া। পুরোপুরি লৌকিক ছড়া হতে গেলে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার বেশীরভাগটাই এই সকল ছড়ার মধ্যে নেই। নির্দিষ্ট সন তারিখের উল্লেখ না থাকলেও চলতি সময়ের বুনোটে গাঁথা বলেই ব্যক্তি বা ঘটনা প্রসঙ্গ থেকে কালের একটা আনুমানিক ধারনা করে নেওয়া যায়। এমনকি কলকাতায় ইংরেজদের বাণিজ্য ও বসতি পত্তন থেকে শুরু করে সামাজিক রূপান্তরের পর্যায়গুলিকেও ছড়ার মধ্য দিয়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কলকাতার বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু ইতিহাস নয়, ছড়াতেও স্থান করে নিতে পেরেছেন। সে রকম একটি প্রতীকবাহী ছড়াতে সমকালীন সমাজের নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। ছড়াটি হলঃ

বনমালী সরকারের বাড়ী।

গোবিন্দরামের ছড়ি।।

উমিচাঁদের দাড়ি।

হুজুরীমলের কড়ি।।

পাঠান্তরঃ

নন্দরামের ছড়ি।

উমিচাঁদের দাড়ি।।

নকুধরের কড়ি।

মথুর সেনের বাড়ি।। ২৬

ছড়া দুটির অর্থ পরিস্ফুটনের আগে ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয় উদ্‌ঘাটন আবশ্যক। আর ঐ ব্যক্তি-পরিচয়ই ছড়া দুটির অর্থবোধে সাহায্য করবে বলা যায়। বনমালী সরকার ছিলেন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট ধনী ব্যবসায়ী। খ্রিষ্টীয় আঠার শতকে নির্মিত তাঁর কুমারটুলীর বাড়ি এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র কোম্পানীর আমলে কলকাতার কালেক্টরের সহকারীরূপে প্রভূত ধনোপার্জন করেন ও বাগবাজারে বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশের জমিতে এক সুউচ্চ কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন লুপ্তপ্রায়। তাঁর ব্যবহৃত ছড়ির খুব বাহার ও বৈচিত্র্য ছিল। কোম্পানীর দালাল রূপে অমিত বিত্তশালী শিখ বণিক উমিচাঁদ সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। তাঁর লম্বা দাড়ির খ্যাতি ছিল। ইনি ছিলেন অমৃতসরের অধিবাসী।

হুজুরিমল ছিলেন উমিচাঁদের শ্যালক এবং জগৎশেঠের মুৎসুদ্দি। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উমিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে তিনি প্রভূত ধনশালী হন।

পাঠান্তরে 'গোবিন্দরামের ছড়ি'র পরিবর্তে নন্দরামের ছড়ির কথা বলা হয়েছে। কলকাতার প্রথম 'রিসিভার অফ রেভিনিউস' রাফল সেলডনের সহকারী ছিলেন নন্দরাম সেন। সে পদের নানা সুযোগ-সুবিধায় প্রচুর অর্থাগমের ফলে তিনি শৌখিন স্বভাবের ধনীতে পরিণত হন। তাঁরও চটকদার ছড়ি ব্যবহারের অভ্যাস ছিল গোবিন্দরামের মতোই। লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর ছিলেন কোম্পানীর বেনিয়ান। সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভের অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসাবে মুর্শিদাবাদে লুণ্ঠিত কোষাগারে আট কোটি টাকার এক উল্লেখ্য অংশ তিনি নাকি পেয়েছিলেন। তাঁর অর্থের সীমা ছিল না। পোদ্দার ও ব্যাংকার মথুর সেনের যশোরে পাঁচটি নীলকুঠি ছিল। নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতার লাট প্রাসাদের অনুকরণে এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন।

লক্ষ্য ও মানসিকতার এমন সাযুজ্যে সেকালের ছড়া, কবিগান ও পাঁচালিতে শহর কলকাতার ব্যঙ্গ চিত্রের একটি বিশেষ ধরন ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, অভিজ্ঞতার সীমিত পরিধির মধ্যে থেকেও আলোচ্য পর্বের রচয়িতারা তাদের তীর্যক দৃষ্টিতে কলকাতার নাগরিক সমাজের যে রূপ তুলে ধরেছেন, একালের ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে তা অনুসন্ধান ও সমীক্ষণের মূল্যবান সামগ্রী। গ্রামীণ একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্য নগর সভ্যতার টানে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন অবস্থানভূমি থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নাগরিক সভ্যতার মূল্যমান কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে, [২৭] তা জানা যাবে এই ধরনের ছড়াগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে।

৮.

শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্বই যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জনগণের অংশগ্রহণ একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক যুগে রাজনীতি তাই শুধুমাত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, গণতন্ত্রের বিকশিত চেতনার ফলে জনমত তাতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। [২৮] সামগ্রিকভাবে ভারতে এবং তার অংশ হিসেবে বঙ্গ আধুনিক যুগের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ গণতান্ত্রিক চেতনারই অংশ। লক্ষণীয় যে, আধুনিক ছড়ার রচয়িতাগণ সকলেই মধ্যবিত্ত এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ আধুনিক ছড়ায় লাভ করেছে বিস্তৃত আয়তন।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন করে উদ্দীপনা আসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ভারতকে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য কামনা করে। মাদ্রাজ অধিবেশনে(১৯১৪) কংগ্রেস ইংরেজদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেঃ 'War has been declared in Europe and congress made profuse declaration of loyalty and promised all help in the prosecution of the war'.[২৯]

কংগ্রেস নেতৃত্বের সক্রিয় প্রচারের পর বাঙালীও যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করে। আধুনিক ছড়াকারেরা বাঙালীর প্রথম মহাযুদ্ধ যাত্রাকে মূলতঃ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। সুকুমার রায়ের ছড়াতে পাওয়া যায়ঃ ওই আমাদের পাগলা জগাই, নিত্য হেথায় আসে;

আপন মনে গুন গুনিয়ে মুচকি হাসি হাসে।...

চেঁচিয়ে বলে ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?

সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।...

হাত পা ছুঁড়ে চেঁচায় খালি চোখটি করে ঘোলা,

জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা!...[৩০]

এমনকি নিজে মহাযুদ্ধের সৈনিক হলেও নজরুল ইসলামের ছড়ায়ও সমজাতীয় ব্যঙ্গ যথেষ্টঃ

মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়

ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়

বেঁটে খাটো নিটপিটে পায়

ছেৎরে চলে কেৎরে চায়।...৩১

ছড়াগুলি পাঠ করলে মনে হয়, বাঙালীর যুদ্ধযাত্রা নানা হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করেছিল। অবশ্য সমাজ সচেতন ছড়াকার স্বাধীনতা লাভের আশায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতা করাকে সঠিক মনে করেন নি। বরং ইংরেজের শঠতা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এভাবেঃ

আর যেখানে যাওনারে ভাই সপ্তসাগর পার,

কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার!

সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ী-

কাতুকুতুর কুল্পি খেয়ে ছিড়বে পেটের নাড়ী।...

বিদঘুটে তার গল্পগুলি না জানি কোন দেশি,

শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি।...৩২

পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা প্রদানে ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা ছড়াকারের সতর্কবাণীকেই সত্যে পর্যবসিত করেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়াতে পাওয়া যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক কর্মীর ব্যর্থতার চিত্রঃ

ঘোষালের বক্তৃতা

করা কর্তব্যই,

বেঞ্চি চৌকি আদি

আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি

পাড়া ঘুরে মরেছে,

একশো টিকিট বিলি

নিজ হাতে করেছে।

চোখ বুজে ভাবে, বুঝি

এল সব সভ্যই।

চোখ চেয়ে দেখে, বাকি

শুধু নিরেনব্বই।৩৩

একদিকে হতাশা, অন্যদিকে ছিল নির্যাতনের আশঙ্কাঃ

বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!

কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।...৩৪

উল্লেখ্য যে বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসি, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রভৃতি নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল।

ইতিহাস কেবল মাত্র একটি দেশ, জাতি, কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, ইতিহাস হল সমগ্র জাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা। ঐ সমগ্র জাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে বাংলা ছড়ায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত ‘খুকুমণির ছড়া’ নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- “ভূ-তত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা হাড় অবলম্বন করে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নতুন পরিচ্ছেদ যেমন উদ্‌ঘাটন করে ফেলেন, তেমনি এই সমস্ত ছড়ার মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ইতিহাসের নানা ধরনের তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে।” এ কথা সত্য যে ছড়ার বিষয়ে কোন বন্ধন থাকে না বলেই, ছড়া মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। ইতিহাস যখন ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়, ছোটো ছোটো ভগ্নাংশ হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় তখন ছড়া ইতিহাসের কঠোর তত্ত্বে প্রবেশ করে তাকে ছন্দে ছন্দে হালকা করে সারা গায়ে মেখে নেয়। এতে ছড়ার বৈশিষ্ট্য বিঘ্নিত হয় না, গৌরব কমে না, কিন্তু কঠিন ইতিহাস ছড়ার শরীরে আশ্রয় করে কাল থেকে কালাতীতে ভ্রমণ করে বেড়ায়।

তথ্যসূত্রঃ

১. লোকসাহিত্য, আশরফ সিদ্দিকী (প্রথম খণ্ড), নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৯৭।

২. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (প্রথম পর্ব), কমল চৌধুরী (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯।

৩. বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা- কমল চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, পৃ. ১৮৩।

৪. বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৭১।

৫. বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা- কমল চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, পৃ. ১৮৪।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

৭. পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, রজতকান্ত রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৭২।

৮. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস(প্রথম পর্ব), কমল চৌধুরী(সংগৃহীত ও সম্পাদিত), দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৩৪।

৯.তিতুমীর, 'সখা', ভুবনমোহন রায়, অক্টোবর, ১৮৮৮, পৃ. ১৫৬।

১০. বিশ্বকোষ(সপ্তম ভাগ), নগেন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা, ১৩০৩, পৃ. ৭৪৩।

১১. গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৯৫।

১২. শ্যামাচরণ সেন সম্পাদিত, সমাচার সুধাবর্ষণ, ৩১. ০৮. ১৮৫৫।

১৩. ছড়ার অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৩।

১৪. বাংলা ছড়ার সমাজ ভাবনা, দেবাশিস বসু, একুশশতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৯।

১৫. গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১০২।

১৬. বাঙলা ছড়ায় বাঙলাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৩০।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

১৮. বাংলা ছড়ার সমাজ ভাবনা, দেবাশিস বসু, একুশশতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৯।

১৯. গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১০৫।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

২২. বাংলা ছড়ার সমাজ ভাবনা, দেবাশিস বসু, একুশশতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৬০।

২৩. ছড়ার অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৩।

২৪. বাংলা ছড়ার সমাজ ভাবনা, দেবাশিস বসু, একুশশতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৬০।

২৫. ছড়ার অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৪।

২৬. বাংলা ছড়া ছড়ার বাংলা, সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১১৬-১১৭।

২৭. বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের দর্পণে কলকাতা (১৮০০-১৮৭২), ছন্দা রায়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৫৪।

২৮. হ্যারল্ড লাসকি, রাজনীতির গোড়ার কথা, প্রথম খন্ড (বাংলা অনুবাদঃ এম. এ. ওয়াদুদ ভুঁইয়া), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬, পৃ. ১০৮-১০৯।

২৯. Dutt, R. Palme, India Today, Ibid, pp. 332-338 এ বিষয়ক প্রামাণ্য দলিল রয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে- Collins, Larry and Lapierre, Dominiane. Mountbatten and the Partition of India. University press Ltd, Dhaka. 1982 Pp. 55-59.

৩০. ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৫।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫.

৩২. সুকুমার রচনা সমগ্র (অখন্ড সংস্করণ), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৩, এম. জি. রোড, কলকাতা, পৃ. ১৩।

৩৩. ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭।

১.২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

জাতীয় কংগ্রেস গঠনে ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রশমনের ব্যবস্থা করা। এ কাজে বড়লাট ডাফরিনের প্রশ্রয় ও অনুমোদন তিনি পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে লর্ড ডাফরিন বলেছিলেন: 'কংগ্রেস হবে ভারতের সম্রাজ্ঞীর স্থায়ী বিরোধী দল'। রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তেমন গৌরবজনক নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির প্রতিনিধিদের মদতে কংগ্রেসের জন্ম ব্রিটিশ কূট কৌশলের পরিপুষ্ট ফসল মাত্র। প্রথমে কংগ্রেস ছিল একটি বিতর্ক-সভা, তারপর গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা পরিণত হয় একটি রাজনৈতিক পার্টিতে। বিভিন্ন ভাষার জনসম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী এবং জাত পাতের মধ্যে সেতু বাঁধার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই সব প্রয়াস যে পুরোপুরি সফল হয়েছিল তা অবশ্য নয়। কারণ নিচু জাতের লোকেরা আর মুসলমানরা কোনও দিনই কংগ্রেসের এই দাবি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি, যে তা সত্যিসত্যিই একটি 'জাতীয়' পার্টি। এই পরিণতিতে দেখা গেল রাজনৈতিক স্বাধীনতা যখন এল তখন তা একটি নেশনের স্বাধীনতা রূপে এল না- এল দুটি নেশনের স্বাধীনতা রূপে ভারত আর পাকিস্তান।

পুনেতে সার্বজনিক সভা মাদ্রাজে মহাজন সভা ও অঞ্চল ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্যোগে গঠিত সংগঠনগুলিকেও বৃহত্তর জাতীয় মঞ্চে সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন(১৮৮৫) অনুষ্ঠিত হয়। তার সভাপতি নির্বাচিত হন বাংলার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী যিনি ইউ সি ব্যানার্জী নামে সর্বাধিক পরিচিত। কংগ্রেসের মঞ্চে জমিদার বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্যই ছিল বেশি। প্রথম দিককার ছ'টি অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তরবিভাগ বিশ্লেষণ করে আদি যুগের কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র বোঝা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সারা দেশ থেকে জনা সত্তর প্রতিনিধি যোগ দেন, এর মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন মুসলিম প্রতিনিধি এবং এই প্রতিনিধিদের অর্ধেকের বেশি ছিলেন জমিদার ও মহাজন শ্রেণী থেকে আগত।

স্থির হয়েছিল প্রতিবছর বড়দিনের ছুটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষের কোন বড় শহরে দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে সরকারী প্রতিনিধির এক সভায় দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের আবেদন-নিবেদনমূলক কিছু প্রস্তাব গ্রহণ। সে সব প্রস্তাব মেনে নেবার বা কার্যকর করার কোন বাধ্যবাধকতা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। এইভাবে উনিশ শতকের শেষ বছরগুলি কাটল। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নরমপন্থী-চরমপন্থী, নোচেঞ্জার-প্রচেঞ্জার কলহ কংগ্রেস অধিবেশনকে তিনদিনের তামাসায় পরিণত করল। ১৯০২ সালে কলকাতায় স্থাপিত হল 'অনুশীলন সমিতি'। কংগ্রেসের আপোসমূলক আয়েসী

কর্মপ্রচেষ্টায় বীতশ্রদ্ধ ও অসহিষ্ণু যুব সম্প্রদায় দলে দলে গুপ্ত বিপ্লববাদী সংগঠনগুলিতে যোগ দেন। কংগ্রেসি আদর্শে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী চেতনা তখন প্রায় অবলুপ্তির পথে; একটি সংগঠন কর্মসূচীর দীনতা ও দোলাচলতায় মৃতপ্রায়। আর এই দুর্বলতার সুযোগেই ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের মতলব কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হলেন ১৯০৫ সালে। নানা কারণে এই যুগান্তকারী ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় মতাবলম্বীদের প্রতিবাদী সত্তায় নতুন গতি সঞ্চারিত হল।

এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সঙ্গত কারণেই বাঙালী সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ মুখর হয়েছিল। বিশেষ করে বাংলা সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বাঙালীর ভাবজগতের নেতৃত্বদানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সমৃদ্ধ ইতিহাস বহুবিস্তৃত। ১৯০৫-১৯১১ সময় কালের মধ্যে নতুন ও পুরানো সাময়িকপত্রগুলিতে বহু সমালোচনামূলক রচনা, ব্যঙ্গচিত্র, উপহাসাত্মক ছড়া-কবিতা, নাটকাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত।

বাংলা রাজনৈতিক ছড়া আলোচনার পূর্বে এই সকল ছড়া রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও প্রতিবেশের কথা জানা আবশ্যক। জানতে হবে প্রতিবাদ কার বা কাদের বিরুদ্ধে, কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কোন অবস্থার প্রতিক্রিয়ায়। উনিশ শতকে জাতীয় আন্দোলনের আহ্বান, বিশ শতকের ত্রিশ বা চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা উত্তর গণ আন্দোলনের আহ্বান নিশ্চয়ই একই মাত্রার হবে না। প্রতিটি বিপ্লব, বিদ্রোহ বা আন্দোলনের প্রকৃতি যেমন আলাদা, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি আলাদা রাজনৈতিক ছড়াতে তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনও আলাদা হবে। গণ আন্দোলনের চরিত্রে যখন পরিবর্তন ঘটে যায়, ভুল হোক ঠিক হোক তখন সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া ও আবেগেরও পরিবর্তন হবার কথা। যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত হয়, স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বেও থাকেন তারাই, সেই কংগ্রেসের প্রতি ছড়াকারদের অভিব্যক্তি দেখছি তিন রকম, তিন ভিন্ন পর্বে, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত তিনটি ছড়ায়:[১]

১. উপলক্ষ: ১৮৯০ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন।

সহিষ্ণুতা আছে ভারত-সন্তানে,

সহিষ্ণুতা আছে এ জাতীয় মানে,

তাই হে পতিত ইংরাজ চরণে,

ভিক্ষা মাগি দুঃখ অসহ্য হলে।...

এই কংগ্রেসে নাহি সাধ করি,

হইতে ক্ষণেক রাজ্য-অধিকারী,

শুদ্ধ কিছু চাই বিশেষ চাকরী,

কালেতে সে কথা শুনিতে হবে।

২. উপলক্ষ: **১৯৩১** সালে বউবাজার স্ট্রিটের স্বদেশী মেলা।

মেলার ছাউনির কাছে বসত চানক সাহেব,

কালের পরিবর্তনের ঝড়ে সব হল গায়েব।...

স্বরাজ স্বরাজ ধ্বনি শুনে হল চক্ষু ছানাবড়া,

শাসন শোষণ দুটি ধারায় চালায় রাজ্য কড়া।

বন্দেমাতরম মন্ত্র ধ্বনিত হল যে সারা দেশে,

কণ্ঠে কণ্ঠে স্বরাজবাণী গান্ধিজী শোনালেন এসে।...

স্বদেশী মেলায় তাই মিলেছে সকল ভারতবাসী

সবার প্রাণে আনন্দ দেখ সকলের মুখে হাসি।

৩. উপলক্ষ: নির্বাচন, সম্ভবত **১৯৬৭**, পুরুলিয়া।

উনিশ বছর কুশাসনে হাহাকার,

আজ দেশেতে।

(ঐ) শাসন আজ,

কংস রাজ বেশেতে।।

স্বেচ্ছাচারী মিথ্যাচারী বসেছে

রাজগদিতে।

বিচার বিবেক নাই দানবের

নারী শিশু বধিতে।।

ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ, প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া, আন্দোলনের আহ্বান বা বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর যাই হোক না কেন, তা তৈরি হয় একটি প্রতিবেশে এবং সেই প্রতিবেশের দ্বান্দ্বিকতায়। উক্ত ছড়াগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, স্বাধীনতার পূর্বে মানুষের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা যে উচ্চতায় ছিল, তা স্বাধীনতা উত্তর সময়ে ধীরে ধীরে ম্লান হতে লাগল। রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধরনের ছড়াগুলিও পাল্টে যায়।

১৯১২ সালে মানভূমকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর থেকেই সেখানকার মানুষ আন্দোলন করেছেন নিজেদের ভাষা আর সংস্কৃতির পক্ষে। সেই সময়ে মানভূমের ৭২% লোকের ভাষা ছিল বাংলা। তা সত্ত্বেও শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে মানভূমকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাষাকেই কায়েম করার জন্য যেখানে সেখানে হিন্দি স্কুল তৈরি হতে শুরু করলে এখানকার মানুষ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। হিন্দিভাষীরা তখন বাঙলাভাষীদের সহ্য করতে পারত না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাঙালী শিক্ষকদের তাড়িয়ে হিন্দি শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল। হিন্দি না পড়ালে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে এই বলে স্কুল পরিদর্শক স্বয়ং হুমকিও দিয়েছিলেন। অনেক বাঙালী শিক্ষক এই সময় বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। প্রতিবাদী ছাত্ররাও সরকারি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গাছতলায় পড়াশুনা করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল।

পাটনা বিহার বিধান সভায়

হিন্দি ভাষার দল ভারি।

(তাই) ভোটের জোরে ভাঙছে তারা

লোক সেবকের কল গাড়ি।

মানভূমেরই মাতৃভাষা

বাংলা ভাষা চারধারে।

সেই কারণে বাংলা দমন

চালায় বিহার সরকারে।[২]

মানভূম ভাষা আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গ দেখে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিহারকে একত্রিত করে পূর্ব প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে বলে স্থির করলেন। যার সরকারি ভাষা হবে হিন্দি ও বাংলা। ১৯৫৬ সালের ২৩ শে জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের এই বিবৃতি আগুনে ঘি ঢালার মত কাজ করল। তখন আর শুধু মানভূম নয়, প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হল সারা বাংলা জুড়ে। জেলায় জেলায় এমনকি কলকাতাতেও শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন।

১৯৫৬ সালে মানভূম জেলাকে পশ্চিমবঙ্গে ভুক্তির দাবিতে লোকসেবক সংঘের উদ্যোগে পুরুলিয়ার পাকবিড়বা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে পদযাত্রা হয়েছিল তাতে ১২২৫ জন নরনারী অংশগ্রহণ করেছিল। ধামসা, মাদল বাজাতে বাজাতে, টুসুগান গাইতে গাইতে কলকাতা অভিমুখে সেই অভিযান শুরু হয়েছিল। তার নেতৃত্বে ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলনের অধিনায়ক বৃন্দ। অভূতপূর্ব সেই ঐতিহাসিক পদযাত্রা আজও মানুষ স্মরণ করে। এই রকম গণপ্রতিবাদের ব্যাপকতা লক্ষ করে ড. বিধানচন্দ্র রায় বাঙলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।

ভাত দিম, পান দিম

খাজনা দিম না

জান দিম, পান দিম

ট্যাকসো দিম না।

ইংরেজের খাজনা দিম না।

বিলাইতি কাপড় পড়মু না,

হাটবন্ধ কুলকুলি

বন্দেমাতরম হামার বুলি।[৩]

১৯২০ সালে সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে উত্তরবঙ্গের জেলা শহর আলিপুরদুয়ারও যুক্ত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আলিপুরদুয়ার মহকুমার প্রান্তীয় জনপদ কুমারগ্রাম দুয়ারে অসহযোগ আন্দোলন দ্রুত গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। সে সময়ে আলিপুরদুয়ারে চলছিল কোর্ট বয়কট আন্দোলন। বিলিতি কাপড় বর্জন। সেই সঙ্গে গোটা মহকুমায় খাজনা বয়কটের প্রচারও চলতে থাকে। গ্রামে-গঞ্জের হাটে বাজারে খাজনা না দেওয়ার জোরদার প্রচার চলতে থাকে। সেই সময় তখনকার স্লোগান ছিল-

শোন শোন কংগ্রেসি ভাই

ইংরেজ সরকারে খাজনা নাই।[৪]

সাধারণ মানুষ খাজনা বয়কট করলে ভাটিবাড়ি ও কুমারগ্রাম এলাকায় সরকারের খাজনা আদায় শূন্যতে ঠেকে। ফলে ইংরেজ অত্যাচার বাড়তে থাকে। এরপর অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য **১৯২১** সালে কুমারগ্রামে কংগ্রেস শাখা কমিটি তৈরি হয়। তারপর থেকেই খাজনা বয়কট আন্দোলন, হাটবন্ধ আন্দোলন চলতে থাকে। সেই সময় খাজনা আদায় হত হাটগুলোতে। কুলকুলির হাটকে ঘিরে কুমার গ্রামের আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। কারণ চা-বাগানের হাটটিকে বয়কট করে পাল্টা হাট বিজয় চক্রবর্তী নিয়ে আসেন বর্তমানের কুলকুলির হাটের জায়গায়। এই হাট বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বড় দলদলীর মঘা দেওয়ানী দাস। তারা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রিত হাটকে বয়কট করে, নতুন হাট চালু করে ইংরেজ সরকারকে চরম অপদস্থ করেন। নতুন হাটে সভা করে মঘা দেওয়ানীরা ঘোষণা করলেন খাজনা বয়কটের, বিলিতি কাপড়-চোপড় বর্জনের।

হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই,

মেহনতি মানুষের জাতিভেদ নাই।

জোতদারি ধ্বংস কর।

তেভাগা আইন পাশ কর।[৫]

বাংলার কৃষক সংগ্রামের পথে সবচাইতে বেশি উচ্চারিত ও আলোচিত আন্দোলনের নাম তেভাগা আন্দোলন। এত ব্যাপক, সুসংগঠিত এবং সুদূরপ্রসারী কৃষক সংগ্রাম স্বাধীনতার আগে তো বটেই পরেও আর দেখা যায় নি।

আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সংগ্রামী মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ খুব বেশি দূরে থাকে না। তাই দেখা গেল, সব ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মেহনতি মানুষের মিছিল শহরে ঢোকার পর নীলখামারিতে আতঙ্কের পরিবেশ দূর হয়ে আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তা চিত্রিত হয়েছে একটি ছড়ায়-

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই

উপস্থিত যুগান্তর

চলাচল নারী-নর

ঘুমাবার আর বেলা নাই,

উঠ, জাগো ডাকিতেছি তাই।[৬]

১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার আইন চালু করে। এই ব্যবস্থার সুযোগে তৈরি হওয়া জমিদার, জোতদার, তালুকদার, পত্তনিদার, মহাজনদের মিলিত প্রয়াসে বাংলার চিরবঞ্চিত কর্ষণজীবী সমাজের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হতে থাকে। এই অন্ধকারের, ভয়াবহতা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যিক, প্রশাসক বঙ্কিমচন্দ্রও। কৃষিজীবী মানুষের অসন্তোষ, আন্দোলনে দেশের কি অবস্থা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষ তার সাক্ষী আছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত একের পর এক বিদ্রোহের ঢেউ ব্রিটিশ মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের আন্দোলন সর্ব অর্থে হয়ত সফল হয়নি।

ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে মানবমুক্তির সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন যে একান্ত জরুরি একথা প্রথম বুঝেছিলেন এ দেশের বামপন্থিরা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি তৈরি এবং ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলার পত্রসায়রে প্রথম সম্মেলনের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা। পরবর্তী ১২ বছর বাঙলাদেশে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায় সেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই। সে জোয়ারের চাপে ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা স্যার ফ্যান্সিস ফ্লাউয়াকে চেয়ারম্যান করে একটি ভূমিরাজস্ব কমিশন গঠন করে। ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক কৃষকসভা কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি কমিশনের কাছে পেশ করে। এই স্মারকলিপিতে সরাসরি তেভাগার দাবি উত্থাপন করে অবিলম্বে তা পূরণের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন তা মেনে নিয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করে যে, এখন থেকে বর্গাদারদের প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু-ভাগ তাদের এবং এক ভাগ জোতদারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। কমিশনের সুপারিশে উৎসাহিত হয়ে সে বছরেই যশোহর জেলার পাজিয়াতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার চতুর্থ সম্মেলন। এখান থেকেই সর্বপ্রথম তেভাগা আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

চলরে কিষাণ বাজিয়ে বিষাণ

নিয়ে লাল নিশান সম্মেলনে চলরে

ও ভাই হিন্দু-মুসলমান

এক সাথে চল গড়ব মোরা নতুন দুনিয়া

সবে মিলে থাকব যেথা বিভেদ ভুলিয়া।[7]

তেভাগা আন্দোলনে যোগদানকারী কৃষকদের নিয়ে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মুজাফফর আহমেদ আর অভর্থনা সমিতির সভাপতি মণি সিংহ। এই সম্মেলনের তিনটি স্লোগান ছিল- ১. নিজের খামারে নিজের ধান তোলা। ২. আধি নয়, তেভাগা চাই ৩. কর্জা ধানের সুদ নাই। শুধু কৃষকের অধিকার আদায় সংক্রান্ত আওয়াজ তুলেই এই সম্মেলনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। এই সমবেত শক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করে মেহনতি মানুষের ঐক্য বজায় রাখা।

১৯৩৯ –এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার দু'দিন পর (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বড়লাট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বিনা পরামর্শে ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে জড়িত বলে ঘোষণা করে দেন। ৩রা সেপ্টম্বর এক অর্ডিনান্সে ঘোষণা করা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর ব্রিটিশ ভারতের শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধ চালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ, সর্ববিধ প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যবস্থা হল বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের কাছে তাঁদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য কী- এই প্রশ্নের যথোচিত জবাব না পেয়ে মন্ত্রীসভার সমস্ত কংগ্রেস সদস্যকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ফলে সংকট আরও ঘোরাল হল তার কারণ এর আগেই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামের মধ্যে সংঘাতের ফলে ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। তখন কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, রায় পন্থি এবং সহজানন্দ প্রমুখ নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একত্রে এক বাম সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলেন। এই কমিটি ৯ই জুলাই কংগ্রেস নেতৃত্বের উত্তরোত্তর অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্য সভা সমাবেশের ডাক দেয়। এর ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং ছয় বছরের জন্য তাঁর কংগ্রেসের কোন পদাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ হয়।

এরপর থেকে এতদিন ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে জাতীয় সমাবেশ ছিল তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে- ১. কংগ্রেস পরিচালিত ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন (ভারত

ছাড় আন্দোলন)। ২. জার্মান ও জাপান থেকে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আই. এন.এ. আন্দোলন, এবং ৩. কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধ আন্দোলন।[৮] তবে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের আক্রমণের ভয়ে সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে একটি আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা ধরা পড়েছে প্রচলিত একটি ছড়ায়ঃ

উইড়াছে জাপানি উড়ু জাহাজে

বোমা ফেলে কাতার কাতার,

মানুষ গরু সব এক সঙ্গে হইল কাবার।

সোনার দেশ এই ভারত ভূমি,

নাইরে দুঃখ নাইরে ব্যাধি,

তারা জোট পাতিয়ে বাধাইছে জঞ্জাল।[৯]

আধুনিক বাংলা ছড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র বিস্তৃত। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর হাতে জাপানের সব থেকে শক্তিশালী কোয়াংটুং বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ার পর, জাপান যখন সম্পূর্ণ পরাজয়ের মুখে হঠাৎ তখন (১৯৪৫) মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নির্দেশে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে অর্থাৎ জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ সমগ্র মানব সভ্যতাকে আতঙ্কিত করে তোলে। অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় তার ধিক্কার-

মুখ পোড়াটা অনুমান

জাপান পোড়ালি

জানিস কিরে সেই আগুনে

কাকে পোড়ালি?

মহাবীর অনুমান

মুখটি পোড়ালি

পোড়ালিরে জাতির মুখ

দেশের পোড়ালি। [১০]

ছড়াকারের ভাষায় 'অনুমান' অর্থে পারমাণবিক বোমাকে বোঝানো হয়েছে। আর একজন বিখ্যাত ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়াও পারমাণবিক বোমার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন একটি ছড়ায়-

লজ্জা পেল অগ্নিগিরি

টর্নেডো-ঝড় জলোচ্ছ্বাস,

সভ্য মানুষ করতে পারে

কেমন মহা সর্বনাশ!

এ্যাটম বোমার মরণ থাবা

এমন ভয়াল যায়নি ভাবা। ...[১১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়, মুসলমানদের পৃথক বাসভূমির দাবীও এর সঙ্গে যুক্ত। অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হয় সিমলা বৈঠকে(১৯৪৫)। কিন্তু... 'The Simla Conference of the representatives of the Congress, Muslim League and other met in June, 1945, the proceedings soon reached a deadlock.'[১২] তারই চিত্র পাই অন্নদাশঙ্করের ছড়ায়-

এতদিন যে নাচতে ছিলেম

তাক ধিন ধিন ধিন্না

বাড়া ভাতে ছাই দিলরে

কায়েদ আজম জিন্না।...

শোন রে ও ভাই রাশিয়ানরে

শোন রে ও ভাই চিন্না

পাকা ধানে মই দিলরে

কায়েদ আজম জিন্না।[১৩]

মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই তিনি ভারত বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। দিন স্থির হয় ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এর মধ্যরাতে দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে গান্ধিজী রইলেন কলকাতায়। দাঙ্গাবিধ্বস্ত

বেলেঘাটায় তিনি ছিলেন শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে। ১৫ আগস্ট তিনি অনশন করলেন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। খণ্ডবিচ্ছিন্ন ভারতের স্বাধীনতায় তিনি হলেন মর্মাহত। তিনি আহ্বান জানালেন সম্প্রীতির। কিন্তু রাষ্ট্রের সারাদেহ তখন বিষজর্জর। তার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে। বাংলা ও পাঞ্জাব তার বেদনার ভার বহন করল ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে। দেশ ভাগের কঠিন যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে অন্নদাশঙ্করের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছড়ায়: তেলের শিশি ভাঙলো বলে,

খুকুর পরে রাগ করো।

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা,

ভারত ভেঙে ভাগ করো

তার বেলা?[১৪]

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে দুই বাংলার রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। আর এই বিভক্তির ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ শত শত বছরের বাসভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় এবং বহন করতে হয় এই খণ্ডিত স্বাধীনতার বেদনা। এই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় একটি ছড়ায়-

এ পারেতে যাদের বাড়ি

খবরদার! রেখোনা দাড়ি

ও পারেতে যাদের বাড়ি

দাড়ি গজাও তাড়াতাড়ি।[১৫]

পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং উপনিবেশ বিরোধিতার জন্য এই ধরনের ছড়ার উদ্ভব হলেও এর আসল উদ্দেশ্য জনমত গঠন। যে কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও রাজনৈতিক ছড়ার মত জনপ্রিয় আঙ্গিকের ব্যবহার কোনভাবে হ্রাস পায়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের রায়ই শেষ কথা, কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দমত প্রার্থীকে নির্বাচিত করেন, তাই গণদেবতাই গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ। আর এই জনমত অনুকূলে রাখার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নানাভাবে জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম ভোটের ছড়া এবং ব্যঙ্গচিত্র। লক্ষ্য করার বিষয় এই সকল ভোটের

ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য যেমন- কোনটা ব্যঙ্গ, কোনটা প্রতিবাদ, কোনটা বিবৃতি, বিবরণ, মন্তব্য, কোথাও থাকে স্লোগান, কোথাও তিরস্কার, আবার কোথাও বা আহ্বান। আর এই সকল ছড়া ও ব্যঙ্গচিত্রগুলি কোন রাজনৈতিক অবস্থানে সৃষ্টি তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নানা বিষয়ে হেটো ছড়া, বারোমাস, এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৫৬-৬০।

২. বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৩৪।

৩. বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদনা কমলেশ গোস্বামী, পৃ. ২৮৬। এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল রয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে: বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৫।

৪. বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৫।

৫. বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদনা কমলেশ গোস্বামী, পৃ. ২১৩। এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল রয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে: বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৬।

৬. বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৮।

৭. বাঙলা ছড়ায় বাঙালাদেশের ইতিহাস, সুস্মিতা সোম, সোপান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪৯।

৮. মুক্তি সংগ্রামে ভারত (আলেখ্য গ্রন্থ), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

৯. ছড়ার অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা- বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৪।

১০. ছড়া সমগ্র (উড়কি ধানের মুড়কি), অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২১০।

১১. ছড়া সমগ্র, সুকুমার বড়ুয়া, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২০।

১২. Dutt R. Palme: India Today, India, pp. 574. এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল রয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে: Collins, larry and Lapierr, Dominiane Mountbatten and the Partition of India, University Press Ltd, Dhaka, 1982, pp.55-59.

১৩. ছড়া সমগ্র (উড়কি ধানের মুড়কি), অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২১০।

১৪. ছড়া সমগ্র (উড়কি ধানের মুড়কি), অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২১০।

১৫. ছড়া সমগ্র (উড়কি ধানের মুড়কি), অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৬৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়- রাজনীতি: প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে ছড়ার ভূমিকা

২.১. রাজনীতি প্রচারের অন্যান্য মাধ্যম।

২.২. গণমাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকা।

সংযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম মাসমিডিয়া বা গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যমের শক্তির শেষ নেই, দিনের পর দিন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রযুক্তি আমদানির ক্ষেত্রে কিছু দেশ একটা অসাধারণ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এবং সেই সূত্রে গণমাধ্যমের রকমারি আধুনিক ব্যবস্থা আজ আমাদের শুধু পরিচিত নয়, আমাদের সকলেরই প্রায় কম-বেশি আয়ত্তের মধ্যে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন অপরিহার্য আর সেই নির্বাচনী প্রচারে গণমাধ্যম যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে অথবা নিজের দল, নিজের নেতা বা নেত্রী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে কিংবা রাজনৈতিক আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়। গণমাধ্যমগুলি হল- মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, স্লোগান, পথনাটিকা, গণসঙ্গীত, নানারকমের সংবাদপত্র, পত্রিকা, পুস্তক, পার্টি ইস্তেহার, হ্যাণ্ডবিল, পথে প্রান্তরে প্রদর্শিত ব্যানার, হোর্ডিং, ফ্লেক্স, বেতার, দূরদর্শন, Social Media দেওয়াল লিখন ও রাজনৈতিক ছড়া। এই মাধ্যমগুলির নিরিখে প্রচারের ধরনও বদলে যায়। কোন প্রচার শুধুমাত্র দৃশ্য, কোনটি কেবলমাত্র শ্রাব্য আবার কোন প্রচার একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য। যেমন বেতারে প্রচারিত রাজনৈতিক প্রচার কেবলমাত্র শ্রাব্য, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রচার কেবল দৃশ্য কিন্তু দূরদর্শনে প্রদর্শিত প্রচার একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য। রাজনৈতিক প্রচারে এই সকল মাধ্যমগুলির ভূমিকা নিম্নে সূত্রাকারে আলোচনা করা হল-

২.১. রাজনীতি প্রচারের অন্যান্য মাধ্যমঃ

পথনাটিকা: Public Opinion বা জনমত গঠনে Street Drama বা পথনাটিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলেরই একটি করে সাংস্কৃতিক কর্মীসমৃদ্ধ সংগঠন থাকে। বলাবাহুল্য এই সংগঠনের সদস্যরা ঐ বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সদস্য। এরা নিয়মিতভাবে সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয় এবং আবৃত্তির নিয়মিত অনুশীলন করে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজে লাগায়। সচরাচর রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হবার পর, রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনের পরে পথনাটিকা আয়োজিত হয়। কেননা তা না হলে দর্শক বা শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত থাকবে না। তাদের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতেই রাজনৈতিক সভার শেষে পথনাটিকাকে বিশেষ আকর্ষণ রূপে উপস্থাপিত করা হয়। পথনাটিকার জন্য তেমন বড় মাপের স্টেজ প্রয়োজন হয় না।

রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করার মঞ্চকেই অভিনয় মঞ্চ রূপে ব্যবহার করা হয়। চরিত্র থাকে গুটিকয়েক, মোটামুটি কুশীলবরা নিজেদের সাজসজ্জা নিজেরাই করে নেন। পথনাটিকায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সর্বাধিক। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের স্বরূপকে উন্মোচিত করা। প্রতিপক্ষের দ্বিচারিতাকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করা হয়, তাদের শোষণ পীড়ন এবং জনগণের প্রতি দায়হীনতাকে বড় করে দেখানো হয়। দর্শককুল এই ধরনের নাটক দেখতে পছন্দ করেন এবং উপভোগ করেন।পথনাটিকাগুলিতে কোন বিরতি থাকে না, নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিনয় বলে, এগুলি হয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের। পথনাটিকাগুলি রচনা করেন বিশেষ রাজনৈতিক দলের শুভানুধ্যায়ীরা কেউ কেউ। বস্তুতপক্ষে জনমত গঠনে পথনাটিকাগুলির স্ববিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

গণসঙ্গীত: গণসঙ্গীত বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সঙ্গীত, বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শকে উপজীব্য করে গণসঙ্গীত রচিত হয়। মানবতার স্বপক্ষে, সর্বপ্রকার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দেওয়া হয়। গণসঙ্গীত কখনও একক সঙ্গীত নয় তা সমবেত সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে কোন কোমলতা, পেলবতার স্থান নেই। কি শব্দচয়নে কি সুরারোপে উভয় ক্ষেত্রে এক। রৌদ্র রসের প্রাধান্য দেখা যায়, গণসঙ্গীতে কবিত্বের অংশ কম। বীর্যরসের প্রাধান্য এবং সৌম্যের আধিপত্য লক্ষণীয়। এই গান শুনলে শ্রোতার মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একটি নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি তার প্রবণতা তৈরি হয়। গণসঙ্গীত হল উচ্চ কণ্ঠের গান, উচ্চগ্রামে তা গীত হয়, লঘুতাকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। গণসঙ্গীত মূলত গ্রুপ সঙ, দলগতভাবে গীত হয়।

ফেস্টুন, ব্যানার, হোর্ডিং: যে কোন জনবহুল স্থান যেমন- রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, বাসস্ট্যাণ্ড, বাজার প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের ফেস্টুন, ব্যানার, হোর্ডিং চোখে পড়ে। এগুলির মাধ্যমে মূলত খেলা, বিনোদন, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, সরকারিভাবে কোন সচেতনতা (ক্রেতাসুরক্ষা) বা সতর্কতা (ডেঙ্গু) মূলক বিজ্ঞাপন অথবা নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এই প্রচার মাধ্যমগুলির কাজ জনমানসে বক্তব্য বিষয় প্রদর্শিত করা। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা তাদের বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরেন, ঠিক তেমনি এই সকল গণমাধ্যমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বক্তব্য জাহির করেন। শাসক দল তার নীতি আদর্শের পাশাপাশি ভালো কাজের খতিয়ান এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরেন জনগণের সামনে। কিন্তু বিরোধী দলগুলি কেবল তাদের নীতি আদর্শের কথা নয়, বিভিন্ন

সামাজিক সমস্যা এবং শাসক দলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরেন। জনমত গঠনে ফেস্টুন, হোর্ডিং, ব্যানার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পার্টি ইস্তেহারঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে সব রাজনৈতিক দলই পার্টি ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এই পার্টি ইস্তেহার মূলত চটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের জন্য ব্যবহৃত। পূর্ববর্তী শাসক দলের তুলনায় বর্তমান শাসক দল কত বেশি উন্নতি করেছে; বর্তমানে শাসক দল আরও কি কি জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে এবং নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ করলে আরও কি কি নতুন উন্নয়নমূলক কাজ হবে তার তালিকা প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে বিরোধী দলগুলিও শাসক দলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরেন, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং নির্বাচনে জয়লাভ করলে কোন কোন উন্নয়নে বেশি জোর দেওয়া হবে তার তালিকা প্রদান করা হয় দলীয় পার্টি ইস্তেহারে। অর্থাৎ পার্টি ইস্তেহার হল প্রতিশ্রুতি পালন, প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের লিখিত দলিল।

হ্যাণ্ড বিল: যে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হ্যাণ্ডবিল ব্যবহার করা হয়। বিষয়ের তারতম্যের কারণে হ্যাণ্ডবিলগুলির ভাষা ও আকার পাল্টে যায়। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বক্তব্য বিষয় কখনও জনগণকে সম্বোধন করে খোলা চিঠির আকারে, কখনও ধিক্কার বা প্রতিবাদ জানিয়ে, কখনও আবার নিছক নির্বাচনী প্রচারের (দলীয় প্রতীক বা দলীয় প্রার্থী) জন্য হ্যাণ্ডবিলের সাহায্য নেয়। এই ধরনের হ্যাণ্ডবিলগুলি বিভিন্ন জনবহুল স্থানে দেওয়া হয় এবং দলীয় কর্মী সমর্থকরা এগুলি দিয়ে থাকেন। নির্বাচন ছাড়াও বছরের যে কোন সময় এই ধরনের হ্যাণ্ডবিল প্রদান করা হয়। এই প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সক্ষম হন।

পত্র-পত্রিকা, পুস্তক: আমরা জানি বড় রাজনৈতিক দলগুলির অনেকের নিজস্ব মুখপত্র আছে। এই মুখপত্রগুলি কোনটি দৈনিক কোনটি সাপ্তাহিক আবার কোনটি মাসিক। যেমন- পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই.(এম)- এর মুখপত্র 'গণশক্তি'(দৈনিক), তৃণমূলের 'জাগো বাংলা' (সাপ্তাহিক), এস. ইউ. সি. আই- এর 'গণদাবী' (সাপ্তাহিক)। এছাড়াও অনেক পত্র-পত্রিকা আছে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র না হলেও কোন কোন দলের মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি করে Cultural Front থাকে এবং সাথে যুক্ত থাকেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রফেসর, লব্ধ

প্রতিষ্ঠিত লেখক গোষ্ঠী, ডাক্তার, আইনজীবী, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াবিদ, প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সদস্য, আবার অনেকে আছেন যারা প্রত্যক্ষ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন কিন্তু কোন একটি দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী। দলীয় নীতি আদর্শের কথা মাথায় রেখে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দলীয় মুখপত্রে কিংবা স্বতন্ত্র পুস্তকে। আর এই সকল লেখা সাধারণ মানুষ পাঠ করে দলীয় নীতি আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং উদ্বুদ্ধ হন। সাধারণ মানুষের কাছে দলীয় গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এই সকল মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিটিং, মিছিল, স্লোগান: জনমত গঠনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হল মিটিং, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি। আর এই মিটিং মিছিলের অপরিহার্য অংশ হল স্লোগান। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে দলীয় নেতা-নেত্রীগণ সাধারণ দলীয় কর্মীদেরকে একত্রিত করেন বা সংঘবদ্ধ করেন। মিছিলের অগ্রভাগে শীর্ষস্থানীয় নেতা বা নেত্রী স্লোগান আওড়াতে থাকেন আর সাধারণ কর্মীগণ ধুয়ো ধরার মতো সেই শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এইভাবে মিছিল নির্দিষ্ট লক্ষে এগিয়ে চলে। এই স্লোগানগুলি রচিত হয় যে কোন সামাজিক সমস্যাকে উপজীব্য করে, বিরুদ্ধ দলকে আক্রমণ করে কিংবা দলীয় নীতি আদর্শকে মান্যতা দিয়ে। রাজনৈতিক জনসভা বা সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় নেতা নেতৃগণ তাদের তীক্ষ্ণ ভাষণের দ্বারা দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের মনোবল বাড়ান, দলীয় নীতি আদর্শের পথে চালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করেন।

বেতার ও দূরদর্শন: ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং বহু গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। বেতার মাধ্যম সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মানুষ আজও বেতারের সাহায্যে দেশ বিদেশের খবরাখবর পেয়ে থাকেন। যদিও প্রায় প্রত্যেক মোবাইলে এফ. এম. রেডিও থাকায় বর্তমানে রেডিও-র প্রচলন অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে। আবার দুর্গম স্থানে খবর পৌঁছে দিতে বেতার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে রাজনৈতিক বক্তব্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বেতার মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়।

দূরদর্শনের সাহায্যে কোন সংবাদ দর্শক বা শ্রোতার কাছে দৃশ্য এবং শ্রাব্য উভয় ভাবেই পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূরদর্শন অত্যধিক জনপ্রিয় একটি গণমাধ্যম হিসাবে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে কোন বক্তব্য খুব সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দূরদর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক প্রচারেও যে দূরদর্শনের সাহায্য নেওয়া হবে সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে প্রথম রাজনৈতিক প্রচার কেমন ছিল সে বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন-১৯৭৭ সালের ২রা মে প্রকাশিত একটি সংবাদঃ 'টিভি ও বেতারে নির্বাচনী প্রচারের প্রথম সুযোগ'

> বিশেষসংবাদ; নয়াদিল্লি, ২০মেঃ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শন থেকে তাদের নির্বাচনী বক্তব্য প্রচারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে প্রত্যেকটি দলকে দুবার আকাশবাণীতে এবং একবার দূরদর্শনে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে। প্রতিবার সময় দেওয়া হবে ১৫ মিনিট করে। ২৫শে মে থেকে ৭ই জুনের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকবে। কোন দল আগে প্রচার করবেন তা স্থির করা হবে লটারির সাহায্যে।[১]

বিগত কয়েকটি নির্বাচনে প্রায় সব দলেরই কোন না কোন প্রার্থী তথা প্রতীক চিহ্নের ছবি ছেপে ভোট প্রার্থনা করা হয়েছে। ২০০১ থেকে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের ক্রম বৃদ্ধিতে ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৯ লোকসভা নির্বাচন, ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে রেডিও ও দূরদর্শন মাধ্যমেও দলের ভোট প্রার্থী ও প্রতীক চিহ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে Social Media অর্থাৎ twitter, what's App, Facebook, Messenger এর মাধ্যমেও নির্বাচনী প্রচার করা হয়েছে।

২.২. গণমাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকাঃ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার জন্য নির্বাচন হত। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হত না। ভোট দাতাদের সম্পত্তির মালিক হতে হত, একটি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার হত। ফলে সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ১২-১৩ ভাগের মতো মানুষ ভোট দিতে পারতেন। তখন ভোট নিয়ে এত উত্তেজনা, এত বিজ্ঞাপন, এত মিটিং-মিছিল, মারামারি টাকার খেলা ছিল না। ভোট প্রার্থীরা ভোট দাতাদের বাড়ী যেতেন, কয়েকটি মিটিং হত এটুকুই। ভোট প্রার্থীরা নানা রকমের প্রতিশ্রুতি

দিতেন, যেমন হয়। যথারীতি প্রতিশ্রুতি রাখতে পারতেন না। এসব নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হত সে সময়ের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায়, যেমন- মজলিস, বিদূষক, অবতার, ইত্যাদি। একটি পত্রিকার নামই ছিল 'ভোটরঙ্গ'। বেশ কয়েক বছর টিঁকেও ছিল। ঐ সব কাগজে–ভোটমঙ্গল, ভোটরহস্য, ভোটসন্দর্ভ, ভোটামৃত ইত্যাদি কবিতা, ছড়া, গান ছাপা হত।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রাকলগ্নে এত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রমরমা ছিল না, তখন নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল রাজনৈতিক ছড়া। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদ্যুতিন অর্থাৎ টিভি, রেডিও, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজলভ্য হলেও নির্বাচনী প্রচারে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া তার ঐতিহ্য হারায়নি বরং আগের তুলনায় আরো বেশি মাত্রায় দেওয়াল লিখন লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক—

> ভোটের হাওয়া তেতে উঠলেই দেয়ালে দেয়ালে যুদ্ধে মেতে ওঠে অক্ষর সৈন্য। যুক্তি, তক্ক, স্লোগান ইত্যাদির সঙ্গে সামিল হয় ছড়াও। ভোট শেষ হলে রোদবৃষ্টি কিংবা নতুন স্লোগান বা বিজ্ঞাপনের কাগজ ছড়াগুলিকে ঢেকে দেয়। প্রেক্ষাপট পাল্টায়। নতুন নতুন ছড়ার গর্ভসঞ্চার হতে থাকে। পরবর্তী নির্বাচনে জন্ম নেয় নতুন ছড়া। ওই ছড়ানো ছড়াগুলির মধ্যে শুধু রাজনীতিই নয়, মাখামাখি করে থাকে ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অভিঘাত।[২]

ছড়ার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যেই বিভিন্ন কাজে ছড়ার ব্যবহার হয় বহুদিন ধরে— প্রচারের কাজে তো বটেই। সুতরাং নির্বাচনের কাজে ছড়া তো ব্যবহার হবেই। তবে পশ্চিমবাংলাতেই ছড়ার ব্যবহার বেশি। অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশেও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারের কাজে ছড়ার চলন আছে। তবে পশ্চিমবাংলার মত ব্যাপক নয়। যেমন— ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের সময় জোড়া বলদের দল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

জোড়া বলদ টানছে মই,

উড়কি ধানের মুড়কি খই।

জোড়া বলদ করছে চাষ,

দ্বিগুণ ফসল বারোমাস।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিরুদ্ধ দলের দেওয়াল লিখনঃ

জোড়া বলদ মারছে লাথ,

গরিবের নাই পেটে ভাত।

কোথায় দুধ কোথায় দই,

গাছে তুলে কাড়ছে মই। ৮

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের জনদরদী ভূমিকার অন্তরালে যে শোষকের ভূমিকা সেই স্বরূপকে চিহ্নিত করতে, বিশেষত নির্বাচনের সময় ভোটারদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ছড়ার সৃষ্টি। প্রশ্ন উঠবে রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বিশেষ করে ছড়াকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন? এর উত্তর খুব সহজ ও স্পষ্ট। এর গণমাধ্যম রূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা। ছড়া মানেই ছন্দবদ্ধ রচনা। যা ছন্দবদ্ধ তা সহজেই পাঠকের বা শ্রোতার মনে গাঁথা হয়ে যায়। শত বক্তৃতাতে কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রচারে যে কাজ না হয় দু-চার পংক্তির ছড়ায় তার বহু গুণ ফল মেলে। ছড়ার আঙ্গিকটি সাধারণের কাছে পরিচিত। কেবল সেই আঙ্গিকের সাহায্যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়। গদ্যের নিরসতা মুক্ত, এর ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী, তাছাড়া দুটি বা চারটি পংক্তিতে যে কথা বলা হয় তা পাঠক বা শ্রোতার মনে বদ্ধ মূল হয়ে ওঠে, বক্তব্য মরমে গিয়ে প্রবেশ করে এবং সহজে আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই কি দুই বাংলায় রাজনৈতিক ছড়ার এত প্রাচুর্য?

সচরাচর রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারাও প্রচুর রাজনৈতিক ছড়া মুদ্রিত হতে দেখা যায়। প্রাচীরের সীমিত পরিসরে রাজনৈতিক ছড়ার আত্মপ্রকাশ। পরিসর স্বল্প, তাই রাজনৈতিক ছড়া দীর্ঘায়িত হয় না, নানা বক্তব্য অথবা তথ্যে তা কণ্টকাকীর্ণ হয় না। জনমানসের কথা মনে রেখে নিতান্ত পরিচিত বক্তব্যকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সহজেই রাজনৈতিক ছড়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষ এইসব ছড়া পাঠ করে বা শুনে বিচিত্র আনন্দ পায়। তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ব্যঙ্গে এগুলি হয় মর্মভেদী। তাই প্রচার মাধ্যম হিসাবে ছড়ার জুড়ি মেলা ভার। তাই শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশে কিংবা আক্রমণ-

প্রতিআক্রমণেই ছড়ার ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয় ব্যবসায়িক প্রচারেও ছড়ার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫২-২০১৬ –র বিধানসভা নির্বাচনই হোক, আর যে কোন লোকসভা নির্বাচন হোক পরিবর্তন নিঃশব্দে আসেনি। আর যদিও বা কোন ক্ষেত্রে তা ঘটে থাকে দেওয়ালের কানে সে খবর ছিল। জনমতের অনেক পূর্বেই দেওয়াল লিখন সম্ভাব্য একটা নির্বাচনী ফল দেয় বইকি। ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির শোচনীয় পরাজয় বা পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্টের উত্থান, এ তো নির্বাচনী ফল ঘোষণার অনেক আগে থেকে দেওয়াল জানে, কেননা নীরব-নিষ্ঠ শ্রোতা হিসাবে তার জুড়ি মেলা ভার। এরপর নির্বাচনের ইতিহাসে বৃহৎ পরিবর্তন পশ্চিম বাংলায় ২০১১ কিংবা কেন্দ্রে ২০১৪। এখানেও পরিবর্তনের প্রথম প্রতিফলন দেওয়ালে। আমাদের অনেক আগেই দেওয়াল শোনে। আর যে ঠিক শোনে সে সঠিক উচ্চারণে বলে, কি হতে চলেছে। নির্বাচনের ইতিহাসে সবকটি ব্যাপকতর পরিবর্তনের লিখন, অনেক আগেই আগাম অমোঘ বক্তব্য হয়ে ফুটে উঠেছে দেওয়াল লিখনে।

বিষয়বস্তুর নিরিখে, স্রষ্টার নিরিখে ও ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের নিরিখে লৌকিক ছড়া ও সাহিত্যিক ছড়ার মাঝখানেই যেন রাখতে হয় দেওয়াল লিখনে ব্যবহৃত রাজনৈতিক ছড়াগুলিকে। স্রষ্টার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে লৌকিক ছড়া থেকে কীভাবে এই ধরনের ছড়া বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। লৌকিক ছড়া কোন শিল্প সচেতন বা সমাজ সচেতন ব্যক্তি প্রতিভার সৃষ্টি নয়। এগুলি ধুলো মাটি মাখা সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সৃষ্টি। রাজনৈতিক ছড়াগুলিতে এই ধুলোমাটি মাখা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ কখনোই মিলবে না, কারণ রাজনীতিতে আবেগের স্থান নেই, তাই আবেগ বর্জিত কঠিন বাস্তবতা সেখানে লক্ষণীয়। রাজনৈতিক ছড়াগুলি শিক্ষিত সচেতন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই সব ছড়ার নির্মাতারা পেশা ও নেশাগতভাবে সাহিত্যিক বা আক্ষরিক অর্থে ছড়াকার নন, তাঁরা হয়ত কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক। যদিও ছড়া রচনার প্রতিভা অবশ্যই তাঁদের আছে। এই সকল ছড়া শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় না তা মূলত পরিণত বয়স্ক মানুষের বোঝার বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১. আবির কর, ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৪১২, কলকাতা-৭, পৃ.৮৮।

২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আলাপ বিলাপ, কোরক, বাগুইআটি, কলকাতা-৫৯, ২০১২, পৃ. ৬৯।

৩. (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪)

তৃতীয় অধ্যায়: রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার

৩.১ অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

৩.২ লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

ক. দাদাঠাকুর ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

খ. অন্নদাশঙ্কর রায়।

গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ঘ. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঙ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

চ. শঙ্খ ঘোষ।

ছ. জয়দেব বসু।

জ. বিবিধ।

রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত মানুষের কাছে চিত্তবিনোদনের এক বিশ্বস্ত মাধ্যম রাজনৈতিক ছড়া। বাংলা ছড়াগুলি কেবলমাত্র ছেলেভুলানো ছড়া, নর-নারী কেন্দ্রিক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়ার প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় বাংলা ছড়ায় যেমন রসবোধ, সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষার বুনন আছে তেমনি মানুষকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতাও আছে। সাম্প্রতিক দুই বাংলার রাজনৈতিক ছড়ায় সমকালীন জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ছড়ার অর্থপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে। ছড়ার মধ্যে যে সমাজ-ইতিহাসের উপাদান রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ, পরে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে যেটি প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখলেন- " বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজ ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে..." ।[১] অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে সমাজ ইতিহাস লুকিয়ে থাকে তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্বই যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছে। রাজনীতিকে বলা হয় রাজ্য শাসন বা রাষ্ট্র চালনার নীতি। রাজনীতির কেন্দ্রে আছে ক্ষমতা। ক্ষমতার নানা রকম বণ্টনকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ যদি যথাযথ ভাবে বণ্টিত না হয়, তাহলে সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা। শুধুমাত্র বণ্টন নয় একে রক্ষা করা সেই সঙ্গে এর উৎপাদন তথা জোগানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও জরুরি। সম্পদ প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয়ই হতে পারে, উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় প্রাথমিকভাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই উৎপাদন বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ তথা নিয়ম নীতি নির্ধারণ হবে কিভাবে? এখানেই রাজনীতির অনুপ্রবেশ। স্পষ্টতই তা মানুষের নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক "দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশ গ্রহণ একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক যুগের রাজনীতি তাই শুধুমাত্র রাজায় রাজায় লড়াই নয়, গণতন্ত্রের বিকশিত চেতনার ফলে জনমত তাতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ" ।[২] আর এই জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম হল রাজনৈতিক ছড়া।

আবার অনেক সময় ছড়ায় রাজনৈতিক উত্থান পতন কিংবা সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম হচ্ছে। এমনকি ছড়ার ছন্দে রচিত হচ্ছে রাজনৈতিক গান কিংবা স্লোগান। সাধারণত এসব গান কিংবা শ্লোগানে থাকে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ইঙ্গিতপূর্ণ চটকদারি কথামালা।

এগুলোর অনেকেই হয়ত মূল্যায়ণ চাইবেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে মৌখিকভাবে স্লোগান সদৃশ ছড়াগুলিতে তির্যক বিদ্রুপ বাণ ও লোকসাধারণের এক কৌতুকপূর্ণ রসবোধের পরিচয় বিদ্যমান অতএব বোঝা যায় সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলোও অর্থবোধে কালোপযোগী বিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সংজ্ঞা দানেও এসেছে যুগোপযোগী পরিবর্তন। এখন এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলির উৎসের সন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মূলত দুটি পদ্ধতিতে এই সকল ছড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা-

১। অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

২। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া।

৩.১ অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া:

বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে অথবা নিজের দল, নিজের নেতা বা নেত্রী নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে যেমন- ফেস্টুন, হোর্ডিং, ব্যানার, পার্টি ইস্তেহার, পুস্তক, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। সেই সঙ্গে দেওয়াল লিখনে রাজনৈতিক ছড়া ব্যবহৃত হয় ব্যাপকভাবে। এই পদ্ধতি দুই বাংলায় সমানভাবে অনুসৃত হয়। এখন প্রশ্ন হল এই ছড়ার রচয়িতা কে বা কারা? আসলে দেওয়াল লিখনে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লক্ষ্য করা যায়, তার কোনটাতেই স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না। কেবলমাত্র দলীয় প্রতীক চিহ্ন, প্রার্থীর নাম, দলের নাম ইত্যাদি থাকে। স্রষ্টার নাম অজ্ঞাত থাকে। যার ফলে এই সকল ছড়াগুলি কোন ব্যক্তি নামে প্রচারিত না হয়ে কেবলমাত্র দলের নামে প্রচার লাভ করে। তবে একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই অজ্ঞাতনামা রচয়িতাগণ আর কেউ নন তাঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতাদর্শগতভাবে যুক্ত। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি cultural front বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত সকল সদস্যগণ কোন না কোনভাবে জনসংযোগের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের মধ্যে যেমন কেউ কবি, কেউ বা বড় নাট্যকার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী (গায়ক), ডাক্তার, আমলা প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমাজের অন্য সকলেরমত তাঁরাও কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়ালে দেওয়ালে যে সমস্ত রাজনৈতিক কার্টুন ও ছড়া লক্ষ্য করা যায় তার স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না। কিন্তু এই সকল ছড়া পাঠ করলে বোঝা যায় যে এগুলি অতি সাধারণ পার্টি কর্মীর মস্তিষ্ক প্রসূত লেখা নয়, এগুলি আসলে পাকা হাতের লেখা। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে, যথা-

আগে বেচতো চা,
হাতে ছিল কেটলি।
এখন বেচছে দেশ,
সাথে আছে অরুণ জেটলি।[৩]

উক্ত ছড়াটির যথাযথ অর্থ বুঝতে গেলে পাঠককে যথেষ্ট রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। উক্ত ছড়াটিতে যে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ বাণ ও তীব্র ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আর যাই হোক খুব কাঁচা হাতের লেখা নয়। সহজেই অনুমেয় যে এগুলি পার্টির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বারা রচিত। উক্ত ছড়াটির প্রথম চরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শৈশবে 'চা' বিক্রির কথা

তুলে ধরে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে 'পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক'-এর সাথে কয়েক হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় গুজরাটের হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী ও মেহুল চেক্সী। পাশাপাশি ৮ নভেম্বর ২০১৬ নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় মোদী সরকার। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর কালো টাকা সাদা হয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ এবং এই অভিযোগের তীর কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর দিকে নয়, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দিকেও। এককথায় বলা যায় উক্ত ছড়াটিতে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী দুজনকেই সমান দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর থেকে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে এই ধরনের ছড়াগুলি খুব সাধারণ পার্টিকর্মীর লেখা নয়। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে দুই বাংলার অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া বা দেওয়াল লিখনের ছড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩.২ লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া:

লোকছড়ার ক্ষেত্রে ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিরই সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে একদা স্মৃতি নির্ভর এই ছড়া ছড়িয়ে গেছে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে। সমষ্টিগত মানুষের সেই ছন্দিত ফসল আকর্ষণ করেছে আধুনিক কবিমানসকেও। ছড়ার আধারে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ছড়াকার হিসেবে সুকুমার রায়ের বহুল পরিচিতি। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া তাঁর উপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক কবি প্রতিভার বিপুল ও সমৃদ্ধ প্রকাশ ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে যায় জনপ্রিয়তায়। ছড়া লিখেছেন রবীন্দ্র পরবর্তীকালের সকল বড় কবিরাই- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমনকি তারও পরবর্তীকালে অমিতাভ চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখরা। ফলে গ্রামীণ ছড়ার আঙ্গিকে লেগেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, লোকায়ত শিল্পে লেগেছে ব্যক্তিগত রং।

বাঙালি শিশু মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে মায়ের মুখের নানা প্রকার ছড়া-কবিতার যে রস পান করে থাকে তার সংস্কার সে কোন দিনই ভুলতে পারে না। কথাটি অসত্য নয়। শৈশবের সংস্কার পরবর্তী জীবনেও অনেকাংশে কার্যকর হয়। তাইত লৌকিক ছড়ার ভাব ভাষা, রূপ ও ছন্দ সাধারণ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আধুনিক কালের কবি ও সুসাহিত্যিকগণকেও ছড়া রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। একালের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ছড়া বিষয়ে ধীমান দাশগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকারের এক প্রশ্নের উত্তরে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন- *"এটা তো আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্টিভ সেন্সটা আর নেই। আজ প্রত্যেকের লেখার একটা ঢং এসেছে। মিল, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমার টা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া। সকলে মিলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তবেই ছড়া বেঁচে থাকবে। নয়ত নয়"*।[৪]

বাংলার সংস্কৃতি সহজ সরল, গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী। বাংলার ছড়াগুলোতে এই ঐতিহ্য, নান্দনিকতা, সামাজিক সচেতনতা সম্পৃক্ত বিষয়গুলো অবলীলায় প্রকাশিত হয়। ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কোন সামাজিক অবস্থা, অসামঞ্জস্য ও প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে এগুলো রচিত হয়েছে। আধুনিক ছড়াকারেরা তাঁদের রচনায় আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ছড়ার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এই ছড়াগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন করে উদ্দীপনা আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ভারতকে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য কামনা করেন। মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯১৪) কংগ্রেস ইংরেজদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের সক্রিয় প্রচারের পর বাঙালিও যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করে। আধুনিক ছড়াকারেরা বাঙালির প্রথম মহাযুদ্ধ যাত্রাকে মূলত ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেছেন। সুকুমার রায়ের সে ছবি চিত্রিত হয়েছে-

ওই আমাদের পাগলা জগাই, নিত্য হেথায় আসে,

আপন মনে গুণ গুনিয়ে মুচকি হাসি হাসে...

চেঁচিয়ে বলে, ফাঁদ পেতেছে? জগাই কি তায় পড়ে,

সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে...

হাত পা ছুঁড়ে চেঁচায় খালি চোখটি করে ঘোলা;

জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা।...[৫]

এমনকি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম নিজে মহাযুদ্ধের সৈনিক হলেও তাঁর রচিত ছড়ায় সমজাতীয় ব্যঙ্গ লক্ষণীয়-

মুটকু মাইতি বাঁটকুল রায়

ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়

বেঁটে খাটো নিটপিটে পায়

ছেৎরে চলে কেৎরে চায়।...

রাস্তায় তেড়ে এল এঁড়ে এক দামড়া

ঢুসু খেয়ে বাঁটকুর ছড়ে গেল চামড়া।[৬]

ছড়াগুলি পড়লে মনে হয় বাঙালির যুদ্ধযাত্রা সে সময় নানা হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করেছিল। অবশ্য সমাজ সচেতন ছড়াকার স্বাধীনতা লাভের আশায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতা করাকে সঠিক মনে করেননি। বরং ইংরেজদের শঠতা সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন এভাবে-

আর যেখানে যাওনারে ভাই সপ্তসাগর পার

কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার।

সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ি

কাতুকুতুর কুলপি খেয়ে ছিড়বে পেটের নাড়ি...

বিদঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন দেশি

শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি।[৭]

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা প্রদানে ব্রিটিশ সরকারের অযথা বিলম্ব প্রমাণ করে ছড়াকারের এই সতর্কবাণী কতটা সত্য ছিল।

মহাযুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে বিলেতী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সূচনাতে সমগ্র ভারতের ভারতবাসীর জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। সুকুমার রায়ের ছড়ায় পাই তার চিত্র-

কেমন করে চাটনি বানায়, কেমন করে পোলাও করে

হরেক রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখছে ফলাও করে।

সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দা কেতা,...[৮]

ক. *দাদাঠাকুর ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১২৮৮-১৩৭৫):*

বাংলার অনন্য চরিত্র, তেজস্বী ও হাস্যরসিক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই একই তারিখ ১৩ বৈশাখে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর ছড়া রচনার শুরু ইস্কুল থেকেই। কলেজে পাঠগ্রহণের সময় থেকেই তাঁর রচিত ছড়া জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। তৎকালীন সময়ের নানা সামাজিক সমস্যা ধরা পড়েছে তাঁর রচিত একাধিক রসালো ছড়ায়। সে সময় ভোট নিয়ে এত উত্তেজনা, এত মাইক, মারামারি, টাকার খেলা ছিল না।

দাদাঠাকুর ছিলেন একাই একশো অর্থাৎ তিনি লেখক তিনি কম্পোজিটর, তিনিই মুদ্রাকর, তিনিই প্রকাশক, তিনি সম্পাদক আবার তিনিই কাগজখানার হকার বা বিক্রেতা। কাগজটির নাম 'জঙ্গীপুর সংবাদ'। তাঁর বিখ্যাত 'বিদূষক' পত্রিকাটি রঘুনাথগঞ্জে নিজ প্রেসে ছেপে তিনি কাগজখানি কলকাতায় এনে রাস্তায় ফেরি করে বিক্রি করতেন। কাগজখানি ছিল আগাগোড়া কবিতা এবং ছড়ায় ভরা। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ খবর ছাড়াও রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা কাগজখানিকে বিশেষ উপভোগ্য করে তুলেছিল পাঠক মহলে। কলকাতা শহরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় চলছে ক্যাম্পেনিং। এই প্রাক নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় 'ভোটামৃত' নামে একটি গান রচনা করলেন। প্রসঙ্গত এই গানটি তৎকালীন সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল-

আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারি সাজিনু

ফিরিনুগো দ্বারে দ্বারে।

মোরে 'হ্যাঁ' ছাড়া কেউ 'না' বলিল না

ক্যানভাস করিনু যারে।।...

আমি ভোটের পিরীতি রীতি বুঝিতে নারি,

দিনু সন্দেশ চড়াইনু মোটর গাড়ি।

দিনু উপরি গুঁজিয়া কিছু পকেটে তারে,

বলি রাখো যদি রাখো দাদা, মারো তো মারো।

হাতে ব্যালটপেপার ছিল পোলিং অফিসার

দেখি কার খেয়ে কার প্রেমে করে অভিসার।[৯]

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি উপনির্বাচনের প্রসঙ্গ নিয়ে সে সময় সাংবাদিকমহল বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। এই নির্বাচনে দুই সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে- সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক আর সুরেন্দ্রনাথ হালদার। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক স্বল্পকাল পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সরকারের কাছে মন্ত্রিত্বলাভের আশ্বাস-বাণী পেয়ে তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। ডাক্তার হরিধন দত্ত তাঁর সে আসনটি জুড়ে বসেছেন। অতঃপর মল্লিক মহাশয় পরাজিত হলেন এই উপনির্বাচনে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হালদার মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ালেন বাংলার স্বরাজ্য দলের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ফলে যা ঘটার তাই ঘটলো। সুরেন্দ্রনাথ হালদার ১৭০৫ ভোট পেয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। মল্লিক মহাশয় ভোট পেলেন মাত্র ৫৬০ টি। এই উপ নির্বাচনকে ব্যঙ্গ করে দাদাঠাকুর রচনা করলেন ছড়ার ছন্দে গান-

দক্ষিণ দুয়ারী উপনির্বাচন

দক্ষিণ কলকাতা মুখরিত আজি রে,

দে রণ দে রণ বলি হাঁকিল স্বরাজীরে।

স্বেচ্ছাসেবক যত স্বরাজীর পালোয়ান,

পরিধানে খদ্দর খদ্দর আলোয়।...

ভোটদাতা দিশেহারা কোথা করে ঢেরা-সই।

বলিহারি স্বরাজীর কেয়া তোফা তোড়জোড়,

মল্লিক বুঝিলেন বিধাতা বিরূপ মোর।...

চারদিন গণনায় মিলিল এ সমাচার,

মল্লিক চেয়ে বেশী তিনগুণ হালদার।

তাঁতি ও বৈষ্ণবকুল দুই কুল গেল হায়,

স্বরাজীর পোয়াবারো তাহাদের পারা দায়। [১০]

তখনকার দিনে কলকাতার রাস্তায় কাগজ ফেরি করার জন্য হকারদের লাইসেন্স দরকার হত। দাদাঠাকুরেরও এই লাইসেন্স ছিল। সে সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ

অফিসার ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর নিজের পকেট থেকে চার টাকা ছ'আনা খরচ করে এই লাইসেন্সটি করিয়ে দিয়েছিলেন।

রঘুনাথগঞ্জ থেকে দাদাঠাকুর হপ্তায় হপ্তায় কলকাতায় আসেন আর 'বিদূষক', 'বোতলপুরাণ' ফেরি করে সপ্তাহান্তে দেশে ফিরে যান। এই আসা-যাওয়ার পথে 'বিজলী' অফিসে তিনি প্রায়ই যেতেন। একবার এসেছেন, তখন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলের নির্বাচন পালা চলছে। নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় দাদাঠাকুরকে ধরে বসলেন সময়োপযোগী একটি রস-রচনার জন্য। মনের মত বিষয় পেয়ে দাদাঠাকুরের কবিত্ব শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠলো এবং স্বল্পক্ষণের মধ্যে ভারতচন্দ্রীয় স্টাইলে একটি খাসা রস-রচনার জন্ম হল। 'বিজলী' (পত্রিকা)-তে বেরোলো 'কর-পরশনে বিপরীত রীতি' শিরোনাম দিয়ে। বলা বাহুল্য এই নামকরণও দাদাঠাকুরের। যথা-

কর-পরশনে বিপরীত রীতি

নৃপ-নন্দন কঙ্গরসে রসিয়া,

পরিধান ধুতি খদ্দর কসিয়া।

দ্বিজ-নন্দন চন্দন-পুষ্প করে,

অতিহীন জনে ধরি তুষ্ট করে।

কত বিপ্রকুলোদ্ভব বর্ণগুরু,

এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু।

ধরি বিপ্র-পদে নত শূদ্র কহে,

ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে!

বল কোন দলে কোন দলে কোন্দল হে,

এ অহিংস দলে কেহ হিংস নহে। ১১

দাদাঠাকুর চরিত্রের একটি সাংঘাতিক দিক হল দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য তিনি যেমন অভয় হস্ত প্রসারিত করে অগ্রসর হয়েছেন তেমনি নির্যাতিতের উপর পীড়নের প্রতিবিধানের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতেও তিনি তেমন পশ্চাৎপদ নন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমে যে বাড়ীটিতে দাদাঠাকুরের ছাপাখানা ছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকে রাস্তার উপর ছিল

একটি তেলে ভাজা ও চানাচুরের দোকান। দোকানের মালিক কার্তিকচন্দ্র সাহা। কার্তিক মানুষটি মোটের উপর মন্দ ছিল না, সদানন্দ, সাহসী, পরোপকারী, স্পষ্টভাষী। এই গুণে সে দাদাঠাকুরের স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। দাদাঠাকুরকেও সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করতো।

এই কার্তিককে নিয়ে এক খেলা খেলেছিলেন দাদাঠাকুর। একেবারে চাণক্যের নীতি, শূদ্রকে সিংহাসনে বসাবার প্রতিজ্ঞা। তখন জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে নূতন করে কর ধার্য করা হচ্ছিল। কার্তিকের ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ছিল তিন আনা, সেই ট্যাক্স ছ'আনা ধার্য করে মিউনিসিপ্যালিটি নোটিশ জারি করল কার্তিকের নামে। দাদাঠাকুর কার্তিকের কর-বৃদ্ধি মুকুবের জন্য একবার নয়- উপর্যুপরি তিনবার দরখাস্ত করলেন কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। তখন দাদাঠাকুর কার্তিককে আশ্বাস দিয়ে বললেন- 'কুছ পরোয়া নাই, তোকে আমি ঐ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার করে ছাড়ব'।

সে সময় নিয়ম ছিল প্রতি বছরে যে ব্যক্তি দেড় টাকা ট্যাক্স দেয়, সেই ব্যক্তি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে। ত্রৈমাসিক ট্যাক্স তিন আনা থেকে ছ'আনা হওয়ায় কার্তিকেরও বার্ষিক ট্যাক্স দেড় টাকায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সেও এখন আইনত কমিশনার পদের নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকারী। কয়েক মাস পরে চেয়ারম্যান পরলোকগমন করলে তাঁর স্থলে কমিশনার পদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির উপনির্বাচন শুরু হল। একজন স্থানীয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কমিশনার পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো কার্তিক।

দারুণ ক্যানভাসিং চলল কার্তিকের প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে। কার্তিক প্রত্যেকটি ভোটারের বাড়িতে গিয়ে বলল যে, "অমুক বাবুকে আপনারা ভোট দিতে হয় দিন, কিন্তু তিনি কোনদিন আপনাদের দরজা ভুলেও মাড়াবেন না- সুখে-দুঃখে, সুবিধা-অসুবিধার প্রতিকার করা তো দূরের কথা"। আর অপ্রকাশ্যে চলল দাদাঠাকুরের ক্যানভাসিং। অপ্রকাশ্যেই বা কেন, জঙ্গিপুর সংবাদে দাদাঠাকুর ভোটের গান, ভোটের ছড়া লিখতে আরম্ভ করলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল-

ভোট দিয়ে যা-

আয় ভোটার আয়।

মাছ কুটলে মুড়ো দিব,

গাই বিয়োলে দুধ দিব,

দুধ খেতে বাটি দিব,

সুদ দিলে টাকা দিব,

ফি দিলে উকিল হব,

চাল দিলে ভাত দিব,

মিটিং-এ যাব না, অবসর পাব না।

কোন কাজে লাগবো না,

যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা। [১২]

নানারূপে ক্যানভাসিং চললো কার্তিকের পক্ষে। উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে নির্বাচনের প্রলয়োৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। যথা সময়ে ফলও ঘোষিত হলো- বহুসংখ্যক ভোটাধিক্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে কার্তিক সাহা ওরফে চানাচুরওয়ালা কার্তিক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হলেন।

নির্মলচন্দ্র ছিলেন সে সময় কলকাতার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। এক বছর তাঁর বাড়ীর দুর্গা পূজার সপ্তমীর দিন বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সমাগম হল। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং দাদাঠাকুর। এই সম্মেলনেও কয়েকজন খ্যাতনামা কংগ্রেসি সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে খদ্দরের কথা উঠলো। বাংলাদেশের লোকে খদ্দর কাপড় ঠিক মনে প্রাণে গ্রহণ করলে না এই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল সকলের মধ্যে। নির্মল বাবু উত্তেজিত হয়ে খদ্দর না পরা সম্বন্ধে একটি কড়া মন্তব্য করে ফেললেন। তিনি বললেন- ‘মোটা সুত বলে হারামজাদা হারামজাদীরা খদ্দর পরে না’।

অনেকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল দেখে রসরাজ অমৃতলাল বসু বললেন- ‘বাবা একখানা এক্সটেম্পোর গান রচনা করে এঁদের শুনিয়ে দে তো’। দাদাঠাকুর একটু আমতা আমতা করে অমৃতলালকে বললেন- ‘কি বিষয়ে রচনা করব বলুন’। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে নির্মলচন্দ্র বললেন- ‘আমাদের এখানে এখন যা দেখলেন শুনলেন তাই নিয়ে রচনা করে গান না’। বলামাত্র দাদাঠাকুর উঠানে নেমে পড়লেন এবং গান তৈরি করে গাইলেন-

দুটো মনের কথা বলি তোরে

ও মা জগদম্বে!

বল দেখি এই দীনের দুঃখ

কোন কালে মা কমবে ?

যত পাওনাদারে লাগায় ল্যাঠা

ভাই পালিয়ে এসেছি ক্যালকাটা,

হেথায় যদি ধরে ব্যাটা

পালাবো মা বোম্বে।

শুনো মাগো দশভুজা

আমি সেদিন করবো তোমার পূজা

যেদিন নামবে মা অভয়ের বোঝা

লক্ষ টাকা জমবে।। (নির্মলের মত)

দেশের দুঃখ দেখে গাঁধী,

পরতে বলে গেছেন খাদি,

যত হারামজাদা হারামজাদি

ঠেকায় না নিতম্বে ? (মোটা বলে)

গান শেষ করে দাদাঠাকুর উঠোন থেকে উঠে আসছেন এমন সময়- “বা! বলে রসরাজ অমৃতলাল তাঁকে অভিনন্দিত করে বললেন, আর একটা কলি গাইতে পারিস ঐ মিল বজায় রেখে”? আবার উঠোনে নামলেন দাদাঠাকুর, নেমেই গাইতে আরম্ভ করলেন-

যদি কষ্ট দেওয়া মনে থাকে,

আর কেন রাখিস আমাকে,

ডেকে নে মা শেষের ডাকে,

কাজ কি আর বিলম্বে? ১৩

রসরাজ অমৃতলাল দাদাঠাকুরকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। গান শেষ হলে এই মহারসিক বৃদ্ধটি দাদাঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এক কথায় দাদাঠাকুর ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী।

খ. *অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০৩):*

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, ইংরেজ আমলের শেষ সিভিলিয়ান অন্নদাশঙ্কর রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যায়। তাই এই বাঙালি লেখকের দ্বিতীয় মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছিল ওড়িয়া। বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাগ্মী অন্নদাশঙ্কর রায় একাধারে ছিলেন প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও ছড়াকার। তাঁর আকর্ষনীয় ছড়াগুলি এমনভাবে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে যে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার তুলনায় সেই সত্তাই তাঁকে সবচেয়ে খ্যাতিমান করেছে পাঠক সাধারণের মধ্যে। ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন- *"ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের বহু পুরাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়া নিয়মিত লেখার প্রচলনটা সম্প্রতি হয়েছে, গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে। এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা, সরস হবে তা কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে।... একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সীরিয়াস কবি লেখকরা ছড়া লিখতেন না, যারা ছড়া বানাতো- মেয়েরা চাষিরা শিশুরা তাদের নাম কেউ জানেনা। আজ সীরিয়াস লেখকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। তবে সব ছড়াইতো আর ছড়া নয়, বেশিরভাগই পদ্য"*। ১৪

তাঁর রচিত ছড়াগ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। এই বারোটি ছড়া গ্রন্থ একত্রিত করে 'ছড়াসমগ্র' নামে ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত বিপুল সংখ্যক ছড়ার মধ্যে যেগুলিতে রাজনৈতিক রঙ্গ-রসিকতার চিত্র ধরা পড়েছে সেগুলি নিম্নে সূত্রাকারে আলোচনা করা হল-

জিতুবাবুর জিৎ

মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি

মরছি ফেটে আহ্লাদে

ও মাসী তুই পাল্লা দে।

হিতলার তো চিৎ হয়েছে

মুসোলিনি পটাং

জাপু এখন বর্মা ছেড়ে সটাং

আমরা গেছি জিতে

আমরা মানে আমাদের সেই

সিঙ্গি ভালুক মিতে। ১৫

উক্ত ছড়াটি রচিত ১৯৪৫ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ভারতকে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য কামনা করে। মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯১৪) কংগ্রেস ইংরেজদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে- 'war has been declared in Europe and the Congress made profuse declaration of loyalty and promised all help in the prosecution of the War'.[১৬] কংগ্রেস নেতৃত্বের সক্রিয় প্রচারের পর বাঙলিও যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ সূত্রে ভারতীয় সেনা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের ৯ই মে মিত্র শক্তির কাছে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে এবং রুশ-জার্মান যুদ্ধাবসান চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে এক হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের আশায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের এই সহযোগিতা করাকে সঠিক মনে করেননি সমাজ সচেতন ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির জয়লাভে ভারতবাসীর উল্লসিত হওয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং ইংরেজের শঠতা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ছড়াকার, উক্ত ছড়ায়।

১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ৮ই আগস্ট জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয় এবং গান্ধিজি ডাক দেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। পাশাপাশি ১লা সেপ্টেম্বর রাসবিহারী বসু ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি(আজাদ হিন্দ ফৌজ) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। এরকম উত্তাল স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে জাপানীরা কলকাতার আকাশে বিমান হানা চালায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় জনমানসে দু-রকম প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। একদল জাপানীদের বোমাবর্ষণকে সাধুবাদ জানিয়েছিল তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' জাপানী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করবে। আর একদল এই মতের পক্ষে ছিলেন না। এই দু-রকম প্রতিক্রিয়াকে সামনে রেখে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখলেন 'পিতা-পুত্র সংবাদ'। যেখানে

পিতা বলছে- স্বরাজ স্বরাজ সবাই চ্যাঁচায়

স্বরাজ কি ফলে গাছে!

স্বরাজ রয়েছে আধ-পয়সার

আসত কাতলা মাছে।

জাপানীরা যদি আসে

পশুরাজ যাবে বসুরাজ হবে

মুক্ত করবে দাসে।

পুত্র বলছে- স্বরাজ স্বরাজ যে জন চ্যাঁচায়

সে জন জাপানী চর

আমাদের বাণী, রাশিয়ার মতো

গেরিলা যুদ্ধ কর।

জাপানীরা যদি আসে

ল্যাজ তুলে তারা কাল পালাবেই

লাল গেরিলার ত্রাসে। ১৭

১৯৪৬ সালের ১৬মে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে দু'খণ্ড করে ভারত ও পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করে। ৩রা জুন ভারতীয় নেতারা ভারত-বিভাজন প্রস্তাব মেনে নেন। ১৬ আগস্ট মুসলিমলীগ ভারতে 'ডাইরেক্ট ডে অ্যাকশন' পালন করে। ফলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু মানুষের প্রাণ যায়। ২০ সেপ্টেম্বর নেহেরু ভারতের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা হন। ১৯৪৭ সালের ৫ জুলাই ব্রিটিশ সংসদে ভারতের স্বাধীনতা বিল এবং ১৮ জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুমোদন লাভ করে। ১০ জুলাই প্রথম অশ্বেতকায় জিন্নাকে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার এবং ঘোষণা করা হয় জিন্না মুসলিম পরিষদের শাসক হবেন। এরপর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয় বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। দেশভাগের এই যন্ত্রণার মধ্যে ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পায়, সাথে সাথে দেশ জুড়ে শুরু হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস আর অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে ছড়াকার লিখছেন 'খুকু ও খোকা'(১৯৪৭) নামক তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ছড়া-

তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা

ভারত ভেঙে ভাগ কর!

তার বেলা?

ভাঙছে প্রদেশ ভাঙছে জেলা

জমিজমা ঘরবাড়ী

পাটের আড়ৎ ধানের গোলা

কারখানা আর রেলগাড়ী!

তাঁর বেলা?...

তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা

বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!

তার বেলা? [১৮]

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ও পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়কে বহন করতে হয়েছিল খণ্ডিত স্বাধীনতার বেদনা। শত শত বছরের বাসভূমি ছেড়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালে অন্নদাশঙ্করের লেখা একটি ছড়া- *লক্ষ্মণ সেনের প্রত্যাবর্তন*

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়

গৌড় থেকে বঙ্গ

লক্ষ্মণ সেন রাজা, তাঁর

রাজ্য হলো ভঙ্গ।

সাতশো বছর বাদে

রাধে কৃষ্ণ রাধে!

আবার দেখি বাধল এ কী

রাজ্য ভাঙা রঙ্গ!

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়

বঙ্গ থেকে গৌড়

লক্ষ লক্ষ সেন যেন

লক্ষ লক্ষ চৌর।

সাতশো বছর পরে

হরে কৃষ্ণ হরে! [১৯]

এখানে ছড়াকার একই সঙ্গে দুটো ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরেছেন। একটি ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে পরাজিত লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন। আর অন্যটি হল **১৯৪৭** সালের দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুদের পূর্বপুরুষের বাড়ী ঘর ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমানো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ছড়াটি হলঃ

শর্বরীর প্রতীক্ষা

সাত শত বৎসর যে

পথ চেয়ে ।আছি

ভিন দেশী জল্লাদের

হাত থেকে বাঁচি।

সেই তুমি ফিরলে হে

লক্ষ্মণ সেন রাজা

কই তোমার ভাণ্ডারে

ক্ষীর সর খাজা?

সেন যুগের কীর্তি তো

পিষ্টক আর পুলি

অক্ষ পাল্টিয়ে হল

ইষ্টক আর গুলি!

ভাত দেওয়ার ভাতার না

কিল দেওয়ার গোঁসাই

তুর্কী না তাতার না

গৌড়ীয় মশাই! [২০]

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফল স্বরূপ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় পরিচয়ের থেকে ধর্মীয় পরিচয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা বাঙালি জাতির কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। জাতির পরিচয়কে মুছে ফেলে কি ভাবে একটি জাতির মধ্যে ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে তা ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ছড়াকার- এপারেতে যাদের বাড়ি

খবরদার রেখনা দাড়ি

ও পারেতে যাদের বাড়ি

দাড়ি গজাও তাড়াতাড়ি।[২১]

১৯৪৮ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধান বিরোধী দল ‘ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে’ বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনাকে সে সময় অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ভালভাবে নেয়নি। যদিও ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মত ঘোষিত হয়। ভারতের ইতিহাসে এই লজ্জাজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালে সমাজ সচেতন ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় লিখলেন ‘গিন্নী বলেন’ নামক ছড়াটি-

গিন্নী বলেন-

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি

সকলের মূলে কমিউনিস্টি

মুর্শিদাবাদে হয়না বৃষ্টি

গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি।

পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি

তলে তলে কেটা? কমিউনিস্টি।

কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি

নিয়ে এল প্লেগ কমিউনিস্টি।

গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি

ছেলেরা বললো কমিউনিস্টি।

মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি

সেধে গুলি খায় কমিউনিস্টি।

যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি

সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।

তাই বসে বসে করছি লিস্টি

এপাড়ার কে কে কমিউনিস্টি।[২২]

দীর্ঘ রক্তক্ষয় ও নকশাল আন্দোলনের মধ্যে ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, যার ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আবারও একটি রক্তক্ষয়ী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বারের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। তৎকালীন সময়ের এই হিংসাত্মক পরিস্থিতিকে ছড়াকার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ‘নবপদাবলী’ (১৯৬৯) নামক একটি ছড়ায়-

শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে হিংসা সত্য

তাহার উপরে নাই।

হিংসায় যদি হাত রাঙা করে
সকলেই বনে জল্লাদ
তা হলেই হবে বিপ্লব, আহা
তা হলেই হবে আহ্লাদ।

মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে। ২৩

পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল বর্তমান। বর্তমানে ভারত তথা এই উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি দেশের সাধারণ নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এই সকল রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটারদের মন জয় করার জন্য নানান প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভনের বন্যা বইয়ে দেন। কিন্তু এর পাশাপাশি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ভয় দেখান। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বিভিন্নভাবে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেন। এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে অন্নদাশঙ্কর একটি মজার ছড়া রচনা করেছেন-

শরিক এল দেশে

খাস তালুকের প্রজা

শুনবে কেমন মজা!

বড়দা এসে জলপানি দেয়,
'ভোট দিয়ে যা, ভজা'।
মেজদা এসে তড়পানি দেয়,
'ভোট দিয়ে যা ভজা'।

সেজদা এসে ধমক লাগায়,
'ভোট দিয়ে যা ভজা'।
ছোড়দা এসে ঘুষি বাগায়,
'ভোট দিস নে ভজা'।

খাস তালুকের প্রজা

এ কী নতুন মজা!

মাথা আমার হেঁট

ভোট নয় তো, ভেট! ২৪

স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ (বাংলাদেশ) পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। **১৯৭১** সালের **২৬** মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন শেখ মুজিবর রহমান। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বঙ্গবন্ধু(**১৯৭১**)' নামে ছড়া রচনা করেছেন বিখ্যাত ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়-

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা

গৌরি মেঘনা বহমান

ততদিন রবে কীর্তি তোমার,

শেখ মুজিবর রহমান!

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা

রক্তগঙ্গা বহমান

তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়,

জয় মুজিবর রহমান। [২৫]

১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতের সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে এবং জয়লাভ করে। এই জয়লাভের সুবাদে ভারতবর্ষ তথা ইন্দিরা গান্ধির নৈতিক জয় হয়। এই ঘটনার পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে এবং **১৬** ডিসেম্বর ভারতের কাছে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ২০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান (এহিয়া) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিলে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ছড়াকার-

ইন্দিরার সম্মান

নারীর অপমান সয় না ভগবান

সীতাই রাবণের ধ্বংস।

দ্রৌপদীর তরে কৌরবেরা মরে

হস্তিনাপুর নির্বংশ।।...

তাই তো হল তার রণে দারুণ হার

দম্ভ হল তার তুচ্ছ

পশুরা ধরা পড়ে এহিয়া যায় সরে।

ইন্দিরা হন আরো উচ্ছ। ২৬

মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী নানান সমস্যাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার জন্য উক্ত ছড়াটিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ছড়াকার। আবার এই ইন্দিরা গান্ধি **১৯৭৫** সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে যখন সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ভারতের গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করেন তখন কিন্তু ছড়াকারের কলম থেমে থাকেনি। আমরা জানি **১৯৭৭** সালের **২১** মার্চ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি হেরে যান এবং **১১** বছরের শাসক জীবনের অবসান ঘটে। পাশাপাশি ২৪ মার্চ ভারতের প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই এবং ২৭ মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়াকার লিখলেন ‘জরুরি জারির গান’ **(১৯৭৭)-**

ইস্কাবনের বিবি রে,

জরুরি তাঁর কেল্লা

বাইরে যে তার বাহার কত

কত রঙের জেল্লা রে, কত রূপের জেল্লা!

-আহা: বেশ বেশ বেশ!...

সংশয়ীরা বলে, হবে

দ্বিতীয় ক্রেমলিন

নির্বিচারে বন্দীরা যার

অন্তরালে লীন হে, অন্তরে বিলীন।

-নাকি বেশ বেশ বেশ!... ২

তথ্যসূত্র:

১. লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩১৪, পৃ. ৪৯।

২. ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৪।

৩. ২২/০২/২০১৮, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাজাবাজারের দিকে যেতে রাস্তার ডান দিকের ফুটে নারকেল ডাঙ্গা যাওয়ার অটো স্ট্যাণ্ডের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে সংগৃহীত (নিজস্ব)।

৪. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৩)-এর ভূমিকা অংশে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত, পৃ. ২১।

৫. আবোল তাবোল, সুকুমার রায়, 'লড়াই-ক্ষ্যাপা' শীর্ষক ছড়া, সুকুমার রচনাসমগ্র (অখণ্ড সংস্করণ), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৯।

৬. ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৫।

৭. সুকুমার রচনাসমগ্র (অখণ্ড সংস্করণ), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩।

৮. ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.৩৮৬।

৯. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১৬৫।

১০. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৪৪।

১১. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৪৯।

১২. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৭৭।

১৩. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১৫৯-১৬২।

১৪. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৩)-এর ভূমিকা অংশে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত, পৃ. ১০।

১৫. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৮।

১৬. Dutt, R. Palme, India Today, I bid p. 332-338. এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল রয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থে: Collins, Larry and Lapierre, Dominiane. Mountbatten and the Partition of India, University press Ltd, Dhaka, 1982, p. 55-59.

১৭. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৪৬।

১৮. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৪৯।

১৯. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৪৯।

২০. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৯-৫০।

২১. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৫৫।

২২. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৮৫।

২৩. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৬৬।

২৪. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৫৮।

২৫. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩০২।

২৬. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩১০।

২৭. ছড়া সমগ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩১১।

গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩):

লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক হল ছড়া। যেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আর সমষ্টিগত মানুষের সেই ছন্দিত ফসল আজ আকর্ষণ করে আধুনিক কবি-মানসকে। সাম্প্রতিক কালের কবিরাও অনেক সময় ছড়ার মত জনপ্রিয় আঙ্গিককে ব্যবহার করে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। আর যে কারণে ছড়া রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এবং পরবর্তীকালে তাঁর দেখানো পথে প্রায় সকল বড় কবিই অনায়াসে পদচারণা করেছেন। ফলস্বরূপ গ্রামীণ ছড়ার মধ্যে এসেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং লোকায়ত শিল্পে লেগেছে ব্যক্তিগত রং।

এই ধারাতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবিও যে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি ছড়ার মত সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যমকে প্রায় হাতিয়ার করে যেতে চেয়েছেন জনমানসের কাছাকাছি। প্রচলিত শব্দ, মুখে মুখে ফেরা বাক্যবন্ধ, ছড়ার মধ্যে প্রবেশ করে অবাধে। তাছাড়া ছড়ার ছন্দে ও চালে আছে লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার নিজস্ব ও ব্যাপক ক্ষমতা। ছড়ার এই শক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছড়া চর্চার পিছনে নিহিত হয়ে আছে তাঁর ঐতিহ্যবোধও। প্রাচীন ছড়ার মধ্যে যে স্বপ্ন ও সংগ্রাম, আশা ও প্রতিবাদ এবং জীবনময়তার ওম জড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবোধে তার নব রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছেন ছড়ায়। এ জন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভুবনে ছড়ার অবাধ রাজত্ব।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বজবজ-জীবনের ঐ কালখণ্ডেই প্রথম কন্যা 'পুপে' এসে দাঁড়ায় তাঁদের জীবনবৃত্তে। ফলে তার জন্যও লেখা হতে থাকে ছড়া। তাঁর বিখ্যাত 'যেতে যেতে' কবিতার নদীর মতো তাঁর ছড়ার দুটি দিক- এক দিকে ছোটদের জন্য লেখা ছড়া, অন্যদিকে বড়দের জন্য লেখা ছড়া; এ প্রসঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "যার জাত আসলে হালকা কবিতার' ইংরেজীতে যাকে বলে 'লাইটভার্স' যেখানে বিষয়টাতেই সাবালক মনের খোরাক থাকে"।[১]

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর ছড়ার মধ্যবিন্দুতে আছে 'পুপে', 'পুপের মা', 'সিনেমামা', 'পুপের মার গল্প'- পুপে সংক্রান্ত এই সব ছড়ায় আবছা রেখায় আঁকা কাহিনীর বৃত্তে পুপেকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে নাতি মিউকে নিয়ে লেখা হয়েছে একটি আস্ত ছড়ার বই 'মিউ এর জন্য ছড়ানো ছিটানো'। এই সব ছড়ার জাত ও মেজাজ পুপের ছড়াগুলি থেকে আলাদা। যেখানে প্রাত্যহিক জীবন থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন শব্দমালা। যেমন-

সন্ধ্যা মালতী কুঞ্জলতা।

সাধুবাবার কম্বল লোটা।।

ঝুমকোলতা রাংচিতা।

দণ্ডকবনে রাম-সীতা....২

শুধু মিউয়ের জন্য নয়, পরবর্তীকালে বুমলা-বাবি লাল্টুদের নিয়ে ছড়ায় সাজিয়ে দিয়েছেন 'দাদামশাইয়ের-এর বৈঠকখানা' সে বৈঠকখানা ভরে উঠেছে হাজার রঙিন মজায়। সুরে, ছন্দে, দীপ্তি ও দ্রুতময় শব্দে দুলে উঠেছে সে বৈঠকখানার রঙিন জগৎ। এটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার একটি দিক, আমরা আগেই বলেছি গৌণ দিক। ওঁরই ভাষা ধার করে এগুলিকে বলা যায় 'শখ করে লেখা ছড়া'।৩ কিন্তু শুধু শখ করে নয়, সাধারণের মধ্যে কবিতাকে পৌঁছে দিতে অনেক সময়েই তিনি ছড়াকেই তাঁর অভিব্যক্তির মাধ্যম করেছেন এবং সেখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার মুখ্য দিক। তীব্র অনুভূতি, অন্তরঙ্গ আবেগ আর উষ্ণ জীবনবোধ এসব ছড়াতে যেমন বেঁধে রাখা হয়েছে সময় ও সমাজকে, তেমনি এই সব ছড়ার মাধ্যমেই দেখাতে চেয়েছেন সমাজের দগদগে ক্ষত-মুখগুলি। ছড়ার মিল অমিলের ছিলা টানটান শব্দে যোজনা করেছেন ক্ষুরধার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ তীর। এক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর রায়কে কিছুটা তাঁর সহযোগী বলে মনে হয়। তবে এঁদের থেকে তাঁর ছড়া আলাদা হয়ে যায়, যখন তা হয়ে ওঠে লক্ষ্যভেদী রাজনৈতিক হাতিয়ার। সুদূর ভিয়েতনামের স্বাধীনতার লড়াই-এ দিয়েন বিয়েন ফুঃ দুর্গের রাজনৈতিক পতনে কবির চাপা উল্লাস ও ব্যঙ্গ যেমন তাঁর ছড়ার বিষয়-

পূর্ব দখিনে

আগুনে-বোনা

সাত সাগরের ঝি!

আকাশ কেন

নীল বর্ণ?

সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক, খোপে কাটুক

আছে আমার

মন্ত্র পরা ফুঁ-

যা রে

সাপের বিষ

দিয়েন বিয়েন

ফুঃ।।[৪]

তেমনই আবার ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসনের বত্রিশ বছর ও বত্রিশ সিংহাসনের অনুষঙ্গে তাঁর ছড়ার বিষয় হয়ে ওঠে-

আগে ছিল মাটির তলায়,

সে একরকম ভালো;

এখন ভাসছে চোখের ওপর-

বড্ডই জ্বালালো!

....

বত্রিশ পুতুলের

একটাই গোঁ

বসুক এসে

রাখালের পো।।[৫]

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সেনা প্রধান জেনারেল মুহম্মদ আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানে অত্যাচারী এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আন্দোলন শুরু করলে এই আয়ুব খানের নির্মম অত্যাচারে বহু নিরীহ ভাই-বোন সে সময় প্রাণ বিসর্জন করেন। আর আয়ুব খানের যোগ্য

সহযোগী ছিলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ণ কম্যাণ্ডের অধিনায়ক এ কে নিয়াজী। দুই হত্যাকারী সেনাপ্রধানকে ব্যঙ্গ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন বিখ্যাত রাজনৈতিক ছড়া-

কড়াপাক

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল মহাপাজি

গাজী

আর খাইবার

তাঁর জুড়িদার

এ কালাপানির দুই কালসাপ

বিলকুল সাফ।

আকাশে ভোঁ-কাটা, মাটিতে সাবাড়

স্যাবাড়

রাস্তায় খান খান কে

গড়াগড়ি যায় ট্যাঙ্কে।

ঠ্যাঙানির চোটে

ফেলে পল্টন আগেভাগে

পশ্চিমা বীর মিঞাজি

নিয়াজি।

চীন-মার্কিন টের পাক।

এ কঠিন ঠাঁই- কড়াপাক।।[৬]

কিছু মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাংলাকে ভাগ করা হলেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন এ বিভাজন কেবলমাত্র কাঁটাতারের বেড়া। দু-দেশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি এক। কবির দৃষ্টিতে স্বাধীন বাংলাদেশ আর কিছুই না বাড়ির পাশে থাকা প্রতিবেশীর মত। কবির এই অনুভূতির পাশাপাশি দেশের বিভাজনকামী শক্তিকে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গে বিদ্ধ

করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রসন্ন কৌতুকবোধ নিয়ে লেখা ‘পারাপার’ ছড়াটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এখানে বাংলাকে দুটি চোখের সঙ্গে উপমিত করে, মধ্যবর্তী নাককে নিয়ে আশা হয়েছে রাজনৈতিক বেড়ার প্রসঙ্গে। যেমন-

আমরা যেন বাংলাদেশের

চোখের দুটি তারা।

মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে-

থাকুক গে পাহারা

দুয়ারে খিল,

টান দিয়ে তাই

খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলাদেশ

এপারেও সেই বাংলা।[৭]

আসলে স্বদেশ এবং সেই সঙ্গে গোটা বিশ্ব-রাজনীতিই তাঁর ছড়ার বিষয়বস্তু। ছড়াকে হাতিয়ার করে তিনি যেমন ভিয়েতনামের বুকে চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নখ, দন্তকে বিদ্রুপে ক্ষত বিক্ষত করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনাদের আক্রমণ এবং চীন-মার্কিন অশুভ আঁতাত যেরকম শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত হয়, তেমনভাবে ছড়ায় ছড়ায় ছড়িয়ে দিতে থাকেন এ দেশের যারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁদের ভূতুড়েসার রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষাক্ত বিদ্রুপবাণ। সেই দক্ষতাতেই এ দেশের সুবিধাবাদী রাজনীতিকে তিনি ক্ষত-বিক্ষত করেন ব্যঙ্গের শরে, সূচিমুখ ছড়ায়-

পিঠ পেতে আছে

দেওয়াল

হাত পেতে আছে

ভিখিরি-

কে ঘোচাবে বলো

এ হাল ?

দেখা নেই কারো

টিকিরই।[৮]

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ায় শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কিংবা ঠাট্টাই নয়, শ্লেষ কিংবা কৌতুকই নয়- গভীর আবেগও তাঁর ছড়াতে এসেছে চলতি সময়-সমাজ-রাজনীতিকে সামনে রেখে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর ‘পারুলবোন’ ছড়াটি, যেখানে রূপকথার পারুলবোন কোটি কোটি বাঙালির মূর্তিমতী স্বাধীনতা হয়ে উঠেছে-

অন্ধকার পিছিয়ে যায়

দেওয়াল ভাঙে বাধার

সাতটি ভাই পাহারা দেয়

পারুল বোন আমার-

দেখি তো কে তোমার পায়

বেড়ি পরায় আবার ?

তির্যক অথবা গভীর দুটি ভঙ্গিতেই রাজনৈতিক সত্য, সামাজিক স্থিতিকে তিনি ছড়ায় এনেছেন। গাঢ় অথবা হালকা- দুটি চালেই তাঁর রাজনৈতিক ছড়াগুলি পুষ্ট। উদ্দেশ্য একটাই- দেশকে, বিশ্বকে ঢেলে সাজানো-

সোনার ধানের সিংহাসনে

কবে বসবে রাখাল

কবে সুখের বাণ ডাকবে

কবে হবে সকাল ?[৯]

এই হিরণ্যগর্ভ সকালই তাঁর ছড়ার অন্বিষ্ট। রাজনীতি এবং রাজনীতি চালিত সমাজব্যবস্থা তো বটেই, সেই সঙ্গে সমাজের ছোট বড় দুষ্ট সামাজিক ক্ষতগুলিকেও তিনি আঙুল তুলে

দেখিয়েছেন তাঁর ছড়ায়। সে রকম একটি ছড়া হল 'হিকোরি চিকোরি'। এখানে কবি 'ইংরেজির পুচ্ছে' ডাল ধরে থাকা বাঙালিকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন-

ইংরেজির পুচ্ছে

ডাল ধরেছি উচ্ছে

নইলে কে আর

করত কেয়ার

আজ সকলেই পুঁচছে।[১০]

ব্যক্তি চরিত্র নিয়েও কিছু অসামান্য ছড়া লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সে সব ছড়ায় যেমন আছে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ও প্রীতিধন্য মানুষ, তেমনি আছে তাঁর না-পছন্দ ব্যক্তিত্বও।

এক যে ছিল রাজা –

রাজত্বটা মস্ত

উঠতে বললে উঠত লোকে

বসতে বললে বসত।

একদিন সেই রাজার

রাজ্য গেল উল্টে

শূলে চড়ার আগেই রাজা

গেলেন পটল তুলতে।[১১]

'এক যে ছিল রাজা'-র এই রাজা অবশ্যই 'স্ট্যালিন'। শুধু 'স্ট্যালিন' নয়, 'স্বৈরাচারী' স্ট্যালিনিজমও তাঁর ছড়ার প্রধান বিষয়। 'ম্যাও' ছড়াতে আসলে 'মাও সে তুং'-এর কথা

বলেছেন কবি। পাকা কার্টুনের মত তাঁকে 'বাঘের মাসী'তে পরিণত করে কৌতুক করেছেন সেখানে।

দুনিয়া জোড়া বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন; তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের স্বাধীনতা, ঊনপঞ্চাশের বাম ঝড়, ঊনষাটের খাদ্য আন্দোলন সত্তর- একাত্তরের অতিবাম কার্যকলাপ- স্বদেশ, সময়, ও সমাজের এই উত্তাল রক্ততটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা চর্চা। কবিতার পাশাপাশি ছড়ার মত জনপ্রিয় মাধ্যমকে হাতিয়ার করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পৌঁছতে চেয়েছেন জনমানসের কাছাকাছি। ১৯৮০-তে বেরোয় তাঁর প্রথম ছড়ার বই 'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো'। কবির বয়স তখন একষট্টি। এই ছড়ার বইটির পরিচয় অংশে লেখা হয়েছিল- "গত চার দশক ধরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কখনও বিষয়ে, কখনও প্রকরণে। এবার তিনি হাত বাড়িয়েছেন ছড়ার রাজ্যে"। সত্যি কথা বলতে কী হাত তিনি অনেক আগেই বাড়িয়েছিলেন। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এর আগে প্রকাশিত কবির অন্যান্য কবিতার বইয়েও এমন অনেক রচনা ছিল যার গোত্রটা ছড়ার। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর ছড়া স্বতঃস্ফূর্ততায় ছড়িয়ে যাচ্ছে মূলত 'ফুলফুটুক', 'যতদূরে যাই'(১৯৬২)-এর সময় থেকে। যেমন-

...ঝাণ্ডা বয় কেউ-কেটারা
ঠাণ্ডা ঘরে রয় নেতারা।।

মাটিতে আর পা পড়ে না।
কুর্সি ছেড়ে আর নড়ে না।।

পণ চায় যে গুখেকোর ব্যাটা।
মুখে মারো তার মুড়ো ঝ্যাঁটা।।

হাতে থাকতে রঙের তুরুপ।
কেন যে কারখানায় কুলুপ।।

ভাই পাকিয়ে দেখ মুঠো।

সব ঝড়ের মুখে কুটো।।

ভাঙতে দাদার বড়াই

রাস্তা-রোকোর লড়াই।।

ঢোকে যদি বেনো জল।

পাঁকে ডুবে যাবে দল।।[১২]

কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অর্থাৎ যা ঠিক ঠিক হবার, তা হবেই। এই হচ্ছে জগতের বিধির বিধান। একে মেনে নিতেই হয়। 'ধর্মের কল'- কাব্যখানির কবিতাগুলিই খানিকটা এই ভাবনায় লিখিত। উদ্ধৃত 'কিংবদন্তী' ছড়াটিতে ক্ষমতাধারী রাজনৈতিক দলের ভণ্ডামি ও অধঃপতনের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সময়টা সুবিধের নয়। কোন কিছু না করে যে যা পারে হাতিয়ে নিচ্ছে। একেবারে খোলা মঞ্চে নির্লজ্জরা রং বদলাচ্ছে। এরা সব বহুরূপীর দল। রাজনীতি ব্যাপারটাই এখন পেশাদারিত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা কথা বলতে জানে না তারা ভাষণ দেয়। যারা কোন কথা কানে তোলে না, তারা শোনে। যারা দেখতে পায় না তারা দেওয়াল লেখে। সেইসব অকর্মক সাজের ধারকদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন যে- বাবু হয়ে গদিতে বসে জনসাধারণের কথা ভুলতে বসেছে। দেশের লোকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিছুই যথাযোগ্য তো নয়ই, তো দারিদ্র্য সীমার অনেক নীচে। তবুও:

বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি।।

মন্ত্রী মশাই, করেন কী ?

পরের ধনে পোদ্দারি।

হাকিম সাহেব করেন কী ?

খোদার ওপর খোদকারি।

....

কান কাটাদের রাজ্যে।

ঠোঁট কাটারা যাই বলুক না

আনে না কেউ গ্রাহ্যে।।১৩

সমাজের এই চিত্রের আরও ব্যঙ্গাত্মক রূপ একেছেন ‘ধর্মের কল’ (১৯৯১) নামক কাব্যগ্রন্থের ‘ওঠাপড়া’ নামক ছড়ায়:

চুড়োর ওপর উঠে বসে

হুঁশ হল ল্যাজ গেছে খ’সে।১৪

দলবদ্ধ সংকীর্ণতা নয়, খোলা মনের বিস্তৃত সংযোগ প্রক্রিয়ার দিক থেকেই, রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সবসময় এক সমাজমুখি উর্বর জীবনবোধ দিয়ে তিনি মানুষকে বারবার তাঁর দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষের নিদ্রিত অংশটাকে জাগাতে উদগ্রীব থেকেছেন। এ সবই তিনি করেছেন মানুষের প্রতি নাড়ির টান অনবরত অব্যাহত রেখে। চমক লাগানো বাক্‌সর্বস্ব রাজনীতি নয়। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি উস্কে তুলবার জন্য শ্রেণিহীন ভালোবাসাকেই সঙ্গী করেছেন তিনি:

ট্যাঁকে কড়ি, হাতে দড়ি, মুখে ‘হরি’ ।

অর্থাৎ কিনা, যার যা আছে ‘হরণ করি’ ।।

পথে মিছিল, খোল-করতাল।

কালকে বন্ধ, আজ হরতাল।।

একটি গাধা, একটি খচ্চর

এক ব্যাটা চোর, এক ব্যাটা জোচ্চোর

একজন বাইরে, একজন জেলে

কাকে ভোট দিই কাকে ফেলে।।

দলের হলে আছো,

না হলে তুমি গেছ।।

যে করবে আড়ি।

মাথায় তার বাড়ি।।

নেতা হলে পার্টিতে।

পা পড়ে না মাটিতে।।১৫

'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে যত্রতত্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র দ্বীপের মত ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক ভণ্ডামীর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায় 'রামনাম শত হ্যায়' নামক ছড়ায়-

করা গেলে হিংসুটে

সদাশিব হিন্দুকে

ভোটগুলো চেটেপুটে

তোলা যাবে সিন্দুকে।

ঠিক এমনি একটি ক্যারিকেচার ধর্মী লেখা ভোটের রাজনীতি নিয়ে চলা ভণ্ডামির চিত্র বলা যেতে পারে-

এ গাঁয়েতে বান তো

ও গাঁয়েতে খরা

যে করে হোক আখেরে ভোট

ভাতের টোপে ধরা। ১৬

বর্তমান রাজনীতি নির্বাচন বা ভোটযুদ্ধ লড়াইয়ের একটি মাধ্যম। কলকাতার পথে পথে তা নিয়ে প্রচার, মিছিল, দেওয়ালে পোস্টার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই ভোটের কলকাতাকে বারবার নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায়। তা নিয়ে ছড়া কাটেন এমনকী পোস্টারের ভাষা জুড়ে জুড়ে এবং সামান্য অদল বদল করে তৈরি হয় কবিতা কিংবা তাঁর কবিতার কোন কোন বাচন হয়ে ওঠে পোস্টার।

একুশ শতকে ভোট নিয়ে নানান রঙ্গ তামাসা চলছে। ভোটারদের হুমকি, ভোটদানে বাধা, ভোট লুট, রিগিং, ছাপ্পা আরও কত ধরনের ভোটরঙ্গ চলছে এ বাংলায়। কিন্তু এই নির্বাচনের প্রতি কবির যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস তা কিন্তু নয়- তবুও ধিক্কারটা এখনো ঠিক জায়গায় লাগে-

দেখুন, আলকাতরানো দেওয়ালগুলো

এখন চুনকালিতে ছয়লাপ

মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান-

খেলা হবে খেলা।[১৭]

পোস্টার নিয়ে তিনি আগেও লিখেছেন- তাঁর উচ্চারণই তো হয়ে উঠত একসময় নতুন পোস্টার। এখনও মাঝে মাঝে লেখেন, কিন্তু এবার তাঁর অন্য সুর লেগেছে। রাজনীতির সহজ ছক নয়, মানবিকতার ভিন্ন সম্ভাষণ। 'দেওয়ালে লেখবার জন্য' কবিতায় প্রস্তাব করেছেন সেই নতুন অনুভব থেকে জাত বাক্যাবলী। সব কিছুতেই পুরনো সময় হারিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

১৯৮৩-তে প্রকাশিত 'চইচই-চইচই'-তে আবার পেয়েছি 'দেওয়ালে লেখার জন্য'। এবার আর আগের মত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দেওয়াল লিখন নয়; কবি ঐ ধরনটাকে গ্রহণ করেছেন মাত্র। কলকাতাকে বা কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আচার আচরণকে কিভাবে দেখেছেন সেটাই বরং বোঝা যায়-

আপিসে কাজ না করে

মেলে তনখা শহরে।।

ভোটের আগে কী যে সজ্জন।

ভোটের পরে কী যে গর্জন।।[১৮]

'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯)- কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রখর সমাজমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'- কবিতাতে অবশ্য রূপকথার ছলে সেই রক্তাক্ত গণসংগ্রামের ভয়ানক স্মৃতিকেই প্রকাশ করে বলেছেন-

ঢেল ডগরে পড়ে কাঠি

রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা

ভালো মানুষের ছা।।[১৯]

এখানে কবি রাজনৈতিক ভণ্ডামিকে খানিকটা ব্যঙ্গ করেছেন রূপকথার গল্প বলার অনুষঙ্গে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভুলতে পারেন নি সেইসব দিনগুলোর কথা। রেডিওতে খবর শুনতে ভয় পেতেন, সকালে সংবাদপত্রে কি দুঃসংবাদ আসে,- সেই ভেবে বিচলিত হতেন। সেই সময় ভারতের নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া অনেক যুবক যুবতী শেষ পর্যন্ত পাকে চক্রে ষড়যন্ত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। উধাও হয়ে গেছে রামের বনবাসের মতনই। এই সময় কবি লিখলেন 'ছেলে গেছে বনে'(১৯৭২)-র মতন কবিতা। আসলে তাঁর কবিতার বক্তব্যের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় মিথপুরাণের ছায়া। "ছেলে গেছে বনে- যা রামের বনবাসের স্মৃতিবাহী। আমাদের দেশে নকশাল আন্দোলন যে বিপন্নতা তৈরি করেছিল, তারই ছায়া পড়েছে কবিতায়। পুত্রহারা বহু পিতার আর্তি প্রতীকী তাৎপর্যে এখানে রূপ পেয়েছে। কবি তাঁর অচরিতার্থ স্বপ্ন, কর্মের উদ্যমকে অভিষিক্ত করেছেন উত্তরাধিকারীকে। যা নিয়ে সে গেছে বনে-জেলে"।[২০] সেইসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যারা এগিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই হয়তো বাড়ি ফিরতে পারে নি। কিন্তু একটা সুদূরপ্রসারী ফল রয়েই গেছে। এখনও প্রতিবাদী মিছিলে দলমত নির্বিশেষে মানুষের ঢল নামে। সভায় লোক সমাগম হয় মারাত্মক ভাবে। যদিও সেইসব গণসংগ্রামের অবশিষ্ট মানুষেরা এখন সংসার ধর্মে ডুব দিয়ে আগের মত সময়ে গণসংগ্রামীদের সঙ্গে সময় মেলাতে পারে না। কিন্তু তাদের ভাল কাজে সব সময় সায় আছে। যদিও-

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে

ছেলে গেছে বনে।

অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্ত পাখা

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

আমারই পতাকা।।[২১]

রাজনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আর স্পন্দিত হল না কবিতা, এমন কিন্তু নয়। সুয়েজখালকে কেন্দ্র করে মিশরের সঙ্গে ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ ('কাণ্ড দেখ', 'মামা ভাগ্নের গল্প', 'পারুল বোন') আফ্রিকার স্বধীনতার লড়াই ('মেজাজ') এর মত আন্তর্জাতিক ঘটনা, সে সঙ্গে এ দেশের প্রথম লোকসভা নির্বাচন('রাস্তার গল্প') থেকে শুরু করে ৬০-এর দশকের খাদ্য আন্দোলন ('রাস্তার লোক', 'কেন এল না')- সমস্ত কিছুই কবিমানসকে আক্রান্ত করেছে, আলোড়িত করেছে আগের মতোই। কিন্তু চাল বদলে গেছে কবিতার। ঘোষণার বদলে এসেছে ছোটগল্পের মেজাজ আর মূর্ছনা ('অগ্নিগর্ভ', 'একটি লড়াকু সংসার', 'কেন এল না') ফতোয়ার বদলে ছড়ার সুর ও স্বর('পারুল বোন', দিয়েন বিয়েন ফুঃ', 'এক যে ছিল'), তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে লঘু চালের ঠাট্টা ('পারাপার', 'কাণ্ডদেখ', 'মামা ভাগ্নের গল্প')। এই চাল বদলের নেপথ্যে কাজ করেছে জনসাধারণের কাছে কবিতাকে পৌঁছে দেওয়ার ঝোঁক, এর সঙ্গেই লোকায়ত সংস্কৃতিকে আত্তীকরণের প্রয়াসও। কবিতা এইভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে গল্পের ছাঁচে, ছড়ার সুরে, মেয়েলি ব্রত-তুকতাকের নিপুণ ব্যবহারে। এসেছে কেতাবি শব্দকে সম্পূর্ণ পরিহার করে জনজীবনের নিবিড়তা থেকে তুলে আনা চলিত শব্দমালা। রাজনৈতিক চেতনার নতুন আলোয় এভাবেই কবিতা হয়ে উঠেছে বহুবর্ণ সঞ্চারী।[২২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়াসংগ্রহ, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ, কলকাতা- ২০১১-এর ভূমিকা অংশের একটি আলোচনা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি, যথা- "সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছড়া লিখতে শুরু করলেন কবে? বয়স যখন তাঁর ষাট পেরোল তখনই? কথাটা উঠল এই জন্যে যে হিসেব করলে দেখা যাবে তাঁর প্রথম ছড়ার বই বেরোনোর সময় তাঁর বয়স ছিল ঠিক একষট্টি। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাঁর সিদ্ধি অনায়াস, ছন্দ যার হাতে নিজেকে নিঃশর্তে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে; ছড়ার রাজ্যে পা ফেলতে তাঁর এতটা সময় লাগল কেন? প্রশ্নটা উঠেই পড়ে। উত্তর খুঁজতে আমাদের চোখ রাখতে হয় 'পদাতিক' থেকে 'ছড়ানো ঘুঁটি' পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর কাব্য পরিক্রমার দিকে। অনুসন্ধানী পাঠক আর রসজ্ঞ সমালোচক তাঁর সূচনাপর্বের অনেক রচনাকেই ছড়া বলে চিহ্নিত করেছিলেন। নানা বিপরীতধর্মী গুণে এই ছড়াগুলির স্বভাব যে স্বতন্ত্র সে-কথাও তাঁদের মনে হচ্ছিল। অনুভূতির তীব্রতার সঙ্গে এইসব ছড়ায় অনায়াসে মিশে যায় শাণিত বিদ্রুপ, লৌকিক চাল আর নাগরিক মনন এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ গতি হয়েও এরা থাকে সংযত,। লক্ষ্যভেদের সময় এরা শুধুমাত্র পাখির চোখকেই দেখে"।

তথ্যসূত্র:

১. পাদটীকা: বাংলা শিশু সাহিত্য/ প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৯৬, পৃ. ১৭৩।

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা, বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৮৩।

৩. দ্রষ্টব্য: পাঁচ বছরের কবিতা ১৩৫৪-১৩৫৯, ক্ষীতিশ রায় সম্পাদিত সাহিত্য মেলা; বিভাগোত্তর পূর্ব-পশ্চিম বাংলা সাহিত্যে সংকলন।

৪. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০১১, পৃ. ১৯।

৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা, বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৮৬।

৬. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০১১, পৃ. ৩৮।

৭. তদেব, পৃ. ২০।

৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা, বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৮৭।

৯. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০১১, পৃ. ১৮।

১০. তদেব, পৃ. ৪০।

১১. তদেব, পৃ. ২১।

১২. তদেব, পৃ. ১২৫।

১৩. আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম, মণ্টু মিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা-১৯৯৯, পৃ. ৪০।

১৪. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০১১, পৃ. ১২৯।

১৫. তদেব, পৃ. ২২৪।

১৬. আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম, মণ্টু মিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা-১৯৯৯, পৃ. ৪১।

১৭. 'খেলা হবে'

১৮. 'দেওয়ালে লেখার জন্য'

১৯. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০১১, পৃ. ৪২।

২০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মিথ-পুরাণের ছায়া, সম্পাদক- তরুণ মুখোপাধ্যায়, পত্রপুট, পৃ. ৩৩।

২১. 'ছেলে গেছে বনে'

২২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা, বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৮।

ঘ. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৭৫):

রিপন কলেজে আই এ পড়ার সময়ে অধ্যাপক ও কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে পরিচয় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আগ্রহী করে। এই সময় তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হন কারণ বাংলার তরুণ সমাজের প্রধান অংশ তখন মার্কসবাদের মধ্যেই আধুনিকতম আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বটি সন্ধান করছে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট হবার প্রবণতা যথেষ্ট। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। সে সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাম্যবাদী সংগঠনের সবচেয়ে কাছাকাছি। ১৯৪২-১৯৪৫ এই সময়ের মধ্যে প্রায় তিন বছর তিনি কমিউনিস্ট দলের প্রাথমিক স্তরের সদস্যও ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কোনদিনই অবশ্য সেই সংযোগ মনের দিক থেকে সুদৃঢ় কোন ভিত্তির উপর দাঁড়ায়নি। এই কবি প্রকৃতপক্ষেই কোনদিন খুব বেশি পলিটিক্যাল পড়াশুনা না করেই পলিটিক্যাল কবিতা লিখেছিলেন। অবশ্য কবিতার ক্ষতি তাতে হয়নি কারণ যে উদার মানবিক নীতিতে সব রাজনীতির কেন্দ্রেই মানব মঙ্গলের সাধনাটি থাকার কথা সেই কেন্দ্রটিই সর্বদা সুস্থির ছিল তাঁর ক্ষেত্রে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মানুষই সবচেয়ে মূল্যবান- কবিতায় মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতায় তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ, ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনাবিল ও মুক্তদ্বার হৃদয় নিয়ে তিনি দুহাত বাড়িয়ে দেন সর্বদাই।

একদা কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষ উদ্ধার কল্পে যে কাণ্ডারীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেন তার বাস্তব রূপ। কবি বীরেন্দ্র একই সঙ্গে সহমর্মী ও সহযোদ্ধা। দুঃখী মানুষ, লড়াকু মানুষ, স্বপ্ন দেখা মানুষ, মাথা উঁচু করে থাকা মানুষ, ক্লান্ত মানুষ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে কবি কখন যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেন তা টেরও পাওয়া যায় না। আর এই সর্বব্যাপী একাত্মতা থেকেই তাঁর লঘু চালের অন্ত্যমিলযুক্ত ছড়া জাতীয় কবিতা হয়ে ওঠে শোষিত মানুষের দাবি আদায়ের ইস্তেহার। যেমন-

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার

অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।

সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে

ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।[১]

তাঁর কবিতায় যত ডুব দিই আমরা: একের পর এক শিশুদের পাই, কখনো মা সহ, কখনো মা ছাড়া। এইসব শিশুরা কেউ ফুটপাথে শুয়ে আকাশ দেখছে, কেউ ঘুণধরা অন্ধকার ঘরে শুয়ে কাঁদছে, কেউ মাতৃগর্ভের ভেতর রক্তজবার মত ফুটে উঠে নিজের স্বদেশকে চিনে নিতে চাইছে। যে শিশু এসেছে এই পৃথিবীতে এবং যে শিশুরা আসতে চাইছে এই পৃথিবীতে- কবি বীরেন্দ্র তাদের জন্যই এক শুদ্ধতম স্বদেশ সন্ধান করেন প্রেমিক ও প্রতিবাদী সত্তা ধারণ করেই। এই প্রেম এই প্রতিবাদ তাঁর ভেতরের সত্তায় অহরহ সংক্রমণ করে বলেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত মা ও সন্তানদের জন্য লিখতে পারেন 'ভাতে পড়ল মাছি' কাব্যগ্রন্থের 'জাতক' এর মত উচ্চকিত স্লোগানধর্মী রচনা-

পেটে আগুন খিদে

হাঁটতে শিখেছে;

গলার রক্ত খিদে

পৃথিবী দেখছে।

হাত দুটি তার খিদে

কেবল বলে দে!

পা দুটি তার খিদে

পৃথিবী গিলছে।[২]

'বেকার জীবনের পাঁচালি' থেকে আমরা যখন 'কালো বস্তির পাঁচালি'-র বেদনার্ত প্রেক্ষাপটে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দুটি রচনার অভ্যন্তরস্থ অন্তরঙ্গ যোগ আমাদের নজর এড়ায় না। তবে 'কালো বস্তির পাঁচালি'-তে এসে তিনি নিজেই না বলা ব্যঞ্জনার নিয়ন্ত্রিত শিল্প সংযম একটানে ছিঁড়ে দিলেন। সমস্ত ছড়াটিতে আমরা দেখলাম মা ও শিশুর বুক ভাঙা কথোপকথন। অনেকে এই ধরনের রচনাকে হালকা চালের কবিতা বললেও আমার মতে এটি একটি ছড়া। কারণ তিনি লোকপ্রচলিত শব্দ ও ছড়ার আঙ্গিককে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন 'কালো বস্তির পাঁচালি'-তে। যথা-

শূন্য উঠান শূন্য মাচা

শূন্য ভাঁড়ার ঘর;

এমন দিনে বাছারে তোর
এ কোন কঠিন জ্বর?

এর ঝাঁটা ওর লাথি খেয়ে
বেড়েছিস তুই ছেলে;
বাঁচবি কি তুই এই জ্বরেও
উপসে দিন গেলে?

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
আমি কি তোর মা?
চোখের জলে ঘর ভেসে যায়
তাপ তো কমে না।

ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ
কান্না-ভেজা ঘরে
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে।[৩]

১৯৪২ সালের ৯ এপ্রিল জাপানি বিমান সর্বপ্রথম ভারতে বোমাবর্ষণ করে। ১৪ জুলাই গান্ধিজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করে। এরপর ৮ আগস্ট জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ৯ আগস্ট গান্ধিজীসহ বহু নেতা গ্রেপ্তার। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। চরম সীমায় পৌঁছয় ১লা সেপ্টেম্বর রাসবিহারী বসু 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'(আজাদ হিন্দ ফৌজ) প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিক ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভারতের ঔপনিবেশিক ইংরেজ

সরকার ঘরে বাইরে চাপের মুখে পড়ে যায়, এমত অবস্থায় ২০ ডিসেম্বর কলকাতার আকাশে আবার জাপানিরা বিমান হানা চালায়। ফলে ইংরেজ সরকার জাপানিদের আক্রমণের ভয়ে কৃত্রিম খাদ্যাভাব তৈরি করেন। আর এই বছরের ১৬ অক্টোবর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুর ও দক্ষিণবঙ্গের সহস্র লোকের মৃত্যু হয় এবং ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৪৩ সালে মন্বন্তর ঘটে।

এই ঘটনার মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে স্বাধীন ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ১৯৬২ সালে। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে চীন ভারতকে আক্রমণ করলে শুরু হয় ভারত-চীন যুদ্ধ (১১ অক্টোবর) যার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বাধীন ও পরাধীন ভারতবর্ষের দুটি মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতবর্ষ' নামক একটি ছড়ায়-

১৯৪২

মণি, আমার মণি

কেন রে তুই কাতর?

কপালে দিই চুমা

এবার মণি ঘুমা;

স্বাধীন হতে বুক করেছি পাথর।

১৯৬২

মণি, আমার মণি

ক'দিন উপবাসী?

জ্বরে পুড়ছে গা

চুমায় সারে না;

স্বাধীন দেশে চোখের জল-ও বাসি।[৪]

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য যদি হয় শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি- সেই উৎপীড়ন সমাজ করুক অথবা ব্যক্তি, প্রশাসন অথবা রাজনৈতিক দল সর্বক্ষেত্রে তিনি সেই মুক্তির বাণী বহন করেন।

আর এ কারণেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে 'গিরগিটির' সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ভালোরকম জানেন যে এই সকল নেতা-মন্ত্রীরা নির্বাচনের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণকে ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পর এই সকল নেতারা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে গিরগিটির মত রঙ বদল করেন। এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন-

বাছা আমার

বাছা আমার

গিরগিটির ছা;

যখন যেমন

রঙ বদলায়।

এই মাঠে, ঐ

মাচায় উঠে

রামধনু গায়।

সোনা আমার

পারলে কিন্তু

মানুষও খায়।[৫]

ষাটের দশকের অস্থির সময়ের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত কবিতাগুলিতে মধুরতার স্থান নিয়েছে স-বিদ্রুপ তীব্রতা, ক্লান্তিকে ঢেকেছে উত্তেজনার তাৎক্ষণিকতা, সুন্দরের ছবিকে কুরে খেয়েছে কখনো ক্রোধ, কখনো নৈরাশ্যের কীট। এই পরিবর্তনের মূলে আছে পশ্চিমবাংলার বিপন্ন সেই ষাটের দশক। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে গুলি খাওয়া দিয়ে শুরু। তারপর খাদ্য সংকটের ক্রমবৃদ্ধি, যুদ্ধে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া অর্থনীতি এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাস; প্রগতি-পন্থী রাজনৈতিক দলের দু-ভাগ হওয়ার আঘাত। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা এক জোট হতে পারেনি। তারা জন সংযুক্ত বাম মোর্চা (PULF) এবং সংযুক্ত বাম

মোর্চা (ULF)-এই দুই পৃথক জোট হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। সি পি আই ছিল প্রথম জোটের আর দ্বিতীয় জোটে ছিল সি পি আই(এম)। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে দীর্ঘ দিনের পারস্পরিক তিক্ততা ভুলে সি পি আই ও সি পি আই(এম) –এর রাজ্য নেতৃবর্গ একই টেবিলে সরকার গঠনের আলোচনা শুরু করেন। এর ফলে প্রথম অ কংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার দু-মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অশান্ত হয়ে ওঠে এক অতি র‍্যাডিক্যাল কৃষক আন্দোলনে। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তরা এক সময়ে সি পি আই(এম)-এরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু দলকে সংসদীয় রাজনীতির সরল রাস্তায় এগোতে দেখে তারা সি পি আই(এম)-কে শোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে দল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং নিজেদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেন নকশালবাড়িতে। স্বভাবতই নকশালবাড়ির ঘটনা সি পি আই(এম)-এর পক্ষে ছিল চরম অস্বস্তিকর। এই অস্থির সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখলেন ‘লাল টুকটুক নিশান ছিল’-এর মত ইতিবাচক রচনা-

বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী

কিন্তু এখন ‘শান্তি, শান্তি!’

প্রেতের মত ধুঁকছে মিছিল

উড়ছে পায়রা নধরকান্তি।৬

সমকালের প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা এভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জ্বলন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে- এতটা বোধহয় প্রত্যক্ষভাবে অন্য কবির লেখায় দেখা যায় না।

১৯৭৭-এর আগে পর্যন্ত এইসব উক্তির নিক্ষেপ যে প্রশাসনকে লক্ষ্য করে কবি করেছিলেন, তার সাহায্যে তাঁর দক্ষিণপন্থা-বিরোধী সমাজতন্ত্রবাদী ভাবমূর্তি যথেষ্ট প্রত্যক্ষ ছিল। ১৯৭৭-এর পর কয়েক বছরের মধ্যেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থার অবলম্বন রূপে সরে এলেন সমাজতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দলীয়তার তৃতীয় শিবিরটিতে। অবশ্য ১৯৬৮ থেকে তিনি নকশালপন্থী তরুণদের প্রতি বিচারহীন অত্যাচারের প্রতিবাদ করে চলেছিলেন অবিরাম। কিন্তু প্রতিপক্ষ ছিল না বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৭-এর পর রাজ্য প্রশাসনের পরিবর্তনে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে এবং নকশালপন্থী যুবকদের সম্পর্কে নতুন প্রশাসনের যে উদার সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করেছিলেন তা তিনি পাননি। দীর্ঘদিনের পরিচিত সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা তাঁর প্রত্যাশামত উত্তোলিত হয়নি। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন-

বন্দীমুক্তি আজও কানামাছি খেলা?

...   .

পোড়া কপালের মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা-

জেলের গারদ সামনে ভেংচি কাটে!

বক্তৃতা দেন হুজুর গড়ের মাঠেঃ

'হবে। সব হবে, একদিন সব হবে'... ।

কবে? মহাশয়! কবে? ৭

১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলন ও বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবিতা রচনার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতা তখন তাঁর কাছে প্রতিবাদের ভাষা; কবির প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতের ভাষা।

তাঁর কবিতা ভ্রষ্টাচারী শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে ভণ্ড-নেতা-কবি-সাংবাদিককুলের মুখোস উন্মোচনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, শ্লেষাত্মক ও নির্মম। অন্যদিকে সাধারণ উৎপীড়িত সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতায়, ভালোবাসায় তাঁর কবিতা নম্র ও স্নিগ্ধ। তেমনি একটি রচনা 'লেলিন শতবর্ষের দু'টি কবিতা'-

কবর থেকে উঠে এলেন,

সামনে মহৎ সভা।

অবাক হ'য়ে দেখেন তিনি

ভাষণ দিচ্ছে বোবা!

আরো অবাক, শুনছে যারা

জন্ম থেকে বধির তারা!... ।৮

১৯৬৭ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম সহযোগী বাম দলগুলির নির্বাচনী প্রচারে মূল উপজীব্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা সমাধানে কংগ্রেস সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং ক্ষমতায় এলে তাঁরা অনায়াসে যে এই সমস্যার সমাধান করবেন সে সম্পর্কে ভুরি ভুরি

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই খাদ্যসংকট মোচন ছিল নবগঠিত সরকারের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে রাজ্য জুড়ে যখন চাল, আটা নিয়ে হাহাকার পড়ে গেছে তখন সি পি আই(এম) নেতৃবর্গ প্রচার শুরু করেন যে কেন্দ্র উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহ করছে না বলেই রাজ্যের এই খাদ্যসংকট। খাদ্যমন্ত্রী নির্দল বিধায়ক ড. প্রফুল্ল ঘোষ সি পি আই(এম)-এর এই যুক্তি মানতে না চাওয়ায় সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ে খাদ্যমন্ত্রীর ওপর। অতঃপর শরিকি মত পার্থক্যের কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারে ভাঙন শুরু হয়। ইতিমধ্যে রাজ্য কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে নিয়ে এসে নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলত সে সময় আশু ঘোষ, খগেন দাশগুপ্ত, বিজয় সিং নাহার, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শৈল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

৩ নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে আরও আঠারো জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এর ফলে দৃশ্যত যুক্তফ্রন্ট সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। বিধানসভার অধিবেশন ডাকা নিয়ে এইভাবে কয়েকদিন টানাপোড়েন চলার পর রাজ্যপাল ধর্মবীর কোনও রকম পূর্বাভাস না দিয়ে হঠাৎ ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত অজয় মুখোপাধ্যায়কে চিঠি মারফত জানান যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি নয় মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছেন। প্রায় একই সময়ে সদ্য গঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (PDF)-এর নেতা হিসেবে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর দু-জন সহযোগী যথাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল ধর্মবীর কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার ঘটনা ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা হিসেবে আজও বিবেচিত হয়ে থাকে। রাজ্যপাল সেদিন যা করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ, অসাংবিধানিক ও অনৈতিক এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন পিডিএফ মন্ত্রীসভা ছিল অবৈধ।

অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের বিধায়ক ভাঙিয়ে পিডিএফ মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে যাঁরা ছিল মুখ্য ভূমিকা সেই কংগ্রেস এম এল সি আশু ঘোষের সঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পর শাসক দল ও কংগ্রেস উভয় পক্ষেরই সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল এই যে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর পিডিএফ ও কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন এবং আশু ঘোষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই নিজেদের মধ্যে কালনেমির লঙ্কাভাগে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই সক্রিয়তার পরিণতি হিসাবে ৪ ঠা ডিসেম্বর ৮ জন পিডিএফ সদস্য মন্ত্রী হন এবং আশু ঘোষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। ১৪ জানুয়ারি কংগ্রেস নেতৃবর্গ নতুন সরকারের

মন্ত্রীপদের জন্য রাজ্যপালের কাছে ৬ জন বিধায়কের নাম পাঠিয়ে দেন যাঁরা পর দিন রাজ্যপালের কাছে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।[৯] রাজ্যপালের বদান্যতায় রাজভবন থেকে ব্যাঙের ছাতার মত একাধিক মন্ত্রীর শপথ নেওয়াকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অথ মন্ত্রী কথা' নামক ছড়ায়-

১.

রাজভবনে মন্ত্রী গজায়

খবর পেয়ে ব্যাঙের ছাতা

চিঠি লিখেছে আড়াই পাতা,

সে-ও একটি রাজত্ব চায়।

২.

আয় বৃষ্টি হেনে   মন্ত্রী দেব কিনে

বাজার থেকে সস্তা   এক পয়সায় দশটা

ক'টা মন্ত্রী কিনলি বাছা?

'তিনটে পাকা, সাতটা কাঁচা'।

মন্ত্রী পড়ে টুপ টাপ

সোনা গেল গুপ গাপ...

৪. নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো ম'রে রয়েছে,

মন্ত্রী সভার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে...।[১০]

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই প্রধান নয়। মানুষ তাঁর কাছে সরাসরি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত- পীড়ক আর পীড়িত। সমাজ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে পীড়ক শ্রেণী অর্থাৎ রাজ, ভূস্বামী, জমিদার, মহাজন, তথা দেশের শাসক শ্রেণীর আসলে পোশাকের বদল মাত্র, তাদের স্বরূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় নেতা-নেতৃগণ ক্ষমতার লোভে একাধিক দল বদল করে

থাকেন, সে ক্ষেত্রে নীতি আদর্শের কোন বালাই চোখে পড়ে না। তিনি এই সকল রঙ বদলকারী, ক্ষমতালোভী নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন 'রাজা আসে যায়' নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনায়-

রাজা আসে যায়   রাজা বদলায়

নীল জামা গায়   লাল জামা গায়

এই রাজ আসে   ওই রাজ যায়

জামা কাপড়ের   রঙ বদলায়...

দিন বদলায় না! ১১

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার সমাজতন্ত্রবাদী কবিদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিশিষ্ট। তিনি সমাজতন্ত্রবাদের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবলী এবং সাংগঠনিকতার চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন স্বদেশের মানুষকে। জাতীয়তাবাদের প্রবণতাকে সমাজতন্ত্রী মানসিকতার সঙ্গে নিঃশেষে মেলাতে চেয়েছিলেন তিনি। ফলত তাঁর রচনায় তাত্ত্বিক কাঠামো একটু দুর্বলই তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানব মমত্ববোধ এবং সর্ব অর্থে পীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াবার দুর্জয় সাহসে তিনি চিহ্নিত করেছেন নিজেকে মানুষের কবি বলে। সমাজতন্ত্রবাদী কবির কাছে 'মানুষ' বলতে বিশ্বের সর্বহারাকেই বোঝায়। আর সে কারণে তিনি মনে করেন যিনি মানুষের কথা বলবেন, তাঁকে বলতে হবে মানুষের ক্ষুধার কথাও। শিল্প-সাহিত্যের পৃথিবীতে এই হল সমাজতন্ত্রবাদের সর্বোত্তম সত্য-শিক্ষা। সে জন্য তাঁর কাব্যের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে ক্ষুধা, ভাত ও রুটির প্রসঙ্গ। তবে তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি স্বদেশের ও বাংলার মানুষের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল আজীবন।

তথ্যসূত্র:

১. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮। ('মুখে যদি রক্ত ওঠে'(১৩৭১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা 'অন্নদেবতা')

২. কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি, জহর সেন মজুমদার, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩৭৭।

৩. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২০।

৪. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২৯।

৫. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'ওরা যতই চক্ষু রাঙায়' কাব্য গ্রন্থের 'বাছা আমার', প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪।

৬. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৪।

৭. 'বন্দীমুক্তি' অগ্রন্থিত কবিতা, সূত্র: আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২২৮।

৮. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৯।

৯. বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রা: লি:, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮-৫৯।

১০. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫৬।

১১.নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৯০।

ঙ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫):

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিভিন্ন রূপ পাঠকের যত পরিচিত, ছড়া ঠিক ততটা নয়। তবে আজীবন তিনি কবিতা লেখার ফাঁকে ছড়া লিখে গেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগের কর্ণাধর ছিলেন। আর এই সময় থেকেই শক্তি ছড়া লিখেছেন বেশি। বিজ্ঞাপনের জন্য লেখা তাঁর কিছু ছড়া এক সময় বিখ্যাত হলেও ছোটরা ছিল তাঁর খুব প্রিয়, তাদের জন্য তিনি নিজেও যেমন 'আনন্দমেলা'র পৃষ্ঠায় বহু ছড়া লিখেছিলেন, ঠিক তেমনি বন্ধুদের দিয়েও ছোটদের জন্য লিখিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাসে ষাটের দশক ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশৃঙ্খলার দশক। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে নড়বড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নানান সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষকে ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণ করে বসে, এই ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠতে না উঠতে ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের আখনুর অঞ্চলে পাক বাহিনি ভারত সীমান্ত আক্রমণ করে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটি আক্রমণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এই রকম একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং অল্প কিছুদিন পরেই শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবে এই ষাটের দশক ছিল খাদ্য সংকটের দশক। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটি প্রাচীন লোক ছড়ার আদলে বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

....

না পেলে ভাত, তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে।

আর কেঁদো না, আর কেঁদো না ভাতের পচাই দেব

আর যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব। [১]

অপর আর একটি ছড়ায় এই খাদ্যাভাবের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তিনি-

ভুল হয়েছে ভুল

মাথার ভিতর দু'হাত, ওড়ে পেটের ভিতর চুল

কোথায় হাওয়া, চোখের চাওয়া, কোথায় বকুল ফুল?

ভুল হয়েছেই, ভুল!

এই তো বনের ধার

কালো তিজেল, ঠাণ্ডা উনুন- বাড়ন্ত সংসার

কোথায় মানুষ, মেঘের ফানুস, কোথায় গলার হার

দুর পাহাড়ে দেখা আমার বাড়ন্ত সংসার! [২]

দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে ভারতের জনগণ যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চলেছে তখন আমজনতা ভেবেছিল বহুদিনের স্বপ্ন শোষণ নিপীড়নের থেকে মুক্তি পাবে তারা। কিন্তু সে স্বপ্ন অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে তার কারণ স্বপ্নের স্বাধীনতা এল বাঙালি জাতির বুক চিরে দেশভাগের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। এমতাঅবস্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার মধ্যে চীন ও পাকিস্তান অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতকে আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জনগণের মূল সমস্যা খাদ্যের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তখন আরও খারাপ কারণ সে সময় কয়েক লক্ষ শরণার্থী ওপার বাংলার ভিটে মাটি ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসে। সে সময় কিছু নেতা-নেত্রীগণের উদাসীনতার কারণে দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'মীমাংসা' নামক একটি বিখ্যাত ছড়া-

আমাদের এই ঝগড়া-বিবাদ

ওদের কাছে তুচ্ছ বলেই,

মীমাংসা সূত্রটি খুঁজতে

সামিটে যাই সবাই মিলে।

কিনার একটা পাবই পাব,

নইলে রাষ্ট্রসংঘে যাব।

সবার জন্য রুটি মাখন

নিজের জন্য 'আবার খাব'। [৩]

দীর্ঘ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সহ্য করে **১৯৭১** সালে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা চালিত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এই লড়াই মোটেও সহজ ছিল না, এর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণকে। ফলস্বরূপ হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণ ও বহু নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে **২৫** এপ্রিল জন্ম নিল স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। এই মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় সেনা অংশগ্রহণ করেছিল বলে **৩** ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে এবং ভারত তার যোগ্য জবাবও দেয়। আর এই পরিস্থিতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য আসরে নেমে পড়েন চীন-মার্কিনের মত সুযোগ সন্ধানী রাষ্ট্রগুলি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করে লিখলেন 'যুদ্ধের ট্রাম্পেট" নামক বিখ্যাত ছড়া-

যা লেবে তা ছে-আনা

চীন মার্কিন লেয়ানা

আংলা বাংলা করতে সাফ

দে দুশমান ঐ পগার লাফ

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত ছি:

মুক্তির মধ্যেই সিলেদি। [৪]

পরের বছর **১৯৭২** সালে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দিনটিকে স্মরণ করে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'প্রথম স্বাধীনতা' নামক ছড়াটি:

ছেলেটি খুব ছোট্ট তখন

কীইবা এমন জানতো

ছুটলো কিছু ফুল কুড়িয়ে

ছবির কাছে আনতে

আনলো রঙিন সিকলি এবং

আনলো সবুজ দূর্বা

উড়িয়ে দিল উচ নিশান

আর করে নি পূর্বে

বাড়ির মধ্যে জ্যেষ্ঠ তাদের

সবার চোখে অশ্রু-

ফুলের ভিতর শুভেচ্ছা। ৫

এই বিশ্ব সংসারে জাগতিক নিয়মে যেমন সবকিছুর পরিবর্তন ঘটছে তেমনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতারও পরিবর্তন আবশ্যক। শাসকের বদল না ঘটলে বা না ঘটালে শাসক প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বৈরাচারী হতে বাধ্য। তাই গণতন্ত্রের সুফল পেতে গেলে শাসকের বা রাজার পরিবর্তন প্রয়োজন। না হলে গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ। সেই বদলের কথা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর 'নতুন রাজা' নামক ছড়ায়:

এখানে রাজার কথাই সব

তাইত হবে না উৎসব

তোমরা যতই আর্জি করো

এখানে সময়ই আর নাই

তাইতো ভেঙে বলতে চাই

পারলে নতুন রাজা গড়ো। ৬

সস্তার রাজনীতি, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপুল এই বাংলার গ্রাম থেকে শহর কলকাতা অবধি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মানুষকে ভোলান কত সহজ। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জনগণের অবস্থা দেখে কবির মনে হয়েছে 'দরজির দোকানে টুকরো কাপড়ের মত ব্যর্থ সুখ' সব যেন। এ এক অবক্ষয়ের যুগ:

পৃথিবীর কিছু সত্যিকার ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাবে-

যেভাবে প্রতিমা ধোয়, সেভাবে ধোবে একদিন

বের হয়ে পড়বে খড়, কাঁচা বাঁশ- সাধ্য ও দালালি। ৭

মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। গরিবী হঠাও, প্রগতিশীলতার নাম নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা। অপদার্থতার জন্য গরীব গরীবই রয়ে গেছে। যার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে সমান প্রগতি আসেনি। তিনি আরও মনে করেন যে মানুষ কিভাবে মৃত হয়ে আছে তা দেশের নেতারা আজও জানে না। ফোলা ফাঁপা মিছিলে যত লোক বাড়ানো দরকার। এইসব নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছে। জামায় রক্তের দাগ পিছু ফেরা বিপ্লবের মত থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় স্পষ্ট কোন ধ্বংসের ভিতরে আমরা ডুবে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় দুটি বাক্য: "কবি সে জীবনের প্রবহমানতায়। কাঙাল সে এই তৃতীয় দুনিয়ায়"। ৮

পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যারা এসেছিল সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে সেই স্বেচ্ছাচারের মধ্যে থেকেও দেখা যাচ্ছে কবি শক্তি কখনই তাঁর নিজের জীবনকে বীজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলেননি। ক্লান্ত, অতৃপ্ত এবং অচরিতার্থ কবি শক্তি সব সময় যেন লিরিকমুগ্ধ এক জীবনের সন্ধানে রত।

চ. শঙ্খ ঘোষ:

এ যুগের উল্লেখ্য কবি পুরুষ শঙ্খ ঘোষ ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্য শান দেওয়া অস্ত্রের মত তাঁর কবিতা ঝলসে উঠেছে নিত্য বিদ্রোহে নয় বক্তব্যে। যেখানে যত ধ্বনি উঠেছে সমাজ সচেতন এই কবি রাজনীতির প্রত্যক্ষ উত্তাপ ছাড়াই সে ধ্বনিকে বাণীরূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। সব ক্ষেত্রেই জেগে থেকেছে তাঁর বিবেকবান মন, পরিশীলিত মনন আর অনুভুতি প্রখর হৃদয়। আত্মপ্রচার কেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীগণকে ব্যঙ্গ করে শঙ্খ ঘোষ লিখলেন 'লিমেরিক-৫'। লিমেরিকের বাংলা প্রতিশব্দ সে অর্থে আমরা পাই না, তবে লিমেরিক হল পাঁচ লাইনের ছোট কবিতা, সাধারণত রচিত হয় কোন লঘু বিষয় নিয়ে অর্থাৎ হাস্যপরিহাসের উদ্দেশ্যেই এই কবিতা রচনা করা হয়। এই ধরনের কবিতার অন্তমিলের ছক এইরকম- ককখখক। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মিল একরকম, তৃতীয়- চতুর্থ পংক্তির মিল অন্যরকম, আবার পঞ্চম বা শেষ পংক্তটির মিল থাকে প্রথম পংক্তির মতই। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশ উপভোগ্য কিছু লিমেরিক আছে। যদিও আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই লিমেরিক লিখেছেন, বিশেষ করে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খবাবুর 'সব কিছুতেই খেলনা হয়'(১৯৮৭) ছড়ার বইটিতে ১২ টি লিমেরিক ও ৩২ টি ছড়া প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল 'লিমেরিক-৫'-

মঞ্চে উঠে হাত পা ছুঁড়ে বাজ বিদ্যুত চমকাও

হুঁশ থাকে না ঘন্টা- মিনিট কিংবা শ্রোতার সংখ্যাও

চোখের জলে ভিজল গরদ!

পরের দুঃখে এমন দরদ

যৎসামান্য কমতে পারে একটু যদি কম খাও। ৯

বর্তমান প্রচার সর্বস্ব রাজনীতিতে মঞ্চে উঠে নেতাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, না সময়ের না শ্রোতার সংখ্যার। জনগণের দুঃখে এতই কাতর যেন মনে হবে এমন জনদরদী নেতা ভূ-ভারতে আর আকটিও নেই। অথচ নির্বাচনে জয়লাভের পর এই সকল নেতারা নিজেদের আসল স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং জণগনের টাকা আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই কবি উক্ত লিমেরিকের শেষ পঙক্তি বলেছেন- এই সকল জনদরদী নেতারা যদি জণগনের প্রাপ্য অর্থরাশি একটু কম আত্মসাৎ করেন তবে জনগণের দুঃখ অনেকটা কমতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বন্ধ্(বন্ধ) বা বন্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বন্ধ্(বন্ধ) ডেকে থাকেন। উদ্দেশ্য একটাই সাধারণ

মানুষের বিভিন্ন দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এই বন্ধের ফলে সাধারণ মানুষের রুটি রোজগারে টান পড়ে, ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি, অসুস্থ রুগী তথা রুগীর বাড়ির লোকের প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। আবার এই বন্ধ্(বন্‌ধ)-এর ফলে অনেক স্থানে বন্ধ্(বন্‌ধ) বিরোধী ও বন্ধ্ সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ফলে সরকারি সম্পত্তির নষ্ট হয় এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। কবি শঙ্খ ঘোষ বন্ধ্ সর্বস্ব রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন 'বন্ধ্ আর বন্ধ'। শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দদুটির অবিধানিক অর্থ যথাক্রমে- বন্ধ্(বন্‌ধ) মানে ধর্মঘট বা হরতাল, আর বন্ধ মানে অবরোধ, বাধা, কর্মহীন, গতিহীন।

বন্ধ্ আর বন্ধ

আমনের মনে মনে লাগে বড়ো ধন্দ
কোনটা যে বন্ধ্ আর কোনটা যে বন্ধ!

মা বলে যে, বুঝিসনা? দু-রকম ছন্দ-
বন্ধ্ হলো শুন্‌শান্। ভিড় হলে বন্ধ।

বন্ধতে বাড়ি বাড়ি ঘোরার আনন্দ
বন্ধ্ হলে থাকে সব বাড়িঘরে বন্ধ।

বন্ধ্ও তো দু-রকম, ভাল আর মন্দ-
কংগ্রেসে সি পি এম মুখ দেখা বন্ধ।

যা-ই হোক, কিবা ভেদ খানা আর খন্দ।
আমাদের সবই ভালো, বন্ধ্ আর বন্ধ। ১০

পঞ্চাশের দশকে তাঁর সমকালের যখন অনেক কবিই সময়, সমাজ, স্বদেশ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাতে রাজি ছিলেন না, ঠিক সে সময়েই শঙ্খ ঘোষ একাই সামাজিক

দায়বদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়ে লিখতে বসলেন। বর্তমান মনুষ্যত্বহীন সময়ের এবং বিবেকহীন সমাজের গভীরে পৌঁছে আমাদের জীবনের প্রকৃত অসুখটা কোথায় তা সনাক্ত করেছেন কবি 'বড় হওয়া খুব ভুল' নামক ছড়ায়-

বড়োরা যখন বড়ো হয়ে যায়
এত বড় হয় কেন?
আমরা যতটা বুঝি, তাদের কি
নেই ততটুকু জ্ঞানও?

সবার সঙ্গে সবাই কেমন
লড়াই করছে দেখ-
ঠাণ্ডা মাথার মানুষ চাও তো
লাখে মিলবে না একও!

দূরে চলে গেলে চ্যাঁচান ভীষণ
কাছে গেলে ঠোকরান
কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ
জ্বলে ওঠে পোখরাণ।

তারপরে দেখো এদেশে-ওদেশে
লেগেছে হুলুস্থূল-

রকমসকম দেখে বুঝেছি যে

বড় হওয়া খুব ভুল।[১১]

চল্লিশ দশকের উচ্ছ্বসিত আবেগ, উদ্বেলিত সংগ্রাম, অগ্নিময় স্বরপ্রক্ষেপ আর শঙ্খ ঘোষের দ্বন্দ্ব-সংশয়-যন্ত্রণার কর্ষিত ভাষারূপ এক নয়। তাঁর শিল্পময় চৈতন্য সবসময় মানুষের ভেতরের অনুক্ত জীবনবোধেরই সন্ধান করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'সুলতান' ছড়াটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

...হুকো- বরদার

বলে 'সর্দার

ওরা বজ্জাত

যত গর্জাক

নেই আপনার

কিছু ভাবনার

দেশ উলটান'-

শুনে হাসছেন

আর কাশছেন

দিয়ে ভুল টান

মহা সুলতান

নেই ঢাক-ঢাক

ক'রে হাঁক ডাক

দেশ পালটান

দেশ উলটান

আর মুলতান

গান সুলতান।[১২]

শঙ্খ ঘোষ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশ, মানুষ, প্রশাসন আর সমাজের অসহ্য ভণ্ডামীকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন বারবার। আসলে তিনি একদিকে ধ্বস্তজীবনকে দিতে চাইলেন শ্রী, সংযম ও সংহতির বোধ, অন্যদিকে আত্মধ্বংসে নিমজ্জিত মানুষকে দিতে চাইলেন সেই জীবনের মধ্যে থেকেই সাহস, নির্দেশ ও মীমাংসার বোধ সংগ্রহ করে নেবার অন্বেষণ ক্রিয়াজাত নিঃশব্দ প্রেরণা। এ জন্যই তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় (জানুয়ারি, ২০০১) এক সাক্ষাৎকারে বলতে পারেন- "আমি তো ধৃতরাষ্ট্র নই, বালিতে মুখ গুঁজেও নেই"। নেই বলেই তিনি জীবন চলাচলের মধ্যে যা নেই, যা যা নেই, তা ফিরিয়ে আনবার সন্ধানী হন, মানুষের মধ্যে যা যা নেই- সেই নিহিত সম্ভাবনারও আকুতিময় সন্ধান করেন নিজস্ব অস্ত্যর্থক প্রাণিত জীবনভাবনা থেকেই।

তথ্যসূত্র:

১. আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম, মণ্টু মিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৪-১০৫।

২. ছড়া সংগ্রহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৮৪।

৩. ছড়া সংগ্রহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪০।

৪. ১৫/১১/১৯৭১, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা।

৫. ছড়া সংগ্রহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬৩।

৬. ছড়া সংগ্রহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৮৫।

৭. আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম, মণ্টু মিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩-১০৪।

৮. প্রসঙ্গ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, 'অনীক' এপ্রিল, ১৯৯৫ (সংখ্যা)।

৯. ছড়াসমগ্র, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩।

১০. ছড়াসমগ্র, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩।

১১. ছড়াসমগ্র, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭৮।

১২. ছড়াসমগ্র, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৩।

ছ. জয়দেব বসু (১৯৬২-২০১২):

কাহিনীধর্মী কবিতা রচনার দিকে কবি জয়দেব বসুর ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর কবিতা সর্বদাই বিষয়মুখি। কবির বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ও পার্টির ইস্তেহারের বিষয় কবিতায় উঠে এসেছে বারে বারে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- 'ভ্রমণ কাহিনী', 'ভবিষ্যৎ', 'জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়', 'জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য', 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ ইত্যাদি। রাজনৈতিক সচেতনতা কবিকে সিক্ত করেছে তাই কবি জয়দেব বসু সচেতনভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর লেখনীতে-

...বুলেট এত নিবিড় টানে বাঁধছে দেশে দেশে

জোহানেসবার্গ- পানামা- গঙ্গা

মন কি লেলিন চায়? মনকে বলো হ্যাঁ,

মনকে বলো হ্যাঁ, তবু হ্যাঁ। ১

কবি রাজনৈতিকভাবে লেলিনবাদের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমান যুব সমাজকে। সারা পৃথিবী জুড়ে বামপন্থী ভাবধারা সমাজবদলের ডাক দিচ্ছে। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কবি লিখেছেন- 'মাও-কে যা বুঝেছি'-র মত কবিতা, যেখানে তিনি বলেছেন-

ভুলের সাথে ভুল ঠুকলেও ফুলকি জ্বলে,

ফুলকি থেকে

আগুন জ্বলুক,

এ-ঘর ও-ঘর, সবার ঘরে ঘরে।...

মেঘের সাথে মেঘ ঘষলেও

কামান ডাকে,

কামান দাগো

প্রতি পাড়ার সদর দপ্তরে। ২

দেশজুড়ে বেকারত্বের যন্ত্রণা নিয়ে কবি জয়দেব বসু ২৫ মে ১৯৯০ সালে লিখলেন 'নিজেকে দেখুন'। এই কবিতার প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন বেকার যুবকের সামনে 'গণতন্ত্রের' মানে কিভাবে পাল্টে যায়-

...আঠাশ বছর বয়সেও ব্যাঙ্কে আমার কোন অ্যাকাউন্ট নেই,

অথচ দেশ ভরে রয়েছে গণতন্ত্র,

উঃ এত গণতন্ত্র নিয়ে যে কী করি...! ৩

পিতৃ পরিচয়হীন পতিতালয়ে বেড়ে ওঠা এক ভারত সন্তানের নিজ শেকড় খুঁজে পাওয়ার প্রবল আকুতি উঠে এসেছে এই কবিতায়। তার কোন ধর্মীয় পরিচয় জানা নেই। সে শুধু জানে এই দেশ তার জন্মভূমি। ধর্মীয় পরিচয় কখনই একজন মানুষের আসল পরিচয় নয়, তার আসল পরিচয় সে একজন মানুষ। তাই কবি ধর্মীয় মেরুকরণের উর্দ্ধে উঠে সম্প্রীতির বার্তা দিতে কবি লিখলেন 'ভারত এক খোঁজ' নামক কবিতাটি-

বিশেষ কারণে এত বছর পর আমি অযোধ্যা এলাম,

এলাম আমার মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে।

না, আমার কি ধর্ম আমি জানি না,

জানি না আমার বাবা কে,

আমার মা-ও জানত না এসব।

আমার মা মুন্নাবাঈ জন্মেছিল এখানেই এক ঝোপড়ায়,

কোন পুরুষের ঔরসে তার জন্ম তা ঠাহর করে

বলতে পারেনি আমার দাদীও, সেক্ষেত্রে জাতপাতের

কথা তো ওঠেই না,

মা শুধু জানত কে তার মা,

মাননীয় বিচারক ,

একে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা যায় কিনা ভেবে দেখবেন...

কবি জয়দেব বসুর কবিতা ও জীবনযাপনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি সাধারণত যে ভাষায় কথা বলতেন সেই ভাষার ব্যবহারও কবিতায় করতেন। ফলে তার কবিতার ভাষা অন্য কবিদের থেকে অনেক বেশি সাহসী এবং কবিতা বলার ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কবিতার ভাষা স্লোগানের মত তীব্র ও ঝাঁঝালো বলে খুব সহজে পাঠকের বা শ্রোতার মনে দাগ কাটে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রেষ্ঠ কবিতা, জয়দেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৮।

২. তদেব, পৃ. ১৫১।

৩. তদেব, পৃ. ৪০।

জ. বিবিধ:

আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের নানা বিষয় নানা ঘটনা চিত্রিত হয় সাহিত্যে। ছড়া সেই সাহিত্যের একটি অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই ছড়ায়ও সমাজজীবন চিত্রিত হবে। তাই ছড়ায় পরিবারের নানা চরিত্র যেমন এসেছে, এসেছে সমাজ ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা। তবে এই সকল ছড়াগুলির রচয়িতাগণ প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও মতাদর্শগত কারণে হয়ত কোনও না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের পরোক্ষ সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তবে এই সকল লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারগণের ছড়ার মূল বিষয় কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের জনবিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করা।

১৯৭৪ সালে সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (কংগ্রেস) ঘোষণা করেছেন ১৭ বছর পর দেশে আর কোন বেকার থাকবে না। এই মেকি প্রতিশ্রুতিকে ব্যঙ্গ করে জর্জ মীরজাফর গোস্বামীর একটি ছড়া-

ভঙ্গ হলেও বঙ্গভূমি আজও রঙ্গশালা

রায়বাহাদুর অধিকারী বেকার বিদায় পালা

রূপো, সোনা, হীরে কতশত রজনী পার-

সতেরো বছর পর আর দেশে থাকবে না বেকার। [১]

সরকারে ক্ষমতাসীন থাকার সুবাদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিছু অসৎ নেতা মন্ত্রীরা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। আর এই সকল দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য গঠন করা হয় কমিশন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল ১৯৪৭ সালে গঠিত 'ওয়াঞ্চু কমিশন' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন কমিশন ভারতীয় রাজনীতি থেকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারেনি। ফলে এই কমিশন গঠনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জর্জ মীরজাফর গোস্বামীর একটি ছড়ায়-

বসিয়াছে এই বেলা তদন্ত কমিশন

হইবেই এবার দুর্নীতি রেমিশন

রাঘব বোয়াল হোক, চুনোপুঁটি ট্যাংরা

কালো হোক ধলো হোক, হোক বুড়ো চ্যাংড়া

কষ্টিপাথর এ যে অগ্নি পরীক্ষা

কালো হাত ভেঙে দেব, দেব জোর শিক্ষা।

ভ্যান ভ্যান করে তবু নিন্দুক মাছিতে

উজাড় হইবে গাঁও জোচ্চোর বাজিতে। [২]

বর্তমান নির্বাচন নিয়ে প্রথম সারির দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যালোচনার পাশাপাশি রঙ্গ-রসিকতা মূলক রচনারও প্রকাশ ঘটেছে। তেমনি ১৯৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কমলাকান্তের আসর' শিরোনামে 'কমলাকান্ত' ছদ্মনামে গদ্য, পদ্যে লেখা হয়েছে নানা সরস রচনা। ৭ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত- 'ভোটের নামতা' রচনাকারের নাম কমলাকান্ত শর্মা-

ভোট এক্কে ভোট

দশের এবং দেশের হিতে

কোমর বেঁধে ওঠ।

ভোট দুগুনে ভোট

শীতের রোদে শুরু হল

পাড়ায় পাড়ায় ঘোট।

তিন ভোটে ভোট

কোথায় টাকা কোথায় টাকা

লট লিঙ লুট লোট।

চার ভোটে ভোট

আমায় দেবেন ভোটটি বলে

দিগ্বিদিকে ছোট।

পাঁচ ভোটে ভোট
কাহার ভয়ে বাঘ গরুতে
হয়েছে একজোট।

ছয়ে ভোটে ভোট
দেওয়ালগুলোর পড়ল গালে
চুনকালির কোট।

আট ভোটে ভোট
দল পাকিয়ে সভা করি
বাক্যে বাহবস্ফোট।

নয় ভোটে ভোট
সবাই বলে মন্ত্রী হবো
মারবোরে এক চোট।

দশ ভোটে ভোট
ফল বেরলে ফকাক্কার
ডুবল সাধের Boat।

১৯৬৯ সালের ২রা জানুয়ারি দৈনিক বসুমতীতে 'ভোট তামাসা' নামে যে ব্যঙ্গ কবিতাটি ছাপা হয়, তা হল-

আমি কল্য রাজা হব,   কমিশনার পদ পাব

নির্বাচন প্রথা অনুসারে।

লক্ষ ভোট মোর পক্ষে   আর কি গো আছে রক্ষে

বিপক্ষে ভ্রুক্ষেপ কেবা করে।।

লেখাপড়া নাহি জানি   তাতে ত নাহিক হানি

ক-অক্ষর মহামাংস মোর।

ঢেরা কেটে করি সই,   তবু নির্বাচিত হই

হই হই হৈল শব্দ মোর

কলিকাল ধন্য ধন্য   আমি হৈনু গণ্যমান্য

অগ্রগণ্য বরেণ্য প্রধান।

১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় কৃষ্ণ দেবনাথের লিখিত 'ভোটের বাজার' রচনায় ভোটের ছড়ার রসস্নিগ্ধ গুণের পরিচয় মেলে, সরস রচনাটির নির্বাচিত অংশ- '... রেল স্টেশনের চত্তরে ঘুঙুর পায়ে একটি লোক নেচে নেচে ছড়া কেটে চলেছে। হাতে এক গাছা চটি বই। ছড়াকারকে ঘিরে এক দঙ্গল মানুষের ভিড়। উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনছে সুরেলা ছড়া...' । যেমন-

ভোটের ঢাকে পড়ল বাড়ি

দিকে দিকে ছুটছে গাড়ি

প্রার্থী ছোটে তাড়াতাড়ি

নরনারীর বাড়ি বাড়ি

থলি দিয়ে উজাড় করি

ঢালে টাকা কাড়ি কাড়ি

হাতের মাঝে ভাঙল হাঁড়ি

সাঙ্গ হল জারিজুরি

হবুচন্দ্র গেলেন হারি

ভূতলে যান গড়াগড়ি। ৩

আকাশবাণী প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় হিদায়েতুল্লা সাহেব বলেছেন মাউন্টব্যাটন হস্তক্ষেপের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা দশ দিন এগিয়ে আসে। দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে মাউন্টব্যাটনের যোগ্য নেতৃত্বের কথাও তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন। সে সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি বামপন্থীরা। তাঁরা মনে করত এই স্বাধীনতা আসলে 'ঝুটা আজাদী'। কারণ এটা ছিল হাত পেতে চেয়ে নেওয়া স্বাধীনতা, সংগ্রাম করে অর্জিত স্বাধীনতা নয়। ১৯৮০ সালে রচিত জর্জ মীরজাফর গোস্বামীর একটি ছড়া এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক-

অথ স্বাধীনতা কথা

মাউন্টব্যাটন ডিম পেড়েছে

নামটি তাহার আজাদী

সেই কথাটি গেছিস ভুলে

দেখ না কেমন সাজা দি!

গান্ধি হলেন ধম্মোবাবা,

আসল বাবা বিলাতে

মাউন্টব্যাটন হঠাৎ এলেন

স্বাধীনতা বিলাতে। ৪

সংবাদে প্রকাশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন ধর্মঘটই শ্রমিকের শেষ হাতিয়ার, সুতরাং এর ঘন ঘন ব্যবহার উচিত নয়। শ্রমিক সংগঠন গুলির ধর্মঘট ডাকার পিছনে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রছন্ন মদত কাজ করে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে ব্যঙ্গ করে রচিত ছড়া- শুনহ মজুর ভাই

সবার উপরে স্ট্রাইক সত্য

তাহার উপর নাই।...

বিফল নহে এ মন্ত্রী জনম,

পুনরায় যেন পাই।

শুনহ মজুর ভাই,

নির্বাচনের সংগ্রামে আজি

ভোটখানি শুধু চাই। ৫

১৯৫২ সালে শ্রী প্রসূন বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আগামী' (পত্রিকাখানি মাত্র ৬ বছর জীবিত ছিল), বসু মহাশয় তখন সবেমাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ রূপ নিঃসম্বল অবস্থায় পত্রিকাখানি প্রকাশের দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হন। 'আগমনী'র লেখক গোষ্ঠিভুক্ত ছিলেন- অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মিহির সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ। শ্রী প্রসূন বসু প্রকাশিত একটি ছড়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য-

তাই তাই তাই

মামার বাড়ি যাই

মামার বাড়ি গিয়ে দেখি

দুধ-ভাত নাই।

রেসন থেকে চাল এসেছে

ধান কাঁকড়ে ভরা

কাঁকড় মেশা ভাত খেয়ে

প্রাণটি হল সারা।

তিন দিনেতে চাল ফুরলো

চাপলোনা তো রান্না,

মামা-মামির বাচ্চা খোকা

শুরু করে কান্না। ৬

দেশভাগের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অরাজকতা অন্যদিকে দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে পরেছিল। এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মানুষের চরম খাদ্যাভাবের চিত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন উক্ত ছড়াটিতে কবি প্রসূন বসু। অপর আর একটি ছড়ায় ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মিথ্যা আশ্বাসবাণীকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি জ্যোতিভূষণ চাকী- মোদের মুখে দাও গো কিছু

দোহাই তোমার খুড়ো।

আরও একটু সবুর কর

দেব খুদের কুঁড়ো

আরও একটু সবুর কর

দেব ল্যাজা পুরো।... ৭

শ্রী অমিতাভ চৌধুরি ছিলেন একজন প্রথিতযশা রবীন্দ্রভাবুক, অগ্রগণ্য সাংবাদিক এবং প্রখ্যাত ছড়াকার। ছড়ার প্রকরণ সৌষ্ঠব রচনায় ও ছন্দ ব্যবহারের দক্ষতায় অমিতাভ চৌধুরির কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। সেকথা ছেড়ে রাখলেও বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর ছড়া এক অনন্য সামগ্রিকতা অর্জন করে নিয়েছে। বাঙালি ব্যক্তিত্বের একরাশ মুখ, এ দেশের ইতিহাস, পুরাণ সমসাময়িক ঘটনাবলী সবই যেন সুললিত বর্ণমালায় প্রকীর্ণ হয়ে থাকে তাঁর ছড়ায়-

বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি ঝরে

পৌরসভা নড়ে চড়ে।

মোটরগাড়ি গর্তে পড়ে,

রিকশাগুলো পর্দা পরে।

ভুগছে সবাই ডেঙ্গুজ্বরে,

কলকাতাতে বৃষ্টি ঝরে। ৮

উক্ত ছড়াটির রচনাকাল ২০০৪ সালের পূর্বে হলেও ছড়াটির প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান। কলকাতা পৌরসভার নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা আগেও ছিল বর্তমানেও আছে। আর যত্র-

তত্র জল জমার ফলে বর্ষা এলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। মজার বিষয় হল সারা বছর পৌরসভার এসব বিষয় নিয়ে কোন পরিকল্পনা থাকে না, আর যখন বর্ষা আসে তখন পৌরসভা নড়ে চড়ে বসে। ফলে এইসব সমস্যার সমাধান গোড়া থেকে না করে উপর উপর করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যে কারণে বর্ষার সময় এলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি শেষ থাকে না, অর্থাৎ বৃষ্টির জমা জল জনিত দুর্ভোগ আগেও ছিল বর্তমানেও আছে।

গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি নিয়ে সুভাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে পাহাড়ে অশান্তির আগুন জ্বলেছিল। বাংলাভাগের এই চক্রান্তকে ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরি যে ভালোভাবে নেননি তার প্রমাণ মেলে, এ প্রসঙ্গে রচিত ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায়-

ইসিং মিসিং সুভাষ ঘিসিং,

দুলছে দোলায় দার্জিলিং।

কালিম্পঙে কার্সিয়াঙে

গোর্খা বনাম বাঙালিং। ৯

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং সারা দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়। এর ফলে সাংবাদিক থেকে দেশের জনপ্রতিনিধিদেরও স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় সরকার বিরোধী প্রায় সকল নেতা-নেতৃগণকে জেলে বন্দী করা হয়, ফলে ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে অমিতাভ বাবু লিখলেন-

কোয়ালিশন নাশন

এল রাষ্ট্রপতি শাসন,

এম এল এ- রা বেকার

সংবাদ নেই লেখার,

নেই মন্ত্রীগণের ভাষণ। ১০

ভারতীয় গণতন্ত্রে ১৯৭৭ সাল নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। এই বছরের ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ প্রমুখ নেতৃবর্গের উদ্যোগে গঠিত হয় 'জনতা পার্টি'। ২১ মার্চ নির্বাচনে হেরে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধি পদত্যাগ করে। ২৪ মার্চ ভারতের প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই। ২৭ শে মার্চ জরুরি

অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং ২১ জুন প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে গঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধির দীর্ঘ ১১ বছরের শাসক জীবনের অবসানকে ব্যঙ্গ করে ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরি লিখলেন-

বারোটা বেজেই গেছে

বেলা হল থ্রি পি এম,

কত দল এল গেল,

এসেছেন সি পি এম,

তারে কি বধিতে ইন-

-দিরা গান-ধি (P.m)। [১১]

ছড়াটিতে লুকিয়ে আছে তীর্যক ব্যঙ্গ। দোদণ্ড প্রতাপ ইন্দিরা গান্ধির পরাজয়কে বারোটা বেজে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার আগে তিনি ছিলেন PM অর্থাৎ ভারতের 'Prime Minister' আর ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার পরে তিনি হলেন Pm অর্থাৎ 'Post meridiem'। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে কিভাবে একজন ব্যক্তির পদাধিকার পাল্টে যায় তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে উক্ত ছড়াটিতে।

ভারত ও চিনের মধ্যে ১৯৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সীমান্ত সংঘর্ষ অব্যাহত। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধ ও বহুবার আলোচনার টেবিলে দুই দেশ শান্তির প্রস্তাব দিলেও স্থায়ী সমাধান আজও অধরা। এ প্রসঙ্গে ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরির অভিমত-

ম্যাকমেহন লাইন-

ভারত গুপি গাইন,

চীনও বাঘা বাইন।

সমাজরং চু-

ডাই অর ডু

খেলছি হাডুডু।

কে করল চিটিং-

তাই নিয়ে হয় মিটিং,

মেজাজ খিটিং মিটিং।...

ঝাও ঝিন ঝোয়াং

তুলসীপাতা ধোয়াং,

চাইছে সিয়াং তোয়াং।

হ্যালো হ্যালো পিকিং-

নয়া দিল্লি স্পিকিং

- আমি ছড়া লিখিং। ১২

বাংলা শিশুসাহিত্য বিশেষ করে ছোটদের ছড়া-কবিতার জগতে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার একটি পরিচিত নাম। তবে তাঁর লেখার মধ্যে মজা বা হাসির ভিতর লুকিয়ে আছে সমাজের নানা অসাম্য-অবিচার-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে শ্লেষ। তিনি প্রায় সব লেখার মধ্যে ছোটদের শিক্ষণীয় বার্তা পৌঁছে দেন। তাঁর লেখার বিশেষত্ব হল অত্যন্ত সহজ ভাষায়, সরল ছন্দে তিনি নানা বিষয়কে ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন।

ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ সহজ সরল ভাষায় ভারতবর্ষের ৬০ শতাংশ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন 'জীবন যন্ত্র, মরণ মন্ত্র' নামক ছড়ায়। ভারতবর্ষের এই বিশাল সংখ্যক নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন কিভাবে যন্ত্রের মত একই জাঁতাকলে ঘুরছে এবং পরোক্ষভাবে জীবনের এই জাঁতাকল কীভাবে মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ছড়াটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-

আমাদের হাত নেই, ভাত নেই, জাত নেই

মেঝে নেই, ছাত নেই, দিন নেই, রাত নেই

সব পথ বিলকুল বন্ধ।

ভগবান আপনি কি অন্ধ?

আমাদের খুঁটি নেই, জুটি নেই, রুটি নেই

ছেঁড়া জামা দু-টি নেই, কোন লুটোপুটি নেই

নেই মনে খুশি খুশি গন্ধ।

ভগবান আপনি কি অন্ধ?... ১৩

স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা কথা খুব প্রযোজ্য যে, স্বাধীনতা অর্জন করার থেকে, অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা বেশি কঠিন। ভারতের ক্ষেত্রে সে কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য কারণ স্বাধীনতার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হলেও কিছু বিছিন্নতাবাদী সংগঠনের দ্বারা এই স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যক্তি বা কোন কোন জনপ্রতিনিধির দ্বারা আজ দেশের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বহু বীর সন্তানের শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে যারা ছেলেখেলা করেন তাদেরকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করেছেন ছড়াকার-

...স্বাধীনতা কারো নয় জমীদারি

নয় কারো কেনাকাটা পাটোয়ারি

পাট্টা!

স্বাধীনতা নিয়ে করে কারা মজা,

ঠাট্টা?

প্রতিরোধে ধর তুলে দুটি মুঠি

প্রতিশোধে কর সব বাধা ফুটি-

ফাট্টা।

স্বাধীনতা নিয়ে চলবে না খেলা

সাট্টা!!...

ভেঙে দাও তাই সব শঠ ষড়যন্ত্র

স্বাধীনতা হোক সবার বাঁচার মন্ত্র! ১৪

'আমরা স্বাধীন...স্বাদহীন...সাধহীন' নামক অপর আর একটি ছড়ায় ভবানীপ্রসাদ স্বাধীন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন-

আমরা কেমন স্বাধীন দাদা ? আমরা কেমন স্বাধীন ?

বোকার মত হাত-পা তুলেই নাচছি তাধিন তাধিন!

নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, চলছে এখন যা দিন

আমরা কেমন স্বাধীন দাদা ? আমরা কেমন স্বাধীন ?... ১৫

কিংবা 'স্বাধীনতার মানে' নামক ছড়ায় ছড়াকার দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন-

যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়

যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে, পালক ছাড়ায়,

যে ছেলেটা রেস্তারাঁতে ধুচ্ছে থালা-গেলাস-বাটি

যে ছেলেটা সারাজীবন খায় লাথি-কিল-চড় ও চাঁটি! ১৬

ভারতবর্ষের মাটি বহুত্ববাদের মাটি। প্রাচীন কাল থেকে এখানে নানা জাতি নানা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পারস্পরিক সহবস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে নিজের জন্মভূমি বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন ১৩০ কোটি ভারতবাসী যে কারণে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারত আজ দৃষ্টান্ত। বর্তমানে কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির মদতে এবং কিছু রাজনৈতিক ফায়দা লাভের আশায় ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে, যা মানবতা বিরোধী এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে উদ্বেগের। ভারতের এই অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন ছড়াকার 'এই দেশ আমার, স্বপ্নে ভাসার' ছড়াটিতে-

এ দেশ আমার   এ দেশ তোমার   এ দেশ সবার, সব্বার

এই দেশে বাস   করছি সবাই   যোসেফ-যতীন-জব্বার!

এ দেশ হিন্দু   এ দেশ বৌদ্ধ   এ দেশ মুসলমানের

এ দেশ আমার   স্বপ্নে ভাসার   এ দেশ প্রানের-গানের! ১৭

অপর আর একটি ছড়ায় সম্প্রীতি- সংহতির কথা তুলে ধরেছেন-

ক্যালকাটা-টু-কায়রো প্যারিস, মস্কো-সিকিম-সিডনি

কার দেহে কার বইছে রক্ত, কার দেহে কার কিডনি?

'আই-ব্যাঙ্ক' এ চোখ আছে আর 'ব্লাড-ব্যাঙ্ক' এ রক্ত

কোনটা যে কার, জাত-ধর্ম বের করা বেশ শক্ত! ১৮

২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে ক্ষমতাশীল সরকার বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ ছিল কৃষক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ এবং শিল্পায়ন কোনভাবে মানা হবে না। যার ফলস্বরূপ সিঙ্গুর, নেতাই এবং নন্দীগ্রামে কৃষক ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ ও প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি ছড়া-

...তত্ত্ব কথায় ভিজবে না চিঁড়ে

শুধু কর সংহার

একদিন ওরা জমিহীন কৃষকদের

করেছিল জমি বণ্টন

ছলা কলা করে সেই নেতারাই আজ

করে তাহা লুণ্ঠন।।...

ইতিহাস কভু কাহারে করে না ক্ষমা

সকল অত্যাচারের হিসেব সেখানে রয়েছে জমা।...১৯

এ প্রসঙ্গে পার্থ বসুর লেখা 'লালগড়' নামক একটি ছড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়-

লালগড় জুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

শান্তিমিছিল শহরের রাজপথে

লালগড় জুড়ে শকুনের উল্লাস

শান্তিমিছিল প্রলেপ দেবে কি ক্ষতে? ২০

২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকায় ৩০ মার্চ 'রবিবারের পাতায়' নির্বাচনী ছড়ার সংকলন প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে সময়োপযোগী কতগুলি ছড়া নিম্নে উল্লেখ করা হল-

অনাহারে শ্রমিক মরে

চাষির গলায় দড়ি,

ধর্ষণে আর নির্যতনে

বাংলা 'মডেল' গড়ি!

কিংবা- শিক্ষা-দীক্ষা উঠল লাটে

রাজনীতি কোন দেশী,

অনুব্রত আরাবুলেই

পিষ্ট ডেমোক্রেসি। [২১]

উক্ত ছড়াটিতে তৃণমূল সরকারের বাংলা মডেল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় অনুপ্রবেশকে নিন্দা করা হয়েছে। বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন দেবাশিষ বসু অপর আর একটি ছড়ায়-

যখন যেমন তখন তেমন

এটাই যুগের ফাণ্ডা

আগে ছিল 'লাল পতাকা'

এখন অন্য ঝাণ্ডা

বুদ্ধিজীবীর বেঁচে থাকার

এটাই নতুন ধান্দা। [২২]

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় পেশাদারি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় তারকারা বেশি। অর্থাৎ গায়ক, নায়ক, নাট্যকার ও খেলোয়াড়-এর সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। আসলে এই সকল সেলিব্রিটি প্রার্থীদের জনসংযোগের ক্ষমতা কম, সাধারণ মানুষ অতি সহজে তাঁদের সাক্ষাৎ পান না, তাদের অভাব অভিযোগ সহজে পেশ করতে পারে না, যে

কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরণের প্রার্থীর পরিবর্তে পেশাদারি রাজনৈতিক নেতা বেশি পছন্দ। তাই নাম না করে ‘ঘাটাল’ (দেব) ও ‘কৃষ্ণনগর’ (তাপস পাল) কেন্দ্রের এই দুই অভিনেতা প্রার্থীকে ব্যঙ্গ করে পি কে বিশ্বাসের একটি ছড়া-

ঘাটাল এবং কৃষ্ণনগর

ভোটবাজারে সবার নজর

অ্যাক্টো করে বেড়ান যাঁরা

ভোট প্রার্থী হলেন তাঁরা। ২৩

পৃথিবীর বেশিরভাগ উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান থাকলেও ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা লক্ষণীয়। এর ফলে ভারতের নির্বাচনে দলাদলির মাত্রা একটু বেশি লক্ষ্য করা যায় কারণ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণের পদ্ধতি আলাদা, এছাড়া দলগুলির মতাদর্শগত পার্থকের কারণে যে কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সহমত পোষণ করতে পারে না। ফলে নির্বাচন এলে এই সকল রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেতৃগণ পরস্পরের মধ্যে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের ন্যাক্কারজনক খেলায় মেতে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত শালিনতার মাত্রা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতেই ব্যাস্ত হয়ে পড়েন।

এই সকল ছড়ার কার্যকারিতা কী? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ‘দেশ বিদেশের শিশুসাহিত্য’, শঙ্খ ঘোষ, গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন- *“কী করতে পারে ছড়া ?*

> *খুলে দিতে পারে সব আগল, নিয়ে আসতে পারে বন্ধ ঘরের বাইরে, প্রতিদিনের মধ্যেই এনে বসাতে পারে আশ্চর্যকে, অভাবিতকে। বিশেষ করে ছন্দ যখন নাচে মেতে ওঠে খিল খিল, মিল যখন আচমকা ফুলঝুরি ছিটোয়, কৌতুক যখন প্যাঁচ কষে- কথার প্যাঁচ, আর বদলে দেয় চেনাকে অচেনায়, অচেনাকে চেনায়। ছেলেভুলানো ছড়ার লৌকিক চালের মধ্যেই এসে হাজির হয় অন্য রকম চলন, অন্যরকম ধরণ”।...*

তথ্যসূত্র:

১. মীরজাফরী, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী, নব সাহিত্য প্রকাশন, মার্চ, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ. ৮।

২. মীরজাফরী, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী, নব সাহিত্য প্রকাশন, মার্চ, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ. ৭।

৩. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবীর কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২৭।

৪. সাড়ে বত্রিশ ভাজা, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী, 'ধেড়েদের জন্য রচিত' সংকলনের প্রথম ছড়া, এখন বিসংবাদ, কলকাতা, ২০০২।

৫. সাড়ে বত্রিশ ভাজা, জর্জ মীরজাফর গোস্বামী, 'ধেড়েদের জন্য রচিত' সংকলনের নবম ছড়া, এখন বিসংবাদ, কলকাতা, ২০০২।

৬. আগামী পত্রিকা, সম্পাদনা শ্রী প্রসূন বসু, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৫৩।

৭. আগামী পত্রিকা, সম্পাদনা শ্রী প্রসূন বসু, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৫৩।

৮. ছড়া এবং ছড়া, অমিতাভ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৫।

৯. ছড়া এবং ছড়া, অমিতাভ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৬।

১০. ছড়া এবং ছড়া, অমিতাভ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩২।

১১. ছড়া এবং ছড়া, অমিতাভ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩২।

১২. ছড়া এবং ছড়া, অমিতাভ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৯- ৪০।

১৩. ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩৪।

১৪. ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮১।

১৫.ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮৬।

১৬.ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮৮।

১৭. ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮৪।

১৮. ছড়া সমগ্র, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৩৬।

১৯. শারদ সুকান্ত, বিষয়ঃ পরিবর্তন, ১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া, ২০০৯, পৃ. ১৬১।

২০. শারদ সুকান্ত, বিষয়ঃ পরিবর্তন, ১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া, ২০০৯, পৃ. ৭৫।

২১. গণশক্তিঃ ৩০শে মার্চ রবিবার ২০১৪, নির্বাচনী ছড়া শীর্ষক বিশেষ ক্রোড়পত্র, পৃ.৩।

২২. গণশক্তিঃ ৩০শে মার্চ রবিবার ২০১৪, নির্বাচনী ছড়া শীর্ষক বিশেষ ক্রোড়পত্র, দেবাশিষ বসু, পৃ.৩।

২৩. গণশক্তিঃ ৩০শে মার্চ রবিবার ২০১৪, নির্বাচনী ছড়া শীর্ষক বিশেষ ক্রোড়পত্র, পি কে বিশ্বাস, পৃ.৩।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া: পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-২০১৬)

৪.১. সাধারণ নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

৪.২. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭)।

৪.৩. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২)।

৪.৪. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭)।

৪.৫. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১)।

৪.৬. বর্তমান তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬)।

৪.১. সাধারণ নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:

ভোটদান-পদ্ধতি তথা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার কবে প্রথম সূত্রপাত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন মধ্যযুগে ইউরোপে এই ব্যবস্থা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। সে যুগেও সকল প্রতিনিধি-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত না, কেবল অভিজাত সম্প্রদায়, ভূস্বামী ও ধনী ব্যবসায়ীরা ছিলেন ভোটদানের অধিকারী। সুতরাং এসময়ে আইনসভাগুলি প্রকৃত অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, চোদ্দ শতকের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ফ্রান্সের এস্টেট জেনারেল (Estate General), স্পেনের কর্টস (Cortes) এবং জার্মানির ডায়েট (Diet) রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণের কিছু ভূমিকা পালন করলেও এগুলি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল না।

উনিশ শতকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষার অগ্রগতির ফলে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হতে থাকে। ব্রিটেন ছিল এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ১৮৩২ সালে পার্লামেন্ট প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। ১৮৬৭ সালে শিল্প-শ্রমিকেরা ভোটাধিকার লাভ করে। ব্রিটেনের অনুসরণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা তথা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। মহিলারা বহুদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার পর তা লাভ করেছে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার পবিত্র অধিকার বলে স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতেও এর অন্যথা ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সাথে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বজনীন ভোটাধিকার দানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন এবং ভারতের সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্তুত অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ন্যায় ভারতের নির্বাচনব্যবস্থা সমাজের 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে আজও কাজ করে চলেছে। এ প্রশ্নের জবাব মেলে ভারতের সংবিধানের ৩২৪ থেকে ৩২৯ নম্বর ধারায়। এই ধারাগুলিতে বলা হয়েছে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পূর্বে ২১ বছর বয়স হলে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করা হত, ১৯৮৯ সালে ৬১তম সংবিধান সংশোধিত হবার পর বর্তমানে তার পরিবর্তে ১৮ বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক বলে গণ্য হয়ে থাকে ও ভোটদানের অধিকারী হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৫১-১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১]

স্বাধীন ভারতে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন বা করতে পারেন তাঁরাই নির্বাচকমণ্ডলী (The Electorate)। এঁরাই

নির্বাচনের মূল। উইলোবির ভাষায়, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার (Representative Government) মূল ভিত্তি হল নির্বাচকমণ্ডলী। এঁদের লোকায়ত নাম হল 'ভোটদাতা'। এই ভোটদাতারা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন আর সেই প্রতিনিধিরা আমাদের শাসন করে থাকেন। যেমন ভারতের ভোটদাতারা তথা নির্বাচকমণ্ডলী লোকসভা ও বিধানসভায় যে সব সদস্যদের নির্বাচিত করে থাকেন তারাই আমাদের দেশের সরকার গঠন করে থাকেন। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে ভোটদাতাদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা আশুপ্রয়োজন। নিরপেক্ষ ভোট না হলে ভোটদাতাদের মনের মত প্রার্থী নির্বাচিত হবে না, তার ফলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এ প্রসঙ্গে স্যোসাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ছড়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়-

আমার গণতন্ত্র আমার কাছে দামি,

ভোট দিলাম তাকেই যাকে চাইছি আমি।[২]

বর্তমানে অবাধ, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন বাস্তবায়িত করার জন্য 'নির্বাচন কমিশন' ভোটদাতাদের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার করে থাকেন নির্বাচনের প্রাক্কালে।

বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক কার্যকলাপ তথা দেশের শাসনব্যবস্থা দলীয় ভিত্তিতে আবর্তিত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই- তা ইংল্যান্ডে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের(Liberal Democracy) অথবা কিউবা বা গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র(Socialist Democracy)- যাই হোক না কেন সর্বত্রই রাজনৈতিক দল ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অনুরূপ ভারতেও বর্তমানে বহু রাজনৈতিক দল দেখা যায়। নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি অনুযায়ী ভারতে রাজনৈতিক দল দু-প্রকার যথা- জাতীয় দল ও রাজ্য দল। জাতীয় দলগুলি ভারতের রাজনীতিকে মূলত নিয়ন্ত্রণ করে থাকলেও বর্তমানে আঞ্চলিক দলগুলিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করছে।

ব্রিটিশ সরকার সুচতুর পরিকল্পনা করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধি প্রবর্তন করে। এই বিধি অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ভোটারদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখন যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয় তখন সে রকম ছিল না। ভোটদাতাদের সম্পত্তির মালিক হতে হত, একটি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার হত। ফলে সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ১২ থেকে ১৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিতে পারতেন। তখন ভোট নিয়ে এত মাতামাতি ছিলনা, এত উত্তেজনা, এত মাইক, মারামারি ও টাকার খেলা ছিলনা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন ভোটের ফলাফলের দিকে তাকালে। নির্বাচনে এগারোটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস পাঁচটি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, এবং যুক্তপ্রদেশ) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। বোম্বাই প্রদেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি (১৭৫ টির মধ্যে ৮৬ টি) আসন লাভ করে। নির্বাচনের পরে বাংলার রাজনীতিতে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কোন দলই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি। ১৯৩৭- এর নির্বাচনে মোট ২৪৮ টি আসনের মধ্যে আসন ভাগাভাগির চিত্রটি ছিল এ রকম: কংগ্রেস- ৫৪, মুসলিম লিগ- ৩৯, কৃষক প্রজাপার্টি- ৪০, নির্দল মুসলিম- ৪২, নির্দল হিন্দু- ৩৭, ইউরোপীয়ান- ২৫, হিন্দু ন্যাশনালিস্ট (বর্ণ হিন্দু)- ৩, হিন্দু সভা (তফসিলি)- ২, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান- ২। এই পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার তা হল তৎকালীন সময়ের নির্বাচন ছিল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে বাংলা আর পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠন করল যথাক্রমে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এবং সিকন্দর হায়াৎ খানের নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট পার্টি।

স্বাধীনতার পূর্বে শান্তিপ্রিয় বাঙালির জীবনে প্রথম ঝড় নিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই ঝড়ের অনেকটাই বুক পেতে নিতে হয়েছিল পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ অখণ্ড বঙ্গভূমিকে। এই যুদ্ধ চলাকালীনই বাঙালি জীবনে দেখা দেয় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। মানুষের তৈরি করা এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে বঙ্গপ্রদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয় এবং আরও বহু লক্ষ মানুষের জীবন ওলট পালট হয়ে যায়। এই আঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই বাঙালি মুখোমুখি হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। নিরর্থক এই গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়াকে অস্বীকার করে দেখা দেয় এক অন্ধবৈরিতা। এর ফলে আহত হয় বাঙালির শুভবুদ্ধি আর মূল্যবোধ।[৩]

এইরকম অস্থিরতার মধ্যে যখন স্বাধীনতা আসে তখন বঙ্গবিভাগ থেকে উদ্ভূত বাঙালি সমাজ যথেষ্ট বিধ্বস্ত। স্বভাবতই স্বাধীনতাকে বাঙালি বরণ করেছিল সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে। আশঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে পাওয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্বস্ব হারিয়ে বা পিছনে ফেলে আসতে বাধ্য হয় আশ্রয়ের আশায়। বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে শরণার্থীদের এই আগমন স্রোত অব্যাহত থাকে। ছিন্নমূল এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আগমন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ছিল এক চরমতম সঙ্কট। একদিকে ছিল লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডে নতুন করে জীবন শুরু করার তথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমস্যা। অন্যদিকে ছিল এই সদ্য আগত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মূল জনগোষ্ঠীর অটুট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা। দুটি সমস্যাই ছিল কঠিন। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে স্বাধীনতার অল্প কিছু দিনের মধ্যে উদ্ভূত দুটি সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু শরণার্থীরা দলে দলে চলে আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা যায়নি, গোড়ার দিকে এই সম্প্রীতির ভীত কিছুটা নড়ে যায়। যেমন ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলায় হিন্দুদের ব্যাপকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলকাতা নগরীতে বিক্ষিপ্তভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, যদিও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় নিজে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থেকে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। তবে স্বাধীনতা উত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অটুট থাকে, যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়কে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হয়নি। এও ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর এক বড় সাফল্য। এর পিছনে অবশ্য রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারা ও কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রথম দুই দশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এক সজাগ প্রহরীর কাজ করে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা কিরণশংকর রায় ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশে কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কিরণশংকর ধীর-স্থির প্রকৃতির, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সুরসিক। ব্যারিষ্টারি পাশ করেও তিনি কখনও কোর্টে সওয়াল করেন নি এবং প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট সাহিত্য পত্র 'সবুজপত্র'-এর লেখক ছিলেন। অর্থাৎ নেতা হওয়ার সব

রকম যোগ্যতাই তাঁর ছিল এবং তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজেও তিনি ছিলেন এক বিশেষ আদৃত ব্যক্তি। তথাপি খণ্ডিত বাংলার শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দানের প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন তিনি উপেক্ষিত হন। কিরণশংকর রায় যদি সেদিন পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী হতেন তাহলে সম্ভবত বাঙালি রাজনীতির হাল ধরার জন্য বিধানচন্দ্রের আর ডাক পড়ত না। কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশ ছিল অন্যরকম। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মুহূর্তে যোগ্য আসন লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। অবশ্য এর পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও বঙ্গপ্রদেশের গভর্ণর বারোজের পরোক্ষ মদতে এবং মূলত শরৎচন্দ্র বসু ও প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাসিমের উদ্যোগে স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ডিত বাঙলা গঠনের যে প্রস্তাব প্রণীত হয় কিরণশংকর তা শুধু সমর্থনই করেন নি, কংগ্রেস শিবিরে এই প্রস্তাব গ্রহণের স্বপক্ষে তিনি যথেষ্ট ওকালতিও করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী এবং প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় সকলেই সংযুক্ত, স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। সর্বোপরি সেদিনের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে সাধারণভাবে জনমত ছিল স্বাধীন, সংযুক্ত বাংলার বিরুদ্ধে। অনিবার্যভাবেই তাই সেদিন অখণ্ড, স্বাধীন বাঙলার সমর্থক কিরণশংকরের উপর আস্থা হারিয়েছিল বঙ্গপ্রদেশের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন জেলাগুলির কংগ্রেস বিধায়করা তাঁদের নেতা নির্বাচনের জন্য যখন এক সভায় মিলিত হন তখন কিরণশংকর রায়কে বাদ দিয়ে তাঁরা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন এবং সুরেন্দ্রমোহন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতা নির্বাচিত হন যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে দু-মাস পরে পশ্চিমবঙ্গ নামে যে রাজ্যটি আত্মপ্রকাশ করবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষই হবেন তার প্রধানমন্ত্রী (ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী রূপেই অভিহিত হতেন)। পরের দিন, অর্থাৎ ২৩ জুন মুসলিমরা যেসব জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব জেলায় কংগ্রেস বিধায়করা কিরণশংকর রায়কে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। এতে কিরণশংকরের মুখরক্ষা হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী হওয়ার সুযোগই শুধু কিরণশংকরের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় নি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগও কার্যত নেওয়া হয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান দুটি গোষ্ঠী পরিচিত ছিল ‘খাদি গ্রুপ’ ও ‘হুগলি গ্রুপ’ নামে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ‘খাদি গ্রুপের’ প্রতিনিধি আর ‘হুগলি গ্রুপে’ সক্রিয় প্রবক্তা হিসেবে সে সময় পরিচিত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। গান্ধির অনুগামিতায় ‘খাদি গ্রুপ’ ছিল ‘হুগলি গ্রুপের’ তুলনায় এগিয়ে কিন্তু সাংগঠনিক শক্তির বিচারে ‘হুগলি গ্রুপ’ ছিল এগিয়ে। ‘খাদি গ্রুপের’ অন্যতম নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করলে ‘হুগলী গ্রুপের’ পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আশ্বাস দেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করলে বিধানসভার অধিকাংশ সদস্য তাঁকে সমর্থন করবেন। কিন্তু ডঃ রায় সে প্রস্তাবে রাজি হননি। অবশেষে 'হুগলি গ্রুপের’ প্রবক্তারা নিরুপায় হয়ে গান্ধির শরণাপন্ন হন এবং গান্ধি নিজে ডঃ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানালে ডঃ রায় সম্মতি দেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারি যে দিন ডঃ রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে।[৪]

৪.২. কংগ্রেস সরকার (১৯৫২-১৯৬৭):

আমাদের প্রত্যেকেরই অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে কম বেশী ছড়ার সাথে পরিচয় ঘটেছে। সাধারণভাবে 'ছড়া' বলতে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত এক ধরনের ছন্দবদ্ধ পদ্য রচনার কথাই মনে আসে। মূলত শিশুদের রচনা হিসেবে ছড়ার প্রচলন ও প্রসার হলেও তা শুধুমাত্র শিশুর জন্য রচিত হয়নি, সর্বদেশে সর্বকালে আবালবৃদ্ধবণিতা ছড়ার রসাস্বাদন করতে পারে- এমন একটি সর্বজনগ্রাহ্য ' চিরত্ব ছড়ার আছে'। হয়ত একদিন ক্রন্দনরত অশান্ত শিশুকে শান্ত করার জন্য আপাত অসংলগ্ন অথচ ধ্বনিমধুর ছন্দবদ্ধ এই পদসমষ্টি রচিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ ছড়ার মধ্যে মিশে গেছে সমাজ, অর্থনীতি ও ইতিহাসের নানা উপাদান, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনস্তত্ত্ব। সত্যিই তো 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো'- এই ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে বর্গি আক্রমণের মতো জাতির ইতিহাসের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাই তো সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন ছড়া কখনো পুরানো হয় না। চির নতুনের ভূমিকা নিয়ে সে চিরন্তন আছে। তবে অঞ্চলভেদে কালভেদে তার কিছু রূপ বদল হতে পারে মাত্র, কিন্তু তার মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না।

ছড়ার অন্তর্নিহিত নিজস্ব গুণের জন্যই বিভিন্ন কাজে ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমসাময়িক বহু ঘটনা প্রবলের কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এমন কি নির্বাচনী প্রচারেও রাজনৈতিক ছড়া স্থান করে নিয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্রিক ছড়া রচনার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে ছড়াকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

> "ভোটের হাওয়া তেতে উঠলেই দেওয়ালে দেওয়ালে যুদ্ধে মেতে ওঠে অক্ষর সৈন্য। যুক্তি, তক্ক, স্লোগান ইত্যাদির সঙ্গে সামিল হয় ছড়াও। ভোট শেষ হলে রোদ বৃষ্টি কিংবা নতুন স্লোগান বা বিজ্ঞাপণের কাগজ ছড়াগুলিকে ঢেকে দেয়। প্রেক্ষাপট পাল্টায়। নতুন নতুন ছড়ার গর্ভসঞ্চার হতে থাকে। পরবর্তী নির্বাচনে জন্ম নেয় নতুন ছড়া। ঐ ছড়াগুলির মধ্যে শুধু রাজনীতিই নয়, মাখামাখি করে থাকে ইতিহাস, আর্থসামাজিক অভিঘাত"।[৫]

আসলে ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লেই দম ফেলার ফুরসত থাকে না ছোট বড় সকল দলের নেতাকর্মীদের। শুরু হয়ে যায় দেওয়াল দখলের লড়াই। ভোটের উত্তাপ বাড়তেই ছড়ার ছন্দে দেওয়াল মাতাতে চেষ্টার কসুর করে না ছোট-বড় কোন দলই। শাসক-বিরোধী সকল দলই এসময় ছড়ার যুদ্ধে মেতে ওঠে।

স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে প্রথম নির্বাচন হল ১৯৫২ সালে। বস্তুত বিরোধীদের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতিপত্তি থাকায়, ভোটারদের মধ্যে কোনোরকম আপত্তিকর বা অসন্তোষজনক ঘটনা ঘটেনি ফলে, ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ নির্বাচনে কংগ্রেস বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫২- এর নির্বাচনে কংগ্রেস দখল করে মোট ২৩৮ টি আসনের মধ্যে ১৫১ টি, ১৯৫৭-এর নির্বাচনে মোট ২৫২ টি আসনের মধ্যে ১৫২ টি আসন এবং ১৯৬২-এর নির্বাচনে ২৫২ টি আসনের মধ্যে ১৫৭ টি। তবে এই তিনটি নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেস জয়ী হলেও তার জয় এসেছিল মূলত গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের সমর্থনে। শহরাঞ্চলের ভোটারদের একটা বড় অংশ এই তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। এর কারণ শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর বামপন্থীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং নগরাঞ্চলের শিল্প- শ্রমিক শ্রেণীও বাম-রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে ক্রমশ বিরূপ হয়ে উঠছিল। সেই প্রথম নির্বাচনে দেওয়াল লিখন ছিল প্রকৃতপক্ষে বিরল, সেই সময় বামপন্থী দল তাদের প্রতীক চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে সর্বপ্রথম দুই লাইনের ছড়া লেখেন-

ভোট দেবেন কিসে,

কাস্তে ধানের শিষে।[৬]

আর সে সময় বাচ্চারা এর নকল করে বানিয়েছিল

ভোট দেবেন কিসে

আলুর দমের ডিসে।[৭]

১৯৫২ সালের নির্বাচনে উক্ত সুন্দর ছড়াটি মহেশতলা এলাকায় প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে কাস্তে ধানের শিষ ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতীক।

বিধানচন্দ্রের সময়ের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। এই সময়ে দেশের আরও কয়েকটি অংশেও এ বিষয়ে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, কয়েকটি এলাকার এদিক ওদিক করে নতুন রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও এই কর্মসূচী গৃহীত হয় **১৯৫৬** সালে গঠিত ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের নির্দেশে। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করেন, **১৯৫৬** সালে যখন বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেস রাজ্য দলের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে কোনওরূপ মতামত গ্রহণ না করেই তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনেকে সে সময় বিধানচন্দ্রের এই পদক্ষেপকে পাগলের কাণ্ডকারখানা বলে উপহাস করেছিলেন। যদিও কংগ্রেসের যুক্তি কোন অসৎ উদ্দেশ্য বা খামখেয়ালিপনায় বিধানবাবু এই প্রস্তাব নেন নি। পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমির অভাবে যে সংকট দেখা দিতে শুরু করেছিল তা উদ্বিগ্ন করেছিল বিধানবাবুকে। তা ছাড়া সেই মুহূর্তে শিল্প সম্প্রসারণের প্রশ্নটিও ছিল খুব জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে বাঙালির মঙ্গল হবে ভেবেই তিনি সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে জনমত ছিল এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোভাগে রেখে সব বিরোধী দলই এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। লক্ষণীয়, বিধানচন্দ্র রায়ের এই প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলিকে সর্বপ্রথম একজোট হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করার সুযোগ করে দেয় এবং এই বিচারেও ডঃ রায়ের প্রস্তাব তাঁর নিজ দলেরই যথেষ্ট ক্ষতি করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে অনেকটা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দেন। সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভাকেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন অশোক সেন ও সমস্ত বিরোধী দল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মোহিত মৈত্র। ডঃ রায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে এই উপনির্বাচনকে তিনি সংযুক্তকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হলে এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন। উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন এবং এই ফলাফল ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধানচন্দ্র তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

স্বাধীনতার সময়েই অবশ্য ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের কথা বলা হয়েছিল। তা না করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের নীতি গ্রহণ করে তড়িঘড়ি দেশভাগ করা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট অন্যসব সমস্যার কথা চিন্তা না করেই। ফলে অন্যান্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মনে তখন থেকেই একটা চাপা ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। আঞ্চলিক ভাষাভাষি লোকেরা নিজ নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টারই ফল আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে ভাষা আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়ও এই রকম ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়। বিশেষ করে বিহারের মানভূম জেলার বেশ কিছু অংশে, বিশেষত পূর্বাঞ্চলে বহু ভাষাভাষী লোকের বাস। বিহারীরা তাদের উপর জোর করে হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দিতে চায় বাঙালিরা এর প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলনে পা মেলান এবং বাংলাভাষী মানুষ সেদিন গেয়ে উঠল:

শোন বিহারী ভাই-

মোদের রুখতে লারবি ডাং দেখাই...।[৮]

ডাং অর্থাৎ লাঠি দেখিয়ে বাঙালিদেরকে দমানো যাবে না। সীমান্ত এলাকা উত্তাল হয়ে উঠল। বিশাল জনতা একদিন কলকাতা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করল, দাবী আদায়ের সংকল্প বুকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত দাবী মেনে নিতেই হল। মানভূমের 'চাষ' ও 'চাণ্ডিল' থানা বাদে অবশিষ্ট অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পুরুলিয়া জেলা গঠিত হল।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল **১৯৫৭** সালের সাধারণ নির্বাচন। এবারে রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৩৮ থেকে ২৫২ হল। আর স্বাধীনতার পর দশ বছর কেটে গেলেও উদ্বাস্তু সংকট রয়ে গেল। যেসব উদ্বাস্তু এদেশে এসেছিলেন, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন তখনো হয়ে ওঠেনি। ফলে **১৯৫৭** সালের নির্বাচনে কিছুটা হলেও বিরুদ্ধ স্বর শোনা গেল দেওয়াল লিখনে:

আমরা কারা

বাস্তুহারা

বাস্তুহারা করল কারা

গদিতে বসে আছে যারা।[৯]

অন্য আর একটি ছড়ায়:

ঘর দিল না, কাম দিল না

ভোট চাও লজ্জা লাগে না?[১০]

১৯৫৭- এর নির্বাচনে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

ভোট দেবেন কোথায়

জোড়া বলদ যেথায়।[১০]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চিরন্তন প্রতীক (নির্বাচনী প্রতীক নয়) চরকা। শুধু তাই নয় এটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও প্রতীক। কিন্তু **১৯৫২-১৯৬৯** পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রতীক জোড়া বলদ। আবার রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীককে ব্যঙ্গ করে শাসক কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

কাস্তে ধার নাই

কমিউনিস্টের ভোট নাই।[১১]

আবার শাসক দল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখনের পাল্টা জবাব দিয়ে বিরোধীদের দেওয়াল লিখন: **১**. জোড়া বলদে দুধ নাই

অমুকের ভোট নাই।[১২]

২. জোড়া বলদের আটটি পা

গো হারা হেরে কাশী যা।[১৩]

৩. জোড়া বলদের আটটি ঠ্যাং

গো হারা হেরে কাশী যান।[১৪]

১৯৬২ সালের নির্বাচনে ছড়ার প্রাচুর্য দেখা দিল। অতুল্য ঘোষ ও বিধানচন্দ্র রায়ের নামে অশালীন উষ্মা:

পাঁচ বছরে ‘অমুক’ সেন

এত টাকা চুরি করেছেন।[১৫]

অথবা- নিমাই ভজা ‘অমুক ঘোষ’

তিন রকমের ‘ম’ এর দোষ।[১৬]

১৯৪৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারি থেকে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর কর্মরত অবস্থায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয়। ৯ জুলাই তাঁর মন্ত্রীসভার খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ নেন। ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে গোড়া থেকে একটানা যে দুজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের একজন কালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যজন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কালীপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুলিশমন্ত্রী। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে নিতান্ত নিরীহ ও সাদাসিধে বলে মনে হলেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট কড়া ধাতের মানুষ এবং সবিশেষ কৌশলীও। অন্যদিকে প্রফুল্ল সেন ছিলেন খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই দুজনের কঠোর সমালোচনায় বিরোধীরা ছিলেন নিত্যই মুখর। তথাপি বিধানচন্দ্রের গভীর আস্থা ছিল এই দুজনের উপর। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে ১৯৫২ এর নির্বাচনে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায় এই দুজন মন্ত্রীই পরাজিত হন। কিন্তু ডাঃ রায় তাঁদের মন্ত্রী করার ব্যাপারে এতই আগ্রহী ছিলেন যে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে এবং কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশনামা পাশ কাটিয়ে এঁদের দুজনকে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিধান পরিষদে নির্বাচিত করিয়ে মন্ত্রী করা হয়।

তবে প্রফুল্ল সেনের দুর্ভাগ্য ছিল এই যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে (প্রায় ১৫ বছর) বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। কারণ সেকালে ভারতবর্ষের কোনও খাদ্যমন্ত্রীরই সুনাম জুটত না, পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই। মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে তখনও সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়নি এবং ভূমি সংস্কারের ব্যাপারেও কোনও পরিকল্পিত উদ্যোগ ছিল না। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এক বড় অসুবিধা ছিল এই যে তাঁর সমসাময়িক অবস্থা ছিল যথেষ্ট প্রতিকূল। ১৯৬২-১৯৬৭ সাল এই পাঁচ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে এই সময়টা ছিল গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেই এক নিদারুণ বিপন্নতা ও বিপর্যয়ের কাল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তিন মাস পরে ভারত-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়

এবং তিন বছর পরে ভারতবর্ষকে পাক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। প্রথমটিতে ভারতবর্ষের লজ্জাজনক বিপর্যয়ে নগ্নভাব প্রকট হয়ে পড়ে, আমাদের জাতীয় সামরিক শক্তি তথা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা। অতঃপর দ্রুত এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগে। যে কারণে জাতীয় সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যয় করা হতে থাকে সামরিকীকরণে। এর সুফল অবশ্য পাওয়া যায় পাক-ভারত যুদ্ধে, যে যুদ্ধে যথেষ্ট আধিপত্য বজায় রেখেই ভারত পাক আগ্রাসনের মোকাবিলা করে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে পরপর ঘটে যাওয়া এই দুটি যুদ্ধের পরিণামে বিধ্বস্ত হয়ে যায় ভারতীয় অর্থনীতি, ফলে সারা দেশ চরম খাদ্যসংকটের মুখোমুখি হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুঃসময়ের মোকাবিলায় যে ধরনের বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় নেতৃত্ব এবং ইতিবাচক উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষমতা প্রফুল্ল সেনের ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট যখন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে তখন কাঁচাকলায় যথেষ্ট খাদ্য প্রাণ আছে বলে তিনি রাজ্যবাসীকে কাঁচাকলা খাওয়ার পরামর্শ দেন। সরল বিশ্বাসে তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কৌশলী বিরোধী পক্ষ ব্যাপক প্রচার চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে এই পরামর্শ দিয়ে তিনি অন্নভোজী বাঙালিকে উপহাস করেছেন। তৎকালীন সময়ে আরামবাগের গান্ধি নামে পরিচিত কংগ্রেস প্রার্থী প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে লেখা হয়ঃ

কাঁচা কলার বড় দাম
প্রফুল্ল সেন ফিরে যান।[১৭]

১৯৬২ সালের নির্বাচনে ব্যক্তি আক্রমণের যে চিত্র দেখা গিয়েছিল তা **১৯৬৭** সালের নির্বাচনেও দেখা যায়। এই নির্বাচনে এমন সব ছড়া ছড়িয়ে ছিল যা শালীনতাবোধে আঘাত দেয়। তেমনি একটি রাজনৈতিক ব্যক্তি আক্রমণ কেন্দ্রিক ছড়াঃ

দু আনা সের বেগুন কিনে
মন হল প্রফুল্ল
বাড়ি এনে কেটে দেখি

সব কানা অতুল্য। [১৮]

প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষেরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দুজনেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সমসাময়িক। প্রসঙ্গত অতুল্য ঘোষ ইংরেজদের অত্যাচারে জেলের মধ্যে একটি চোখ হারান। সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় স্বাধীনতার পরে ২৪ বছর সক্রিয় ভাবে রাজনীতি করেছেন এই দুই ব্যক্তিত্ব। যুযুধান পার্টিগুলি কেবল পরস্পরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যঙ্গ করেই থামছে না, ব্যক্তিনাম ধরেও আক্রমণ করছে।

১৯৬৭ সালের **১**লা জানুয়ারি নির্বাচনী সভা শুরু হল। তবে সব দলই এ ব্যাপারে একমত হয়ে বিধানসভা ভবনে সিদ্ধান্ত নিল, প্রচারে সবাই শান্তি বজায় রেখে চলবে। বলাবাহুল্য এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মানা সম্ভব হয়নি। মেদিনীপুরে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় অনেক নির্বাচনী অফিসেও, পোস্টার ছেঁড়া এসব তো চলতেই থাকে। **১৯৬২** সালে চীনের সাথে ও **১৯৬৫** সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল **১৯৬৭** সালের নির্বাচনী ছড়ায়, এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখনঃ

১. চীনের চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি

পাকিস্তানের তারা

এখনো কি বলতে হবে

দেশের শত্রু কারা?[১৯]

২. গড়তে দেশ, রুখতে চীন,

কংগ্রেসকে ভোট দিন।[২০]

৩. চীনের দালাল চীনে যাও

ভারত ছেড়ে চলে যাও।[২১]

৪. চুয়াং চুয়াং ছা

মাওয়ের বাচ্চা,

এদেশ তোদের নয়রে বাছা

এদেশ ছেড়ে যা।[২২]

কংগ্রেসের পাল্টা হিসেবে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখনঃ

১.মজুর কৃষক বাঁধল জোট,

কাস্তে হাতুড়ি তারার ভোট।

গড়তে দেশ রুখতে মার্কিন,

কংগ্রেসকে কবর দিন।[২৩]

২. ভোট পাবে কারা

কাস্তে হাতুড়ি তারা।

৩. যখন মানুষ চাহে বস্ত্র ও খাদ্য

সীমান্তে তখনই বাজে যুদ্ধের বাদ্য।[২৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য **১৯৬২** সালে চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব তাত্ত্বিক নেতাই পুরানো কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে যান। ফলত নতুন কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই(এম)-কে তারা বিপ্লবী চরিত্র প্রমাণ করে স্থিতি, ক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গি ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে হয়। এই সময় নতুন কমিউনিস্টপার্টি সি পি আই(এম)-এর নির্বাচনী প্রতীক ছিল কাস্তে হাতুড়ি তারা।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে নানা ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যস্তরে বামপন্থীরা তাঁদের র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির পোক্ত ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, এমনকি উদ্বাস্তু আন্দোলনে ও খাদ্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেও তাঁরা ভোট যুদ্ধে ছিলেন খুবই পিছিয়ে। অবশ্য প্রথম সারির বামপন্থী

নেতারা বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ নিজেদের অনাড়ম্বর জীবনচর্যা ও রাজনৈতিক সততার কারণে জনসাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন। তাঁদের জনসভায় বাস ও লরি সহযোগে লোক জড় করতে হত না, লোক আপনা আপনিই ভিড় করত এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই নেতৃবর্গ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার সঙ্গে নতুন মন্ত্রীসভার গুণগত পার্থক্য সহজেই বুঝে যান। ফলে কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণের ধারা অনেক বেড়ে যায়। এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তাঁরা বেছে নেন অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে। তাঁরা নানাভাবে তাঁদের নাস্তানাবুদ করতে সচেষ্ট হন:

আরাম বাগের হারাম খানায়

কাঁদছে বসে প্রফুল্ল

অজয় নদের বানে ভাসল

কানা অতুল্য

নেপাল রায়ের কপাল ভাঙ্গা

কাঁদছে বসে ফুটপাথে

সিমেন্টে হায় গঙ্গামাটি

ভাঙ্গাকপাল কি জোড়ে তাতে?[২৫]

এই নির্বাচনে কেবল ব্যক্তি আক্রমণ নয়, উৎসাহব্যঞ্জক ছড়াও পাওয়া যায়। যেমন-

১. জেগেছে কৃষক জেগেছে শ্রমিক

জেগেছে সর্বহারা

এবার নির্বাচনে ভোট পাবে সব

কাস্তে হাতুড়ি তারা।

২. দেশের সবাই একজোট

কাস্তে হাতুড়ি তারার ভোট।

৩. ভোট দিন বাঁচতে

তারা হাতুড়ি কাস্তে।২৬

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দেখলাম অতুল্য ঘোষের শারীরিক খুঁত নিয়ে নির্বাচনী ছড়া। প্রফুল্ল সেন সম্পর্কেও কিছু ছড়া, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ছিল আরও কিছু অন্য ধরনের ছড়া-

১. যেথায় আছে হরেকেষ্ট

সেইখানেতে পয়সা নষ্ট

সেই পয়সার হিসেব নেই

সি পি আই(এম)-এর ভোট নেই।

২. চোর জোচ্চর পকেটমার

সি পি আই(এম) মেম্বার। ২৭

বি দ্র: সি পি আই(এম)-এর পরিবর্তে কংগ্রেস শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে ছড়ার রসগুণ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

৪.৩. যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৭-১৯৭২):

অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন এই দু'জনেই আদর্শগত কারণে ছিলেন চরম কমিউনিস্ট বিরোধী। এই প্রেক্ষাপটে স্বভাবতই রাজ্যের দুই প্রধান বিরোধী দল সি পি আই ও সি পি আই(এম)-এর সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ষাটের দশকের মধ্যভাগে চীন-বিরোধী জনমতের সুযোগ নিয়ে এবং অবশ্য মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতাদের আটক করা হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতারা আহত বাঘের মত সরকার ও শাসক দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৪ সালে কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অজয় মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিপদ ত্যাগ করলে তাঁকে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। কিন্তু অতুল্য ঘোষের অনুগামী ও রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা ও দুর্ব্যবহার অজয় মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে দু:সহ হয়ে ওঠে। অবশেষে 'কুমার সিংহ' হলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় এবং তাতে অজয় মুখার্জী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে (২৯৬-৪০) ভোটে বিতাড়িত হলেন জানুয়ারি, ১৯৬৫। ক্ষুব্ধ, অপমানিত অজয় মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সুশীল ধাড়া, রজনী প্রামাণিক প্রমুখের সঙ্গে তিনি প্রথমে অনাচার নিরোধ সমিতি, পরে 'বাংলা কংগ্রেস' নামে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন দল গঠন করায় রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কংগ্রেস বাম বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলেই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬৭-এর নির্বাচনে 'জন সংযুক্ত বাম মোর্চা'(PULF) এবং 'সংযুক্ত বাম মোর্চা'(ULF) এই দুটি ফ্রন্ট আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়ে কিন্তু নির্বাচনের পর দুটি ফ্রন্ট যুগ্মভাবে সরকার গঠন করে তাই সরকারকে যুক্তফ্রন্ট সরকার বলা হয়। এই নির্বাচনে প্রধানত দুই কমিউনিস্ট পার্টির তিক্ত সম্পর্ক ও সি পি আই(এম)-এর অনমনীয় মনোভাবের জন্য লড়াই হয় প্রধানত বাংলা কংগ্রেস-সি পি আই-এর প্রগতিবাদী সংযুক্ত বামফ্রন্ট আর সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বামফ্রন্টের মধ্যে। ভোটদাতারা এই ভেদাভেদ উপেক্ষা করে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়ে দুটি ফ্রন্টকে একত্রে সরকার গঠন করতে একরকম বাধ্য করল। এমন সচেতনভাবে ভোট দেওয়া সচরাচর চোখে পড়ে না। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদীয় ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী এবং বাঙালি

রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম পরিচিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জে এম বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হন অতুল্য ঘোষ, আরামবাগ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে ৮০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন 'আরামবাগের গান্ধি' প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং রাজ্যস্তরের আরও অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পরাজিত হন, আর মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে **১২৭** টি আসন পেয়ে কংগ্রেস দল সর্বপ্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অ-কংগ্রেসি ও যুক্তফ্রন্ট নামাঙ্কিত কোয়ালিশন সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করে **১৯৬৭** সালের ২রা মার্চ। এইভাবেই প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান হয় এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একটানা ২০ বছরের শাসনে ছেদ পড়ে। অপেক্ষাকৃত সহজে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এল। তার পতনের পর **১৯৬৯** সালে আবার নির্বাচন হয়। মাঝে অল্পদিন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসনের অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজয় মুখার্জী, উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদে জ্যোতি বসু। এই সময় জোড়া বলদের দল জাতীয় কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

জোড়া বলদ টানছে মই।

উড়কি ধানের মুড়কি খই।।

জোড়া বলদ করছে চাষ।

দ্বিগুণ ফসল বারোমাস।।

বিরুদ্ধ দল যুক্তফ্রন্টের দেওয়াল লিখন:

জোড়া বলদ মারছে লাথ।

গরিবের নাই পেটে ভাত।।

কোথায় দুধ কোথায় দই।

গাছে তুলে কাড়ছে মই।।[২৮]

১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জীর মন্ত্রীসভার পরমায়ু এক বছরেই শেষ হয়। এরপর প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভাও ভেঙে যায় এবং ১৯৬৯ সালে উপনির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে দুই প্রতিযোগী দল কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট। আগের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জিতেছিল, তাই বরানগর, ঢাকুরিয়া, যাদবপুরের দেওয়াল জুড়ে কংগ্রেসের ছড়া:

১. যুক্তফ্রন্টে কি পেলাম

গুলি-বুলি-লালসেলাম।

২. শুনহ দেশের ভাই

যুক্তফ্রন্টে গদিই সত্য

দেশপ্রেম কিছু নাই।$_{২৯}$

১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে সারা পশ্চিমবাংলায় বেশ কিছু প্রাণহানি হয়। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ-সুকান্ত-নজরুলের কবিতাগুলিরও ব্যবহার হতে থাকে। শহীদের ছবি এবং ঐ কবিতাগুলি সেই সঙ্গে শহীদের নামের উল্লেখ। যেমন:

১. নুরুল আনন্দ হত্যার বদলা নাও

কংগ্রেসকে কবর দাও।

২. শহীদের রক্ত

হবে নাকো ব্যর্থ।

৩. শহীদের রক্ত ঋণ

কংগ্রেসকে কবর দিন। $_{৩০}$

যতদিন বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন সরকার ও প্রশাসনে তিনিই ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই জনসমক্ষে তাঁর এই দুর্বল নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরের হজরতবাল

মসজিদ থেকে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা শহরে দাঙ্গা শুরু হয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থায় ও রাজ্য রাজনীতিতে অতুল্য ঘোষের এই নজিরবিহীন প্রভুত্ব গণতন্ত্রকে প্রহসনে পর্যবসিত করে। সঙ্গত কারণে পশ্চিমবঙ্গে একটা অরাজকতা তৈরি হয় এবং বিরোধী নেতা-নেতৃগণের উপরও আক্রমণ নেমে আসে। যার ফলে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে শহীদ হতে হয়।

১৯৬৭ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে অ-কংগ্রেসিরা ১৪০ টি আসনে জয়ী হয়েছে তখন কিছু ফল প্রকাশ বাকি থাকা সত্ত্বেও সেই রাত্রেই অতুল্য ঘোষের উদ্যোগে রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক নির্মলেন্দু দে-র নামে একটি বিবৃতি দিয়ে রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার জন্য কংগ্রেস এবার বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকার গঠনের এই অনিচ্ছা ব্যক্ত হওয়ার ফলে সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসি সরকার গঠনের পথ প্রস্তুত হয়। পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও ২৮০ টি আসনের মধ্যে ১২৭ টি আসন পেয়ে কংগ্রেসই হয় একক বৃহত্তম দল এবং যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতার লক্ষ্যমাত্রা থেকে তার ব্যবধান ছিল মাত্র চোদ্দটি আসনের সে কারণে কিছু ছোট দলকে মন্ত্রীত্ব উপঢৌকন দিয়ে অথবা বাংলা কংগ্রেস ভেঙে সরকার গঠন করা অসম্ভব ছিল না। তাই সে সময় কংগ্রেস সরকার গঠনের জন্য খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিজয় সিং নাহার, শৈল মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সব উৎসাহ উদ্যোগে জল ঢেলে দেন কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ। বিচক্ষণ এই নেতা নির্বাচনের ফল দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে কংগ্রেস তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে এবং এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে তা স্থিতিশীল হতে পারবে না। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে অ-কংগ্রেসি দলগুলির মধ্যে মতাদর্শের ফারাক এত বেশি এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়া এত কম যে অ-কংগ্রেসি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও তা অল্পদিনে ভেঙে পড়বে। ১৯৬৭ সালের ৩ রা নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে আরো আঠারো জন বিধায়ক যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এর ফলে দৃশ্যত যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ন'মাসে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

গত ভোটের ভুলের মাশুল

দিলেম ন'মাস ধরে

ফ্রন্ট বাবুদের ভোট দিয়ে

টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

বলেছিল কতই কথা

কিছুই করতে পারেনি তা-

যা করেছে ঝগড়াঝাটি

তারা পরস্পরে

আর তুমি আমি রঙ্গ তাদের

দেখেছি ক'মাস ধরে।৩১

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দুই জনপ্রিয় নেতা প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষ পরাজিত হলে কমিউনিস্টরা ব্যক্তি আক্রমণ করে দেওয়াল লিখল-

আরামবাগের হারামখানায়

কাঁদছে বসে প্রফুল্ল

অজয় নদীর বাঁকে-

হারিয়ে গেল 'কানা অতুল্য'। ৩২

কমিউনিস্টরা ব্যক্তি আক্রমণের দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি সে সময়, অতুল্যবাবু পরাজিত হলে কলকাতার রাস্তায় 'কানা বেগুন' টাঙানো হয়েছিল। ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন ছিল-

কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর

কত মা হল সন্তান হারা।

শান্তির লাগি ভোট দিয়েছিনু-

কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। ৩৩

ক্ষণকালের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কংগ্রেসিরা আরও শ্লেষাত্মক বাণে ও গানে বিদ্ধ করলেন তারা। উত্তম-সুচিত্রার ‘শাপমোচন’ (১৯৫৫) ছবির গানের আদলে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

শোন বন্ধু শোন

ফ্রন্টের ঐ ন’মাসের ইতিকথা

চোদ্দজনের গোঁজামিলের

সে কি বীভৎসতা

ওদের নীতি নেই

ওদের স্থিতি নেই

ভুল বোঝাতেই

ওদের দক্ষতা।৩৪

যুক্তফ্রন্ট এর উত্তরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘খুকু’ ও ‘খোকা’ কবিতার আদলে লিখল-

কিল মারেনি ঢিল মেরেছে

তাতেই তোমরা রুষ্ট হলে?

তোমরা যখন হুকুম দিয়ে

চালাও গুলি দুষ্ট বলে

-তার বেলা?

তোমরা কেবল শৃঙ্খলা চাও

আইন কর, চাও বিচার

বলছ না তো ব্যর্থ শাসন,

অক্ষমতার দাও বিচার,

-তার বেলা? ৩৫

সে সময় বামপন্থীরাও পিছিয়ে ছিল না, তারাও প্যারোডিতে দেওয়াল ভরেছিল-

এক যে আছে মজার দেশ,

সব রকমের ভালো

চালের বদলে খুদ দেয়,

খুদের বদলে মাইলো।৩৬

নবারুণ ভট্টাচার্যের 'কাঙাল মালসাট'-এ আছে কংগ্রেস নেত্রী আভা মাইতি মেদিনীপুরের বুভুক্ষুদের মধ্যে মানবতার খাতিরে মাইলো বিতরণ করেছিল। তখন কংগ্রেস বিরোধী বামেরা গান বেঁধেছিল- 'একটি বালিকা চাইলো'র সুরে-

আভা দিদির মাইলো

সবাই মিলে খাইলো

উদরাময় হইল।৩৭

এছাড়া ব্যক্তি আক্রমণের একটি ছড়া সে সময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে

সেন প্রফুল্ল, ঘোষ প্রফুল্ল আর অতুল্য নাচে।৩৮

কিন্তু যথার্থ প্যারোডি যোগে দেওয়াল লিখন বা পোস্টারে, কম যান না বামপন্থীরা। দিল্লির শাসক কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করে, আমাদের চিরকালীন যেকোন গল্পের শেষে 'নটে গাছটি মুড়লো'র নকলে লেখা হল- আমার কথাটি ফুরলো

কংগ্রেস এবার ডুবিল

ক্যান রে কংগ্রেস ডুবিলি?

ফ্রন্ট কেন হল?

ক্যান রে ফ্রন্ট হলি?

মানুষ কেন চায়।

ক্যান রে মানুষ চাস?

কংগ্রেস কেন মারে।

ক্যান রে কংগ্রেস মারিস?

খেতে কেন চায়।

ক্যান রে মানুষ খেতে চাস?

খিদে কেন পায়।

খিদে কেন পাবে

খিদে পাবে ভালো হবে –

কংগ্রেসের পিঠে সবাই ডুগডুগি বাজাবে।[৩৯]

কিংবা- ইন্দিরা মাসি বাজায় বাঁশি

প্রফুল্ল বাজায় ঢোল

আয় অতুল্য ভাত খাবি আয়

দিয়ে কানা বেগুনের ঝোল।

এর উত্তরে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

অনিলা মামী বাজায় বাঁশি

জ্যোতি বাজায় ঢোল

আয় প্রমোদ ভাত খাবি আয়

দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল।[৪০]

যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয় মাসের শাসন এবং পরবর্তী পি ডি এফ মন্ত্রীসভার তিন মাসের শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এবং রাষ্ট্রপতি শাসন চলে ঠিক এক বছর। এই এক বছর ছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের প্রবল সক্রিয়তা আর কংগ্রেসের চরম নিষ্ক্রিয়তার পর্ব। রাজ্যপাল ধর্মবীর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে অসাংবিধানিক ও অন্যায় কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু এক অর্থে তিনি যুক্তফ্রন্টের বড় এক উপকার করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭-এর নির্বাচনে রাজ্যের বাম দলগুলি একজোট হতে পারেনি এবং নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে বাধ্য করলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য তখনও আসেনি। কিন্তু তারা নিজেরা যা পারেনি তা-ই সম্ভব হয় রাজ্যপালের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপে। স্বভাবতই রাষ্ট্রপতি শাসনকালে যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে জনসমর্থন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। এই নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিতে থাকেন চারু মজুমদার ও তাঁর অনুগামীরা (নকশাল)। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কেউ কখনও নির্বাচন বয়কটের ডাক দেননি। কাজেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে এও ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবশ্য নকশালদের ডাকা নির্বাচন বয়কটে সাড়া দেননি। ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নির্বাচন পর্ব শেষ হলে দেখা যায় যে ভোটদানের হার খুব ভাল। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬২.০৮ শতাংশ। এবার ভোটদানের হার ৭০ শতাংশ। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৮ টি আসন পেয়েছে যুক্তফ্রন্ট আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৫৫ টি আসন। অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশের বেশি আসন দখল করে যুক্তফ্রন্ট আর ১৯৬৭-এর নির্বাচনে যে কংগ্রেস ১২৭ টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল সেই কংগ্রেস পায় মাত্র ১৯.৬৪ শতাংশ আসন। নিঃসন্দেহে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এ ছিল এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল সি পি আই(এম) এবং তুলনামূলক বিচারে তার অগ্রগতিও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল ৪৩ টি আসন, ১৯৬৯-এর নির্বাচনে

তিনজন সমর্থিত নির্দল সহ তার আসন সংখ্যা হয় ৮৩, অর্থাৎ তার আসন সংখ্যা ৯৩ শতাংশ বেড়ে যায় এবং যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকের মধ্যে সে-ই হয় বৃহত্তম দল। কংগ্রেস এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, যে দল ভাঙাভাঙির খেলাও আর জমবে না, ফলে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার-এর 'কলকাতার কড়চা'য় (১লা মার্চ ১৯৬৯) জনৈক পাঠকের জবানিতে লেখা হয়ঃ

যাদের এ ঘর ভাড়া দিলাম পাঁচ বছরের তরে,

গদীর লোভে তারা যদি গদা যুদ্ধ করে,

ফের তাড়িয়ে দিতে পারি, দিয়ে কালির ছাপ,

জনগণের রায় মেনে আজ রাজ্য চালাও বাপ![৪১]

শিপ্রা সরকার বলেছেন, এই স্বভাবকবি যুক্তফ্রন্টের খুব বড় সমর্থক মনে হয় না, কিন্তু জনচেতনার একটা দিক ফুটেছে এই ঠাট্টার মধ্যে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শপথ নিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। এবারও অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁর হাতে থাকবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শুধু রাজনৈতিক বিভাগ আর জ্যোতি বসু হবেন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর হাতে থাকবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ দপ্তর। তবে ক্ষমতায় এসেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বাগ্রে রাজ্যপাল ধর্মবীরের অপসারণের দাবি জানায় কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে রাজ্য সরকারের এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। অতঃপর ৬ মার্চ বিধানসভায় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে বাকী অংশটুকু পড়েন এবং মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ চলাকালীন উঠে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। এর তিন সপ্তাহের মধ্যেই অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মবীরকে সরিয়ে নেয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল হন শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধের একটা সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

একদিকে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে এই অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে নকশালপন্থীদের তথাকথিত শ্রেণীশত্রু নিধন যজ্ঞ- এই দুইয়ে মিলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার

গঠনের আট মাসের মধ্যেই রাজ্য জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা দেখা দেয়। এই দুর্ভাগ্যজনক গৃহযুদ্ধ যখন ক্রমবর্ধমান তখন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পদাধিকারী হয়েও ক্ষমতাহীন এক নিতান্ত অসহায় দর্শক। যে সরকার নিজেই অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ, তার পক্ষে শাসনকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বস্তুতপক্ষে ডিসেম্বর মাসে অজয় মুখোপাধ্যায় যখন কার্জন পার্কে অনশনে বসেন তখনই রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার টিঁকবে না। এরপর ১৯৭০ সালে ১৬ মার্চ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর বেতার ভাষণে রাজ্যবাসীকে তাঁর পদত্যাগ করার খবর জানান তখন কেউই বিস্মিত হননি। এমতাবস্থায় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত তাঁর রিপোর্টে জানিয়ে দেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনও ভাবেই সরকার গঠন সম্ভব নয় এবং ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। এই রাষ্ট্রপতি শাসন চলে ঠিক এক বছর। এই কালপর্বে শহরাঞ্চলে নকশালপন্থীদের তাণ্ডবে এক অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে এত বড় বিপন্নতা আর কখনও আসেনি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে। আর ঠিক একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জীবনে তখন অন্য চিত্র। সেখানে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বাঙালি মনে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ। এই নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস ও প্রধান বাম দলগুলি সি পি আই(এম)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ এর মধ্যভাগে দেখা দেয় ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগে কংগ্রেসের ভাঙন ও অব্যবহিত পরেই ইন্দিরা গান্ধি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্য ভাতা বিলোপ বিলের মাধ্যমে নিজের প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধির প্রগতিশীল নীতির অজুহাত দেখিয়ে সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছাকাছি আসতে থাকে। এতে সি পি আই ও সি পি আই(এম)-এর মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়ে। অবশেষে অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি পি আই কেরলে নাম্বুদিরিপাদ মন্ত্রীসভার পতন ঘটালে দুই কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে চরম তিক্ততা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে 'গাইবাছুর' হয়েছে। এই সময় সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন: দিল্লি থেকে এল গাই

সঙ্গে বাছুর সি পি আই।[৪২]

১৯৭১ সালের **১০** মার্চের নির্বাচন ছিল পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে নিরুত্তাপ নির্বাচন। জনসাধারণের মধ্যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। সারা পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত শহরাঞ্চল, তখন নকশালদের খতম অভিযানে সন্ত্রস্ত। স্বভাবতই নির্বাচন নিয়ে উৎসাহিত হওয়ার অথবা আলাপ-আলোচনা করার অবকাশ তখন ছিল না। উপরন্তু নকশালদের ভোট বয়কটের হুমকিতে এবং কয়েকজন নির্বাচন প্রার্থীকে খুন হতে দেখে ভোটাররাও তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই নির্বাচনের ধার্য তারিখ **১০** মার্চের বেশ কয়েক দিন আগে থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে *'কী ভাবছেন? ভোট দেবেন কি দেবেন না? ভোট আপনি দেবেনই'*- এই কয়েকটি কথা মানুষের মনে ভরসা জোগাবার জন্য অবিরাম সম্প্রচারিত হতে থাকে। অতঃপর নির্বাচনের দিন সকাল থেকে সারাদিন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভোটারদের ঘন ঘন বলা হতে থাকে *'কই যান, ভোটটা দিয়ে আসুন'* ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য এই আবেদন ছিল নিঃসন্দেহে অভিনব ঘটনা। এ প্রসঙ্গে **১১. ০৩. ১৯৭১**-এর আনন্দবাজারের সংবাদ শিরোনাম ছিল এরকম- *'সব আতঙ্ক সব আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়ে নির্ভয়ে নির্বাচন'* ।[৪৩]

১৪ মার্চ নির্বাচনের ফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মোট ২৭৭ টি আসনের মধ্যে সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত বামফ্রন্ট পায় **১২৩** টি আসন। যার মধ্যে **১১১** টি আসনই দখল করে সি পি আই(এম)। অন্যদিকে নব কংগ্রেস পায় **১০৫** টি আসন। তবে অন্যান্য বড় দলগুলির প্রত্যেকেরই আসন সংখ্যা কমে যায় এবং বাংলা কংগ্রেস পায় মাত্র ৫ টি আসন। ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে সি পি আই(এম)-এর সংযুক্ত বামফ্রন্টের দূরত্ব ছিল মাত্র **১৬** টি আসনের। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর এস পি, এস ইউ সি আই ও ঝাড়খণ্ড পার্টি ছাড়া সি পি আই(এম)-এর ফ্রন্টের বাইরে বাকী সব দলের সমর্থন নিয়ে নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস মিলিতভাবে সরকার গঠন করে। এই সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়। আর উপমুখ্যমন্ত্রী হন নব কংগ্রেসের বিজয় নাহার। অজয় মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় বারের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা শপথ নেয় **১৯৭১** সালের ২রা এপ্রিল। এই সরকারকে বলা হত অজয়-বিজয় সরকার। এই সরকারের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র সাতাশি দিনের। অতঃপর **১৯৭১** সালের ২৮শে জুন পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

৪.৪. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ও জরুরি অবস্থা (১৯৭২-১৯৭৭):

১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীরা পিছু হটতে থাকে। অতঃপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুক্ত হয় পাক-অধীনতা থেকে। পরিণামে ইন্দিরা গান্ধির ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের দাপটও খুব বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয় **১৯৭২** সালের **১২** মার্চ। ফলে সব পক্ষেরই রাজনৈতিক তৎপরতা যথারীতি দ্রুত বেড়ে যায়। সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করায় তার সঙ্গে এখন ইন্দিরা কংগ্রেসের কোনও বৈরিতা নেই। স্বভাবত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই দল জোটবদ্ধ। **১৯৭১**-এর নির্বাচন থেকে বাম ঐক্য সম্পর্কে সমুচিত শিক্ষা গ্রহণ করেছে সি পি আই(এম)। তাই নির্বাচনে সে অবতীর্ণ হয় সি পি আই ছাড়া অন্য সব বাম দলের সঙ্গে জোট বেঁধে এমন কি এস ইউ সি আই-কেও সে সঙ্গে নিয়েছে।

এই নির্বাচনে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছিল। নির্বাচনী চাপান-উতোর দলকে অতিক্রম করে ব্যক্তি আক্রমণে পর্যবসিত হয়। যথা-

প্রথম পক্ষ(কংগ্রেস):

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

কদম তলায় কে?

প্রমোদ নাচে কেষ্ট নাচে

জ্যোতি বসুর বে।

দ্বিতীয় পক্ষ(সি পি এম):

ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস,

ঠিক বলেছিস ভাই।

১১ মার্চ ইন্দিরাকে,

সাজিয়ে আনা চাই।[৪৪]

১১ মার্চ ছিল ১৯৭২ সালের নির্বাচনের দিন। এই নির্বাচনে ব্যবহৃত অন্যান্য দেওয়াল ছড়ার অনেকগুলিই খুব একটা বুদ্ধিদীপ্ত ছিল না। একটা কথা প্রচলিত আছে যে প্রেমে আর রণে নাকি নীতি নেই। তাই স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী রণে নীতি না থাকাটাই স্বাভাবিক। সমস্ত নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ছড়াগুলিকে এই অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করতে হচ্ছে কেবলমাত্র তথ্যের কারণে।

যেখানে কেষ্ট

সেখানেই নষ্ট

যেখানে হরে

সেখানেই মরে

যেখানে প্রমোদ

সেখানেই গলদ।[৪৫]

উক্ত ছড়াটি ১৯৭২ সালের নির্বাচনের আগে সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বকে আক্রমণ করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন। এখানে কেষ্ট বলতে সি পি আই(এম) নেতা কেষ্ট মুখার্জী, ‘হরে’ বলতে হরেকৃষ্ণ কোঙার(যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী), ‘প্রমোদ’ হলেন সি পি আই(এম) সম্পাদক প্রমোদ দাসগুপ্ত। এই ছড়াটির অনুকরণে প্রায় ৪০ বছর পর ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

যেখানে জ্যোতি

সেখানেই ক্ষতি

যেখানে বুদ্ধ

সেখানেই যুদ্ধ

যেখানে বিমান

সেখানেই কামান

যেখানে মমতা

সেখানেই জনতা।[৪৬]

কিংবা- শ্রমিক মেরে শ্রমিক প্রেম

বাঃ বাহবা সি পি এম

কৃষক মেরে কৃষক প্রেম

বাঃ বাহবা সি পি এম

যুবক মেরে যুবক প্রেম

বাঃ বাহবা সি পি এম।[৪৭]

১৯৭২ সালের নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বকে ইস্যু করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখনঃ

বামফ্রন্টের অষ্ট স্বামী

সবাই বলে প্রধান আমি।[৪৮]

আবার- শোন হে বন্ধু শোন শ্রমিক

শোন সর্বহারা

এই দেশটাকে নষ্ট করেছে

কাস্তে হাতুড়ি তারা।[৪৯]

তৎকালীন সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রতি কংগ্রেস পার্টির আবেদন ধরা পড়েছে ছড়ায়-

১. গড়তে দেশ রুখতে চীন

কংগ্রেসকে ভোট দিন।

২. সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ

কলকারখানা বন্ধ করবে সি পি আই(এম) খুলবে কংগ্রেস।[৫০]

৩. সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ

রাতে নকশাল দিনে কংগ্রেস।[৫১]

সে সময় মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত 'নিশিপদ্ম' সিনেমাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনেমাটি মুক্তি পায় ২৩ শে অক্টোবর ১৯৭০ সালে। তাতে উত্তমকুমারের ঠোঁটে মান্না দে'র গলায় একটি গান ছিল- 'না- না- না/ আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না/(হেঁচকি) তুমিও যাবে না, আমিও যাবনা/ বুঝলে নটবর'। এই গানের আদলে ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের পরপর দুটি নির্বাচনে দেওয়াল লেখা হয়েছিল

১. না- না- না

সি পি আই(এম)কে তুমিও ভোট দেবে না,

আমিও ভোট দেব না

বুঝলে নটবর।[৫২]

২. বুঝলে...(কোন নেতার নাম)

আজ রাতে আর বোম মারতে যাব না।[৫৩]

৩.সি পি আই(এম) বিড়লার সাথে প্রেম করিতে পটু।

ঘর করিল ছেলে হইল নাম রাখিল CITU।[৫৪]

বিরুদ্ধে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

CRP যাদের রক্ষা কর্তা

বিড়লা যাদের পিতা।

লাল বাংলার লাল আগুনে,

জ্বালাও তাদের চিতা।[৫৫]

কতকগুলি ছড়া এমনভাবে পাওয়া যায় যেখানে সি পি আই(এম)-এর পরিবর্তে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের পরিবর্তে সি পি আই(এম) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে ছড়ার রসগুণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। যেমন- 'অমুক' কাঁদিয়া বলে

শোন 'অমুক' ভাইরে

এবার নির্বাচনে পেটো কিছু চাইরে।৫৬

এখানে 'অমুক'-এর স্থানে কোন নেতার নাম, বসালেই ছড়াটি সম্পূর্ণ হবে। আর পেটো অর্থে বোমার কথা বোঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে-

সি পি আই(এম) চায় বোমার বাংলা

আমরা চাই সোনার বাংলা।৫৭

কিংবা- সি পি আই(এম) পার্টির তিন গুণ

মারদাঙ্গা, রেপ, মানুষ খুন।৫৮

এই ধরনের ছড়াগুলিতে সি পি আই(এম)-এর পরিবর্তে কংগ্রেস কথাটিও ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে ছড়াগুলির রসগুণ অক্ষুণ্ণ আছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুক্ত হয় পাক-অধীনতা থেকে। পরিণামে ইন্দিরা গান্ধির ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বাহিনী আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা দেওয়াল ভরাতে থাকেন- 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য' বলে ইন্দিরা গান্ধির প্রশস্তিতে। সে সময় বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধা তথা আপামর শান্তিকামী বাঙালির শত্রু 'ইয়াহিয়া খাঁ' ও 'রাজাকার বাহিনী'র সঙ্গে তুলনা করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখনঃ

দুই বাংলার দুই পশু

ইয়াহিয়া 'অমুক বসু'

দুই বাংলার রাজাকার

সি পি আই(এম) হুঁশিয়ার।[৫৯]

বিরুদ্ধ দল সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

ইন্দিরার গণতন্ত্র,

মানুষ মারার ষড়যন্ত্র।

দুই বাংলার দুই অপদার্থ,

ইয়াহিয়া ও সিদ্ধার্থ।[৬০]

আবার কংগ্রেস লিখল- মাও পাড়ে ডিম

নিকসন দেয় তা

তার থেকে বেরিয়ে এল

সি পি আই(এম)-এর ছা।[৬১]

কিংবা- প্রমোদ কাঁদে জ্যোতি কাঁদে

কাঁদে সি পি আই(এম) পক্ষ

জেল হাজতে লক্ষ্মী কাঁদে

চাপড়িয়ে বক্ষ।[৬২]

উক্ত ছড়াগুলির প্রেক্ষিতে কিছু আশাব্যাঞ্জক ছড়াও লক্ষ্য করা যায়। যথা-

১. দেশের সবাই এক জোট

কাস্তে হাতুড়ি তারার ভোট।[৬৩]

২. জেগেছে কৃষক জেগেছে শ্রমিক

জেগেছে সর্বহারা।

এবার নির্বাচনে ভোট পাবে সব

কাস্তে হাতুড়ি তারা।

৩. ভোট দিন বাঁচতে

তারা হাতুড়ি কাস্তে।[৬৪]

১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে রিগিং হয়েছিল কি হয়নি তাই নিয়ে সে সময় বিতর্ক চলেছিল অনেকদিন ধরে। যাঁরা শাসকপক্ষের সমর্থক ছিলেন তাঁরা স্বভাবতই রিগিং হয়েছিল- একথা মানেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে সে কারণে ইন্দিরা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় আপ্লুত ভোটাররা পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির দল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল দুহাত উজাড় করে। কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে সি পি আই(এম) অত্যন্ত নিপুণভাবে তার যে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছিল তা এই জনপ্রিয়তা ও বিরূপতায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে যাবে একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। যাই হোক এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে শাসক-বিরোধী উভয় দলের মধ্যে মতভেদ ছিল।

৪.৫. বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১):

তবে সি পি আই(এম) ও তার সহযোগী বাম দলগুলি বিধানসভা বয়কট করায় বিধানসভা কার্যত বিরোধী দলশূন্য হয়েই থাকে এবং এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে **১৯৭৫** সালের **২৬** শে জুন ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করেন। সেই সময়ের দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকের অভিমত অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা জারি করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধির আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। হয়ত সেই কারণে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দাপট খুব বেড়ে যায়। একটি সংবাদপত্র তার দাসত্ব মেনে নিতে পারেনি বলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের মালিকের বাড়িতে তিনি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের হানার ব্যবস্থা করেন এবং দুই বিশিষ্ট বাঙালি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত এবং গৌরকিশোর ঘোষ তাঁদের সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর ও তাঁর সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে বাধ্য হতেন বলে তিনি তাঁদের জেলে ভরেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পাঁচ বছরে সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক ক্ষতি করেছিলেন, তবে বোধহয় তিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলেন নিজের দলের। কারণ জনসাধারণের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এজন্য পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে বড় মাসুল দিতে হয়েছিল, **১৯৭৭** সালের নির্বাচনের এই হল সংক্ষিপ্ত পরিপ্রেক্ষিত। সুতরাং ৭৭-এ বামপন্থীদের প্রধান ইস্যু ছিল জরুরি অবস্থা। **১৯৭২** সালের নির্বাচনের পর অনেক সি পি আই(এম) কর্মী পাড়া থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, অত্যাচারিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ দেওয়াল জুড়ে লেখা হল-

বাহাত্তরের জুয়াচুরির বদলা নিন

'অমুক' চিহ্নে ভোট দিন।$_{৬৫}$

এখানে 'অমুক' চিহ্ন বলতে সি পি আই(এম) জোটের বিভিন্ন শরিক দলের প্রতীক চিহ্ন। যেমন- কাস্তে হাতুড়ি তারা, সিংহ, কোদাল বেলচা ইত্যাদি প্রতীক চিহ্ন স্থান ভেদে বসানো হত। অন্য আর একটি ছড়ায় জরুরি অবস্থার কথা উঠে এসেছে-

জরুরি অবস্থার অত্যাচার

ফের যেন না আসে আবার।$_{৬৬}$

কিংবা- গোকুলে বাড়ছে বামফ্রন্ট

মারবে সে কংস

কংগ্রেস জেনে রেখো

স্বৈরাচারী ধ্বংস।[৬৭]

কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রতীকের বারবার পরিবর্তন হয়েছে দলের ভাঙনের ফলে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে **১৯২৩** সাল থেকে **২০১১** সাল অবধি ৮৮ বছরে কংগ্রেস ভেঙে **৫৫** টি নতুন দল জন্মগ্রহণ করেছে ভারতবর্ষে। যাদের বেশিরভাগ দলের নামেই ‘কংগ্রেস, শব্দটি আছে, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত আছে। **১৯৫২** সালের নির্বাচনে দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘জোড়া বলদ’। **১৯৬৭** সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল ভেঙে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় বাংলা কংগ্রেস। **১৯৬৭** সালে তাঁরা free symbol নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। **১৯৬৯**-এ বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘লাঙল’। বাংলা কংগ্রেস থেকে তৈরি হওয়া বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের পতাকা ছিল লাল ও সাদা এবং চিহ্ন ছিল ‘হাতুড়ি ও লাঙল’। **১৯৬৯**-এ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কংগ্রেস দল ভেঙে ইন্দিরার নেতৃত্বে তৈরি হওয়া কংগ্রেস দলের প্রতীক ছিল ‘গাই-বাছুর’। আর আদি কংগ্রেস অর্থাৎ কংগ্রেস(ও) দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘চরকা হাতে মহিলা’। সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস(ও) দলের নির্বাচনের সময় স্লোগান ছিল- ভোট দেবেন কাকে

চরকা হাতে মাকে।[৬৮]

১৯৭৭-এ ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস আবার তাদের নির্বাচনী প্রতীক পরিবর্তন করে কারণ বিরোধীরা ‘গাই-বাছুর’ প্রতীককে ব্যঙ্গ করে ‘ইন্দিরা-সঞ্জয়’-এর নাম দিয়ে Cartoon আঁকছিল। তাই নতুন ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতীক হয় ‘হাত’। এ প্রসঙ্গে একটি ছড়া-

১.ভিক্ষা নয় চাইছি ঋণ

হাত চিহ্নে ভোট দিন।[৬৯]

২. টান পড়েছে ভাতে

ভোট দেব তাই হাতে।[৭০]

আমরা জানি সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি করে স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রতীক আছে। প্রত্যেকটি দলের মতাদর্শের সাথে সেই দলের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্নের কিছু কিছু মিল লক্ষণীয়। নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলগুলি যে বিষয়টি মাথায় রাখে তা হল দেশের জনগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যেমন- সাইকেল, নৌকা, চরকা, জোড়া বলদ, কাস্তে হাতুড়ি, কোদাল বেলচা, লাঙল, লাঙল কাঁধে কৃষক, ঘর, গাই বাছুর, বট গাছ ইত্যাদি। আর এই প্রতীক চিহ্নে যেহেতু ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, তাই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতীক জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ভাবে দলগুলির পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়। যেমন- **১৯৬২** সালের নির্বাচনে কংগ্রেস তার দলীয় প্রতীক 'জোড়া বলদ' চিহ্নে দেশের জনগণকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে এভাবে-

ভোট দেবেন কোথায়

জোড়া বলদ যেথায়।

ঐ নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক 'কাস্তে ধানের শিষ' চিহ্নে জনগণকে একই ভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে-

ভোট দেবেন কীসে

কাস্তে ধানের শিষে।

আবার অন্য একটি ছড়ায় শাসক দল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নের ব্যঙ্গ করে বিরোধী দল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়াল লিখন-

জোড়া বলদের দুধ নাই

কংগ্রেসের ভোট নাই।

জোড়া বলদের আটটি ঠ্যাং

কংগ্রেসকে মারো ল্যাং।

জোড়া বলদ কোথায় গেল

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।[৭১]

প্রতীক চিহ্নের আড়ালে অবস্থিত শাসক দল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে রচিত হয়েছে উক্ত ছড়াটি।

পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পর সি পি আই(এম)-এর একটি দেওয়াল লিখন বারেবারে চোখে পড়ে তা হল-

ভোট দেবেন বাঁচতে

তারা হাতুড়ি কাস্তে।

বা- ভোট দেবেন কোনখানে

কাস্তে হাতুড়ির মাঝখানে।

হুবহু একইভাবে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

ভোট দেবেন কোনখানে

হাত চিহ্নের মাঝখানে।

প্রসঙ্গত এই রকম একগুচ্ছ প্রতীক চিহ্নের প্রচারমূলক ছড়া উদ্ধৃত করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'আমলাগাছি' নামক সরস রচনায়-

১. ভোট পাবে কারা

কাস্তে হাতুড়ি তারা। (সি পি আই(এম))

২. ভোট যাবে কার কাছে

ঝুরি সহ বট গাছে। (এস এস পি)

৩. গরিবের আনতে সুদিন

কুঁড়ে ঘরেতে ছাপ দিন। (পি এস পি)

৪. ভোট দেবেন কোনখানে

সিংহ চিহ্নের মাঝখানে। (ফরওয়ার্ড ব্লক)

৫. আনতে দেশে নতুন দিন

কোদাল বেলচায় ছাপ দিন। (আর এস পি)

৬. কেউ খাবে আর কেউ খাবে না

তা হবে না তা হবে না। (আর এস পি)৭২

এখানে উল্লেখ্য **১৯৫২** সালে এস এস পি (সোস্যালিস্ট পার্টি)-এর নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'ঝুরিসহ বটগাছ'। আর পি এস পি (প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি)-এর নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'ঘর'। প্রতীক চিহ্ন নিয়ে ছড়া রচনার ধারা আজও অব্যাহত।

১৯৭৭-এর নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রত্যয়ী দেওয়াল লিখন-

হবে বাম হবে বাম হবে বাম

হবে হবে ।৭৩

এই ধরনের দেওয়াল লিখনের উত্তরে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

হবে কষ্ট হবে কষ্ট হবে কষ্ট

হবে হবে।৭৪

জবাবে বামফ্রন্টের ব্যঙ্গাত্মক দেওয়াল লিখন-

১. শুনলে হাসি পায়

কাটা হাত ভোট চায়।

২. ঝোঁকের মাথায় নিলি হাত

এবার ভোটে হবি কাত।[৭৫]

ইন্দিরা গান্ধি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠেকাতে না পেরে **১৯৬৯** সালের **১২** নভেম্বর নতুন দল গঠন করেন। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়, কংগ্রেস(ও) ও কংগ্রেস(ই)। এরপর সি পি আই-এর সমর্থন নিয়ে ইন্দিরা সরকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক দেন। **১৯৭১** সালের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ইন্দিরাই। শাসকের আসনে কংগ্রেস(ই), বিরোধী আসনে কংগ্রেস(ও)। এর পর **১৯৭৫** সালে **১২** জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইন্দিরা গান্ধির লোকসভা নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে। ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং চলল **১৯৭৭** সালের মার্চ মাস অবধি। আর এই **১৯৭৭** সাল থেকেই শুরু হল প্রকৃত ভোটযুদ্ধ। কংগ্রেস ত্যাগ করে আসা ইন্দিরা অন্যদিকে বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা সি পি আই-এর আঁতাত হল। ছড়ায় ছড়ায় ছড়িয়ে পড়ল রঙ্গ-ব্যঙ্গ, দ্বিখণ্ডিত কংগ্রেসকে তখন বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে আদি কংগ্রেস ও মাদি কংগ্রেস। ভোটের দেওয়াল লিখনে 'অশুভ আঁতাত' কে ব্যঙ্গ করে বিরোধীরা লিখলেন-

দিল্লি থেকে এল গাই

সঙ্গে বাছুর সি পি আই।

বা, ইন্দিরার কোলে

সি পি আই দোলে।[৭৬]

বলাই বাহুল্য উভয় ক্ষেত্রে ইন্দিরাকে মাতৃস্থানে বসিয়ে সি পি আই-কে গোবৎস বা মনুষ্যশাবক নির্ণয়ে কোন স্নেহ বাৎসল্য রস ছিল না, ছিল বিদ্রুপ ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখন কংগ্রেস(ই) দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল গাই বাছুর। কংগ্রেসীরা তখন চীন ভারত যুদ্ধে বামেদের অবস্থানকে কটাক্ষ করে লিখেছেনঃ

যাদের মুরুব্বি রাশিয়া চীন

এই মাটিতে তাদের কবর দিন।[৭৭]

কিংবা- চীনের চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি

পাকিস্তানের তারা

চীনের মন্ত্রে দীক্ষা যাদের

তারাই সর্বহারা।[৭৮]

অন্যদিকে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

দিল্লি থেকে ইন্দিরা এলেন

ভোট ভিক্ষা নিতে

সঙ্গে আছেন অসুর সিদ্ধার্থ

মার্কিনী গম হাতে।[৭৯]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হলে সি পি আই(এম)-এর রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই অভূতপূর্ব স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে সময় তেমন কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় না। অতঃপর লোকসভা ভেঙে দিয়ে সংসদীয় নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলে এবং জরুরি অবস্থা শিথিল করা হলে সি পি আই(এম) বেরিয়ে আসে তার স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে বিপদমুক্ত অনুকূল পরিবেশে আবার শুরু হয় তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ। দীর্ঘ উনিশ মাস পরে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে প্রথম বামপন্থী মিছিল কলকাতা শহরে বের হয় ১৯৭৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং এককভাবে সি পি আই (এম) ময়দানে সমাবেশ ডাকে ১১ ই ফেব্রুয়ারি। বস্তুত, কংগ্রেসের কবর ইতিমধ্যেই খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ ও সিদ্ধার্থ-সরকারের অপদার্থতায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরের মানুষ তখন চরম ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল পরবর্তী নির্বাচনে। এই রকম পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ১৬ ই মার্চ।

১৯৭৭-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে পার্টি গঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে প্রফুল্ল সেন খুবই প্রিয় সি পি আই(এম)-এর কাছে। কারণ পাঁচ বছরের রাজনৈতিক শীত নিদ্রার পর সি পি আই(এম) তখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এবং জনসমর্থনের গতি সম্পর্কেও তার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আসন সমাঝোতার ব্যাপারে

রফা করে সি পি আই(এম) ও তার নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট লোকসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় পশ্চিমবঙ্গে। নির্বাচনে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় মাত্র ৩ টি আসন। অন্যদিকে জনতা পার্টি পায় ১২ টি আসন আর সি পি আই(এম) ১৮ টি আসন পেয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনের দখলদার হয়। কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হন ইন্দিরা গান্ধি এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অ-কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে জনতা পার্টির নেতা মোরারজি দেশাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই মন্ত্রীসভার সদস্য হন জনতা পার্টির নেতা ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাস পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৭৭ সালের ১২ ও ১৪ ই জুন। এই নির্বাচনে জলপাইগুড়িতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নির্মল বসু আর জনতা পার্টির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দেবেন সরকার। সেবার জনতা পার্টি জলপাইগুড়ি শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে লিখেছিলেন-

জনতা সরকার হলেন দেবেন সরকার

আর বাকী সব হলেন নেবেন সরকার।[৮০]

এই নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন –

১. গনি

মাথার মণি।

জয়নাল আবেদিন

সবাই তাকে ভোট দিন।

এখানে ‘গনি’ হলেন কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল গনি খান চৌধুরি।

২. সঙ্গে আছি বারোমাস

বলছেন প্রিয়দাস।[৮১]

এখানে ‘প্রিয়দাস’ হলেন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। বর্ধমান জেলায় সি পি আই(এম)-এর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু **১৯৭২** এর নির্বাচনে সেখানে সি পি আই(এম) খুব খারাপ ফল করে। তাই **১৯৭৭** সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে লিখলঃ

তাই তাই তাই

বর্ধমানে যাই

বর্ধমানে গিয়ে দেখি

সি পি আই(এম) নাই।[৮২]

আবার- যাদের নাই দেশপ্রেম

তাদের নাম সি পি আই(এম)।

বিপক্ষে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

যাদের নাই পাপের শেষ

তাদের নাম কংগ্রেস।[৮৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সি পি আই(এম) পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি সংখ্যক আসন পেয়েও কিন্তু সি পি আই(এম) তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয়, এ জন্য কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে এই নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে উদ্যোগ নেয় সি পি আই(এম)। অন্যদিকে জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্ল সেন বামফ্রন্টকে মাত্র ৯০ টি আসন ছেড়ে দিতে চান। সমঝোতায় আন্তরিকভাবে আগ্রহী সি পি আই(এম) শেষ পর্যন্ত জনতা পার্টিকে ৫২ শতাংশ আসন ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু অনমনীয় থাকেন প্রফুল্ল সেন ফলে আলোচনা ভেস্তে যায় এবং বামফ্রন্ট কোনরকম সমঝোতা ছাড়াই ২৯৪ টি আসনের প্রত্যেকটির জন্য এককভাবে প্রার্থী দেয়।

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে বামফ্রন্ট তিন চতুর্থাংশের বেশি আসন পেয়েছে আর সি পি আই(এম) একাই অর্জন করেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মোট ২৯৪ টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে পায় **২৩১** টি আসন, সি পি আই(এম) এককভাবে পায়

১৭৮ টি আসন, কংগ্রেস পায় মাত্র ২০ টি আসন আর সি পি আই-এর ভাগ্যে জোটে মাত্র ২ টি আসন। মজার ব্যাপার এই যে, যে জনতা পার্টি নির্বাচনের আগে ৫২ শতাংশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতায় বিমুখ হয়েছিল সেই জনতা পার্টি এই নির্বাচনে পায় মাত্র ২৯ টি আসন। বলা বাহুল্য এই নির্বাচনী ফলাফল সব পক্ষের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত।

ইন্দিরা গান্ধি নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন জরুরি অবস্থা জারি করলেন। দেশের বড় বড় বিরোধী নেতাদের কারাগারে বন্দী করা হল। এর পরের দু-বছরের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস। সে সময় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। যে রাজ্যসরকারগুলি বিরোধীদলের হাতে ছিল তাদের পদচ্যুত করে রাজ্যপালের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭৭-এ ইন্দিরা গান্ধি মনে করলেন যে এবারে তিনি সাধারণ নির্বাচনে সম্মুখীন হতে পারবেন। তাঁর আশা ছিল বিরাট অঙ্কের ব্যবধানে ভোটে জিতে আসবেন। ১৮ ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন। মার্চে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, সারা দেশে অসন্তোষ কতটা গভীর এবং কতটা ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নির্বাচনে রায়বেরিলিতে হারলেন এবং তাঁর দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। তার পরের তিন বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটলো না। জনতা দল এবং অন্য কয়েকটি দল একত্র হয়ে সরকার গঠনে এগিয়ে এলেন। কিন্তু বিরোধ বাধল কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তাই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের সমর্থনে মোরারজী দেশাই সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিভেদ কমল না, এবং মোরারজী দেশাইয়ের একনায়কত্ব প্রবণতা মন্ত্রীসভার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত করল। তাকে সরে যেতে হল এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন চৌধুরীচরণ সিংহ। এই সময় ইন্দিরা গান্ধি একটি উপনির্বাচনে চিকমাগালুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন এবং কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে চরণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী হন। চরণ সিংহের ভাবমূর্তি কখনও সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না, তাই তাঁর সরকারকেও সরে যেতে হল মাত্র ২৪ দিনের মাথায়। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৯ সালের ২১ আগস্ট লোকসভা ভেঙে দিলেন এবং ১৯৮০-র প্রথম দিকে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ছড়াগুলি হল- রায়বেরিলি ভুল করেছে

চিকমাগালুর করে নি

সি পি আই(এম) জেনে রাখো

ইন্দিরা গান্ধি মরেনি।[৮৪]

আবার- মোরারজী যান চরণ যান

ইন্দিরাজী করেন আহ্বান।[৮৫]

মাত্র আড়াই-তিন বছরের ব্যবধানে ইন্দিরা গান্ধির পুনরুত্থানের নেপথ্যে ছিলেন তার ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধি। ইন্দিরার এই জয়কে কটাক্ষ করে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

বড় লোকের বেটিলো,

সাদা কালো চুল।

বাপের কোটে গোঁজা ছিল

লাল গোলাপ ফুল।

সেই বেটির বেটালো,

পাতলা পাতলা চুল।

দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিল

হলুদ সরষে ফুল।[৮৬]

আর ইন্দিরা গান্ধি ঘোষিত জরুরি অবস্থাকালীন ভয়াবহ স্মৃতি এবং তার সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের যোগসাজশ কল্পনায় বামেরা লিখল-

'ও' কাল সাপের হাত ছিল

বুট বেওনেট লাথ ছিল

দিনের বেলাতেও ভয় ছিল

কী হয়, কী হয়, রাত ছিল

পথে ঘাটে লাশ ছিল

আর এতে ‘তোমার’ও হাত ছিল।[৮৭]

বলাইবাহুল্য ‘ও’ এবং ‘তোমার’ সর্বনামে বামপ্রদত্ত সর্বনাশের দুই চরিত্র যথাক্রমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ইন্দিরা গান্ধি ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং **৩৪** বছরের পাকাপোক্ত বাম রাজ্যপাট শুরু হয়। কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, মানছি না মানব না, করতে হবে করতে হবে, ক্রমশ ক্লিশ হয়ে গেল। দেওয়াল ছড়াতেও নতুনত্ব এল না। **১৯৮২**-এর নির্বাচনে পুরানো ছড়াগুলিই দেখা গেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। শুধু তফাৎ রবীন্দ্রনাথ-সুকান্ত-নজরুলের ঐ কবিতাগুলির উদ্ধৃতি বামফ্রন্টের দলগুলি ব্যবহার করতে পারল না বরং ঐ কবিতাগুলি বিরোধী দল কংগ্রেসের হাতে চলে যেতে থাকল। ইন্দিরাজির ‘গরিবী হঠাও’ স্লোগানকে আক্রমণ করে কিছু ছড়া রচিত হয়েছিল বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে-

বছর বছর বছর শেষ

গরিব আরও গরিব দেশ।

কিংবা- গরিবি হঠাও নয়, গরিব-ই তো হঠছে

গরিবের ঘাড়ে দেখ শুধু ট্যাক্স বসছে।[৮৮]

১৯৭৭ সালে রাজ্য বামফ্রন্টের বিপুল জয়ে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন, এরপর **১৯৮০**-তে কেন্দ্রে কংগ্রেস ফিরে আসাতে রাজ্য কংগ্রেস উদ্দীপ্ত; তারা রাজ্যবাসীর মন ফেরাতে লিখল অঙ্গীকার-

এই হতাশা ভাঙতে চাই

নতুন বাংলা গড়তে চাই।

আর কংগ্রেসের সংকল্পকে ঘোর সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে যেন রাজ্যবাসীর চোখ খুলে দিতে চাইলেন বামপন্থীরা- সে হতাশা আনতে চাই

বাহাত্তর সাল ফেরাতে চাই

লুটে পুটে খেতে চাই

আমরা হলাম কংগ্রেস(আই)।৮৯

বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জবাব ও জিজ্ঞাসা-

চোর ডাকাত জেলে পুরে

ইন্দিরা যদি স্বৈরাচারী

মরিচঝাঁপিতে গুলি করে

জ্যোতিবাবু কি ব্রহ্মচারী?৯০

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে দণ্ডকারণ্য থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং তাদের একটা বড় অংশ আশ্রয় নেয় দক্ষিণবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে। সে সময় মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তুমুক্ত করতে বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ বল প্রয়োগ করে এবং পুলিশি নিগ্রহে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য অনেকেই সে সময় বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন উক্ত ছড়াটি।

পূর্বে বলেছি যে ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীকের পরিবর্তন হয়েছে। 'গাই-বাছুরের' পরিবর্তে এসে গেছে 'হাত'। ১৯৮২-র নির্বাচনের পূর্বে দেওয়ালে কংগ্রেসের প্রতীক 'হাত' চিহ্নের পাশে লেখা হল-

১. হাত হাত হাত

জোগায় পেটের ভাত।

২. জ্যোতি জ্যোতি জ্যোতি

করল দেশের ক্ষতি।

৩. মোরারজী জ্যোতি মাতব্বর

পিঁয়াজ আপেল এক দর।[৯১]

এর জবাবে শাসক বামফ্রন্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' অবলম্বনে প্যারোডি লিখলঃ

এই হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি

এক হাতে টাকার থলি অন্য হাতে ছুরি।

কিংবা-

পরনে নেই কাপড়, পেটে নেই ভাত

দেওয়াল জুড়ে আঁকা ঘুষের কালো হাত।[৯২]

হাত চিহ্নের বিরুদ্ধে বিদ্রুপের বদলা-

কাস্তে দিয়ে কাটছে গলা

হাতুড়ির কথা যায় না বলা।

তারার ধাঁধায় ধাঁধিয়ে ওরা

বলছে আমরা সর্বহারা।[৯৩]

এর উত্তরে বামফ্রন্ট লিখল-

মাটি সোনা ধান সোনা

বুকে ধরি বাঁচতে

ভুলো না ভুলো না

তারা হাতুড়ি কাস্তে।[৯৪]

বিরুদ্ধে কংগ্রেস লিখল-

কাস্তেতে কাটছে

হাতুড়িতে মারছে।

এর জবাবে অন্য একটি দেওয়াল লিখনে বামফ্রন্ট কংগ্রেসের কাছে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল-

দেওয়াল জুড়ে আঁকলে হাত

জুটবে পেটে খিদের ভাত?[৯৫]

১৯৮২-র বিধানসভা নির্বাচনে আরও একটি অঞ্চল ভিত্তিক দেওয়াল লিখনের ছড়া লক্ষ্য করা যায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এই নির্বাচনে ইন্দাস কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন বদন বোড়া মহাশয়। ঐ প্রার্থীকে আক্রমণ করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

১. কাল কেউটে চন্দ্রবোড়া থাকে গাছে গাছে ,

বোড়ার রাজা বদন বোড়া ইন্দাসেতে নাচে।[৯৬]

২. পাঁচ বছরে কি পেলাম

লাঠি গুলি লাল সেলাম।[৯৭]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ রাজনীতির অপরিচিত বৃত্তে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। কারণ ১৯৮০ সালের ২৩ শে জুন সঞ্জয় গান্ধিকে এক বিমান দুর্ঘটনায় হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সেদিন নিঃসঙ্গ, কিছুটা নিঃসহায়। মায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে এই বোধ থেকে এগিয়ে এলেন জ্যেষ্ঠ রাজীব। তারপর ১৯৮১ তে উত্তরপ্রদেশের আমেঠি কেন্দ্র থেকে সঞ্জয়ের শূন্য আসনে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় এবং ১৯৮৩-তে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। দলের মধ্যে ইন্দিরার উত্তরসূরি কে, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতেই ১৯৮৪-র ৩১ শে অক্টোবর তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু, পশ্চিমবঙ্গের জনসভা থেকে চল্লিশ বছরের রাজীব গান্ধি সোজা প্রধানমন্ত্রীর আসনে। রাজীব গান্ধি যখন প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান খুব সংকীর্ণ ছিল। দু'তিনজন পার্শ্বচর তাঁকে পরিচালিত করতেন। তাঁদের পরামর্শে এবং অতি সঙ্গতভাবেই রাজীব রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন করতে। তাঁর পার্শ্বচরেরা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পরে যে বিপুল সহানুভূতির ঢেউ উঠেছিল তার প্রভাবেই কংগ্রেস দল বিরাট সংখ্যাধিক্যে সংসদে ফিরে আসবে। এমত অবস্থায় ১৯৮৫-র জানুয়ারিতে লোকসভা নির্বাচন

হয়। স্বাভাবিকভাবে ইন্দিরাকে আক্রমণ করে রচিত ছড়ার সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু অন্য ছড়াগুলি হল এরকম-

১.হাতে ছুরি পিস্তল বোম
মুখে বন্দেমাতরম।

২. প্রণব প্রিয় গনি
পশ্চিমবঙ্গের শনি।

৩. বাহাত্তরের সন্ত্রাস
এরই নাম প্রিয়দাস।৯৮

বিপক্ষে কংগ্রেসের প্রধান অস্ত্র ছিল লোডশেডিং-

১. প্রদীপে নেই সলতে
তাই ঘর অন্ধকার
সি পি আই(এম)-কে ভোট দিলে
সব হবে বেকার।৯৯

২. পশ্চিমবঙ্গে আলো নাই
বামফ্রন্টের ভোট নাই।১০০

৩. জ্যোতি গেলেন লন্ডন
ঘরে ঘরে লণ্ঠন।১০১

এছাড়া অন্যান্য ছড়াগুলি এরকম-

১. শ্রমিকের বুকে বিঁধল গুলি
তবুও এদের বিপ্লবী বুলি। ১০২

২. নোটন নোটন পায়রা গুলি

ঝোটন বেঁধেছে

চোর বদমাস গুণ্ডারা সব

সি পি আই(এম) হয়েছে।[১০৩]

৩. জ্যোতি বলে বিনয় ভাই

হাতের ভয়ে ঘুম নাই

কর এবার ব্যালট ছিনতাই

এছাড়া আর উপায় নাই। [১০৪]

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধামূলক একটি ছড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়-

ইন্দিরাজির পথে

রাজীবের সাথে

ছাপ দিন হাতে।[১০৫]

এর বিপক্ষে বামফ্রন্টের ছড়া-

স্বৈরতন্ত্রের পথে

একনায়কের মতে

রাজীবজির সাথে

ছাপ দিন হাতে।[১০৬]

১৯৮৫-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করে। স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ আসন লাভ করে কংগ্রেস(৫১৪ টি আসনের মধ্যে ৪০৪ টি আসন

পায়)। এরপর ৮৭-র বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে রাজীবের ‘মেরা ভারত মহান’ স্লোগানটিকে ব্যঙ্গ করে বাংলায় ছড়া রচিত হল-

১. মেরা ভারত মহান হ্যায়

বারো কোটি বেকার হ্যায়।

২. পেটে ভাত নাই জল নাই মাঠে

মেরা ভারত মহানই বটে।[১০৭]

৩. পরনে কাপড় নাই, ভাত নাই পেটে

মেরা ভারত মহান হ্যায়-ই বটে।[১০৮]

এর পাল্টা হিসেবে কংগ্রেসের ছড়া-

১. গরিব ছেলে গরিব রবে

চাষির ছেলে চাষা।

নিজের ছেলে বড় হবে

জ্যোতিবাবুর আশা। [১০৯]

২. দেহের শত্রু পাঁচড়া খোস

দেশের শত্রু জ্যোতি বোস।[১১০]

৩. আমার ছেলে কোটিপতি

তোমরা ধর ঝাণ্ডা

উল্টো পাল্টা কথা বললে

সর্বহারার ডাণ্ডা।[১১১]

৮৭-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে নকশালপন্থীদের দেওয়াল লিখনঃ

শোন দাদা, বলে গেল ঘোষেদের নন্দ

জ্যোতি দাদার গায়ে নাকি মার্কসীয় গন্ধ!

মার্কসীয় নয় মোটে কয় ইনঠানদি,

দুবার দেখেছি শুঁকে একেবারে গান্ধি। ১১২

১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দল একত্রে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' গঠন করে। সে সময় কংগ্রেস বিরোধিতায় 'বোফর্স কেলেঙ্কারি' বড় ইস্যু হয়ে ওঠে। আর রাজীব গান্ধিকে এই কেলেঙ্কারির নায়ক জ্ঞানে বিরোধীরা দিকে দিকে দেওয়াল লিখলেনঃ

গলি গলি মে শোর হ্যায়

রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়।১১৩

তৎকালীন সময়ে এই দুটো লাইন সারা ভারতের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে সরস রঙ্গ-ব্যঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। ভোটকে কেন্দ্র করে নানা রঙ্গ-রসিকতা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রাজ্যের নামে চালানোর প্রচলন রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের। সেই প্রক্রিয়াকে ব্যঙ্গ করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

দিলে জ্যোতি বোস

না দিলে কেন্দ্রের দোষ। ১১৪

কোথাও কোথাও বিরোধীদের স্পষ্ট জিজ্ঞাসা-

জহরের নাতি তুমি

ইন্দিরার ছেলে

বোফর্স কামান কিনে তুমি

কত ঘুষ পেলে?১১৫

কোথাও বা অনাস্থা- বিদেশি বিবি বিলাইতি 'কার'

নেহি চলেগি ইয়ে সরকার। ১১৬

কংগ্রেসের পাল্টা জবাব-

দিনের বেলা কৌটো নাড়া

রাতের বেলা ফিস্ট।

জ্যোতিবাবুর মাথা নাড়া

এরাই সাচ্চা কমিউনিস্ট। ১১৭

কিংবা- ওপরে ভরা, নীচে ভরা

মধ্যিখানে সর্বহারা। ১১৮

নব্বইয়ের দশকের বামফ্রন্টের নেতাদের দেহ ভঙ্গিমা গেল পাল্টে। রাজ্যের ছোট বড় মাঝারি নেতাদের মুখে সর্বহারার শ্রেণি সংগ্রামের কথা বললেও আচার আচরণে, বিলাস ব্যসনে তারা হয়ে উঠলেন পুরোদস্তুর বুর্জোয়া, ফলে গর্জে উঠল দেওয়াল। **১৯৮৬** সালে কমঃ সুভাষ চক্রবর্তী আয়োজিত 'হোপ ৮৬' কে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে ছড়া-

লতার গান আশার গান

জুড়ায় জ্যোতি বসুর প্রাণ।

তালে তালে বাজছে ব্যাণ্ড

গোর্খাল্যাণ্ড গোর্খাল্যাণ্ড। ১১৯

ভাষা দৌরাত্ম্যে মেতে উঠেছেন আমাদের রাজনীতিকরা। তবে হ্যাঁ, আমাদের রাজনৈতিক মঞ্চের কুশীলবরা যা বোঝাতে চাইছেন সেটাই বলছেন! কোনও অস্পষ্টতা নেই। তপ্ত আসরে ছুটছে কুকথার ফোয়ারা। বছরভরই চলে অল্পবিস্তর। আর নির্বাচনের মরশুমে যোগ হয় বিশেষ মাত্রা। এই সময় মুখের আগল থাকে না, খসে পড়ে আব্রু, ভেসে যায় শালীনতাবোধ, সৌজন্য। চলে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও ব্যক্তিগত আক্রমণের পালা।

পদমর্যাদার বিচার নেই, এ ধরনের কথা জনসমক্ষে বলা চলে কিনা, সেই বোধও মাঝে মধ্যে উধাও। এ তো প্রচার নয়, দেখেশুনে মাঝে মধ্যে মনে হয়, এ বুঝি ব্যক্তিগত কেচ্ছার হাঁড়ি ভাঙার আসর।

যুযুধান দল একে অপরকে বিদ্ধ করবে, রাজনীতির কারবারিরা পরস্পরের দিকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করবেন- তা তো বটেই। তবে বিদ্ধ করার অস্ত্র হবে যুক্তি, এটাই প্রত্যাশিত। যুক্তি দাবি করে পরিমার্জন, নিয়ন্ত্রণ, সংযম এবং ভিন্নমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু কোথায় সেটা? দুর্নীতি কেলেঙ্কারি নিয়ে দলগত তরজা, কাজিয়া- তার একটা অর্থ হয়তো আছে। কিন্তু তা যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির নামাবলীতে রূপ নিতে থাকে, তখনই ঘটে বিপত্তি। কেউ এই ধরনের মন্তব্য করলে ঠিক সেটাকেই অস্ত্র করে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার পথটা প্রশস্ত হয়ে ওঠে বিরোধী শিবিরগুলোর সামনে।[১২০]

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে রাজীব গান্ধির থেকে সরকার ছিনিয়ে নিলেন মাণ্ডার রাজা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। তিনি বিজেপি ও বামপন্থীদের সমর্থন নির্ভর ছিলেন। তবে এই সরকার মাত্র **১১** মাস টিঁকে ছিল। এরপর কংগ্রেসের সমর্থনে সমাজবাদী পার্টি সরকার গঠন করে চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে কিন্তু এই সরকারও এক বছর গড়ায়নি। **১৯৯১** সালের জুলাইতে লোকসভা নির্বাচন হল এবং ঐ বছরই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সে সময় কংগ্রেস(আই)-এর দেওয়াল লিখন- ১. বিজেপির কোলে

জ্যোতিবাবু দোলে।

২. মিথ্যার রাজা বঙ্গেশ্বর

কবে গড়বেন বক্রেশ্বর[১২১]

নিজস্ব দল তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের আগে মমতা ব্যানার্জী **১৯৯১** সালে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ান। এর আগের নির্বাচনে তিনি ঐ কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলন। তাই সে সময় যাদবপুরে মমতাকে ব্যঙ্গ করে এস এফ আই-এর দেওয়াল লিখন ছিল এরকম-

এই আমি মমতা

চাই পেতে ক্ষমতা

কাগজের ভাঁওতায়

ভোলাই যে জনতা

হেরেছি যাদবপুরে

জিতিবার বড় সাধ

এবার হেথায় আমি

SYMBOL কাটা হাত।[১২২]

এই সময় কংগ্রেসের স্লোগান ছিল-

সুস্থায়ী সরকার

কেন্দ্রে দরকার।

কিংবা- স্থায়ি সরকার করে এগিয়ে নিতে দেশ

একটি মাত্র দল তার নাম কংগ্রেস। [১২৩]

পাল্টা কংগ্রেসের প্রতীক 'হাত' চিহ্নের বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিষোদগার-

হাতে মাথা কাটতে কাটতে হাত হয়েছে খড়্গা

এবার ভোটে হাতের জন্য বরাদ্দ তাই মর্গ। [১২৪]

১৯৯১ সালে দশম লোকসভা নির্বাচন। প্রথম দফার ভোটের পর ২১ শে মে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শ্রীপেরেমবুদুরে মানব বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন রাজীব গান্ধি। পরবর্তী দফার ভোটে কংগ্রেসের ব্যালট বক্সে আবার সহানুভূতির ভোট। সরকার গড়ল কংগ্রেস, প্রধানমন্ত্রী হলেন পি ভি নরসিমা রাও। আর প্রধান বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। এরপর ১৯৯৬-র নির্বাচনে 'বার্নিং ইস্যু' হয়ে উঠল 'হাওলা কেলেঙ্কারি'। বিরোধীদের রং তুলিতে দেওয়াল গর্জে উঠল-

মেঘে মেঘে হল বেলা

মাথায় পড়ল টাক

হাওলাবাবু নরসিমা

এবার নিপাত যাক। ১২৫

প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও-এর পাশাপাশি কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের হাওলা কেলেঙ্কারিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ সমাচারে বিরোধীরা তখন উল্লসিত, সেই উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটল দেওয়ালে-

কোটি কোটি টাকার খেলা

চলছে রে ভাই দিল্লিতে।

রুই কাতলা চুনোপুঁটি

সব ফেঁসেছে হাওলাতে।১২৬

বিরোধী প্রদত্ত 'রুই কাতলা' প্রবাদের অন্যতম নেতা প্রণব মুখার্জীর অন্ত্যমিলে লিখিত হল:

প্রণব মুখার্জী

ঘুষেতে নেই এলার্জি।১২৭

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে পাঁচ বছরের ঘটনা নতুন নতুন ছড়া রচনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। ঘটে গেছে বাবরি মসজিদ ভাঙা, হর্ষ মেহেতার শেয়ার কেলেঙ্কারি, চন্দ্রস্বামী, টেলিকম, হাওলা ইত্যাদি। ইতিমধ্যে দেওয়ালে ধরা পড়েছে-

বোফর্স থেকে হাওলা

রাও সরকার ময়লা।

কিংবা- গ্রাম শহরে তোলো আওয়াজ

নিপাত যাক হাওলা রাজ। ১২৮

প্রাচীরে প্রাচীরে হাওলা যখন হায়নার হাসি হাসছে, কংগ্রেস তখন মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াসে পুরানো একটি প্রতিশ্রুতি নতুন করে দিতে চেয়েছিল কিংবা কোথাও আবার আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছিল:

এই হাওলা হতাশা ভাঙতে চাই

নতুন বাংলা গড়তে চাই।[১২৯]

কংগ্রেসের নতুন বাংলা নির্মাণের স্বপ্নকে ব্যঙ্গ করে বামপন্থীদের সরল টিপ্পনি:

আগে তো সামলা হাওলা

তারপর গড়বি বাংলা।[১৩০]

অপর আর একটি ছড়ায় বিখ্যাত শিল্পী ও সুরকার শ্যামল মিত্রের একটি জনপ্রিয় গান ‘পুতুল নেবে গো পুতুল’-এর প্যারোডি লেখা হয়েছিল-

হাওলা নেবে গো হাওলা

আমার এ ছোট্ট ঝুড়ি

এতে রাম রাবণ আছে

দেখে যাও নিজের চোখে

সুখরাম কেমন নাচে...।[১৩১]

তৎকালীন সময়ে অন্য আর একটি ছড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

শোন রাও মনমোহন

তোমাদের বলি এখন

তোমাদের কথায় নেচে

দেশ দেব না বেচে। [১৩২]

কংগ্রেস(আই)-এর জোরালো ইস্যু খুব একটা ছিল না ১৯৯৬-এর নির্বাচনে। ফলে ছড়ার যুদ্ধেও একটু পিছিয়ে পড়ে। এই সময় উল্লেখ করার মত কয়েকটি ছড়া হল:

তোমার হাতে শাসন কাঠি
তোমার ক্যাডার তুমি নাচাও
নিজের ছেলে যখন শিল্পপতি
তখন বলছ শিল্প বাঁচাও। ১৩৩

কিংবা- কি দিল বামফ্রন্ট?
নন্দন চন্দন
আর ঘরে ঘরে ক্রন্দন। ১৩৪

বিপক্ষে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন:

দুর্নীতিতে যমজ ভাই
বিজেপি কংগ্রেস(আই)। ১৩৫

তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে বিড়লা গোষ্ঠীর আলোচনাকে ব্যঙ্গ করে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন-

টাটা বিড়লার কোলে
জ্যোতি বসু দোলে। ১৩৬

উক্ত ছড়ার পুনরাবৃত্তি দেখেছে বাংলা, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে সিঙ্গুরে টাটা কারখানা প্রসঙ্গে বিরোধীরা আবার লিখেছে-

টাটা বিড়লার কোলে
বুদ্ধ বিমান দোলে। ১৩৭

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই সময় বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ এসেছিল কিন্তু পার্টির নিষেধে হয়ে ওঠেনি। দেবগৌড়া সরকার ভাঙার পরেও দু-বছরের মধ্যে দু-বার নির্বাচন হয়েছে। ঘন ঘন নির্বাচনের জন্য মানুষ বিরক্ত হতে লাগল। ফলে এই দুটি নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে দেওয়াল ছড়া কমে গেছে, এছাড়া এই সময় নির্বাচন কমিশন দেওয়াল লিখনে কিছু শর্ত আরোপ করে। অবশ্য তা সত্ত্বেও দেওয়াল লিখন হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় তখন শাসকদল সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বেঁধেছিল বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস। এই দুই দলের প্রতীক চিহ্নকে কটাক্ষ করে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

১. সাম্রাজ্যবাদের দুই ফুল

বিজেপি আর তৃণমূল।

২. সাম্প্রদায়িকতার মুল

বিজেপি ও তৃণমূল। ১৩৮

পুলিশের ডাণ্ডালাঠিকে ভয় না করে কংগ্রেস পার্টি কর্মীদের আরও বেশি করে প্রতিবাদী হওয়ার কথা বলা হয়েছে একটি ছড়ায়:

একতলা দু-তলা তিনতলা

পুলিশ গেল বেলতলা

পুলিশের হাতে ডাণ্ডা লাঠি

ভয় পায় না কংগ্রেস পার্টি।

কংগ্রেস পার্টি বারোটা

ডিম পেড়েছে তেরোটা

একটা ডিম নষ্ট

চড়ুই পাখীর কি কষ্ট। ১৩৯

১৯৯৭ সালে রাজ্য কংগ্রেস ত্যাগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন দল গঠন করেন, যার নাম 'তৃণমূল কংগ্রেস' এবং এই দলের প্রতীক চিহ্ন 'ঘাসফুল'। রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হল আর এক নতুন সমীকরণ। সদ্য তৈরি তৃণমূল কংগ্রেস ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। সেই সময় তৃণমূলের দেওয়াল লিখন ছিল-

ঘাসের উপর দুটি ফুল

বাংলা গড়বে তৃণমূল। ১৪০

অপর আর একটি ছড়ায় বাংলার সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়ে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এবং দলের সাধারণ কর্মীরা তাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার প্রতিজ্ঞাসূচক উক্তি তুলে ধরেছেন-

বাংলা ভরেছে সবুজে ও ঘাসে

ভয় নেই আর লাল সন্ত্রাসে

শহীদের রক্তে শুধব রক্তঋণ।

দিদির স্বপ্ন সোনার বাংলা

গড়বই একদিন।১৪১

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং সেই সঙ্গে কিছু পুরসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৯৩ সালের ৩০ মে। ১৯৮৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলের তুলনায় সি পি আই(এম) পায় ৬.৪২ শতাংশ কম আসন এবং কংগ্রেস পায় ৩.২৬ শতাংশ বেশি আসন। অন্যদিকে যে বিজেপি ১৯৯৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেয়েছিল মাত্র ৩২ টি আসন, ১৯৯৩-এর নির্বাচনে সে পায় ২৩৩৯ টি আসন। ফল প্রকাশের কিছু দিন পরে ১৯৯৩ এর ২১ শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় মহাকরণ অভিযান। এই অভিযান উপলক্ষে প্রায় বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালায়। এতে ১২ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং আহত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। পুলিশের গুলিতে এই গণহত্যার ঘটনায় মর্মাহত হন রাজ্যবাসী। উক্ত ছড়ায় সেই শহীদদের রক্তের ঋণ শোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অপর

আর একটি ছড়ায় বামফ্রন্টের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বার্ধক্যজনিত কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকে ব্যঙ্গ করে তৃণমূল লিখল:

এবার জ্যোতি নিভল

তৃণমূল উঠল। ১৪২

পূর্বের তুলনায় নির্বাচন কমিশনার আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। এই সময় থেকে ভোট প্রচারে ব্যাপক হারে হোর্ডিং, ফেস্টুন, পোস্টার এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রমরমা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় তৃণমূলের কর্মীদের আশাব্যাঞ্জক দেওয়াল লিখন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়:

এবার মমতা

পাচ্ছেই ক্ষমতা। ১৪৩

এর পাল্টা হিসাবে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

ধন্য আশা কুহকিনী

তোমার মায়ায়

মুগ্ধ মমতার মন

সে আশায় দিয়ে দাও ছাই

কাস্তে হাতুড়িতে ভোট দেওয়া চাই। ১৪৪

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন দল গঠন করলে, কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সে সময় কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

সোমেন মিত্র সোমেন মিত্র

তোমার আমার সবার মিত্র

কিসের বিবাদ কিসের সুবাদ

জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। ১৪৫

২০০৬ সালে বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূল একাই ভোটে নামে। সে সময় তৃণমূলের স্লোগান ছিল- হয় এবার

নয় নেভার।

জবাবে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

বিজেপির এঁটো খেয়ে এসেছে আবার

কৃষক শ্রমিক দেবে আস্তাকুঁড়ে পার। ১৪৬

রাজ্যে বামেদের গেড়ে বসা এবং বিরোধীরা কিছুতেই সেই রাজত্বে ফাটল ধরাতে পারছে না। অন্যদিকে বামেরাও যখন নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভাবছেন, তখন ধীরে ধীরে দুর্নীতি গ্রাস করছে তাদের। সে সময় দেওয়াল লিখনেও নখদন্তযুক্ত আক্রমণের ছায়া, ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘিত করে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন:

যেখানে বুদ্ধ

সেখানে যুদ্ধ

যেখানে বিমান

সেখানে কামান। ১৪৭

ষাটের দশকে বামপন্থীরাও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে লিখেছিলে-

জলের শত্রু কচুরিপানা

দেশের শত্রু অতুল্য কানা।১৪৮

এই ধরনের স্লোগান ধর্মী ব্যক্তি আক্রমণের ছড়া আগেও ছিল, যেমন-

যেথায় আছে হরেকেষ্ট

সেই খানেতে পয়সা নষ্ট। ১৪৯

কিংবা- যেখানেই প্রমোদ

সেখানেই গলদ। ১৫০

২০০৭ সালে সিঙ্গুরে এবং নন্দীগ্রামের পর প্রচারের ভাষা পাল্টে যায়। পরিবর্তন চাই স্লোগানের তলায় বুদ্ধিজীবীদের কম্পিউটারকৃত ছবি পাওয়া যায়। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে ভোটে লড়ে। দুটি দলের নির্বাচনী প্রতীক যথাক্রমে 'জোড়াফুল' ও 'হাত'। এই নির্বাচনে শাসক দল সি পি আই(এম) দুটি দলের প্রতীক চিহ্নের রূপকে জোটকে আক্রমণ করে দেওয়াল লিখলেন-

হাত উঠেছে ফুল ফুটেছে

জোট করেছে কে?

দিদি নাচছে দাদু নাচছে

দেশ ভোগে যাকগে।১৫১

উক্ত ছড়াটি 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে...' ছড়ার প্যারোডি। এই সময় সি পি আই(এম)-এর অন্যতম স্লোগান ছিল: কৃষি আমাদের ভিত্তি

শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। ১৫২

এই স্লোগানের উপর ভর করে সি পি আই(এম) ২০০৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পায়। এই সময় শাসক সি পি আই(এম)-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

মাসিক বেতন বিশ হাজার,

বি পি এল পায় তারা।

রিক্সা চালায় যে বন্ধুরা,

ঘৃণার পাত্র তারা।

ঘর নেই, চাষ নেই,

পায় না খেতে ভাত।

সি পি আই(এম)-কে ভোট না দিলে

কেটে নেবে হাত। [১৫৩]

৪.৬. বর্তমান তৃণমূল সরকার (২০১১-২০১৬):

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে 'টাটা' কোম্পানি ন্যানো গাড়ি তৈরির কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে এ নিয়ে সে সময়ের বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ২৬ দিন অনশন করেন ও তার ফলস্বরূপ টাটা কোম্পানি কারখানা স্থানান্তরিত করে গুজরাটের 'সানন্দায়' নিয়ে যায়। এই সময় বিরোধীদের কাছে এটি খুব বড় ইস্যু ছিল। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

টাটা আর ন্যানো গেল

বাংলা হল শুদ্ধ

আর কটা দিন সবুর কর

এবার যাবে বুদ্ধ। [১৫৪]

শাসক দল বামফ্রন্টের যুক্তি হল সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানি ন্যানো গাড়ী তৈরির কারখানা স্থাপন করলে রাজ্যের বেকারত্ব কিছুটা দূর হবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তাই বিরোধীদের জবাবে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

দিদিরা যখন ন্যানো তাড়ায়

দাদারা যায় সাথে।

বেকার যুবক ভোট দেবে না

ফুল কিংবা হাতে। [১৫৫]

এ প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের দেওয়াল লিখন-

বাংলা থেকে ন্যানো গেল,

দিদির কিবা এসে গেল?

বেকার যুবক বেকার থাকুক

চাষির ছেলে চাষি,

ভুল বুঝিয়ে ভোটটা বাড়ুক

তাতেই দিদি খুশি। ১৫৬

২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে বিধ্বংসী 'আয়লা' ঝড়ে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলে 'লায়লা' নামে একটি সামুদ্রিক ঝড় হয় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই দুটি ঝড়ের প্রভাবে দুই বাংলার সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ এই দুটি ঝড়ের সাথে বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলনা করে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা দেওয়াল লিখলেন-

আয়লা নয়, লায়লা নয়,

এবার এসেছে মমতা।

পালা বুদ্ধ, পালা বিমান,

আর পাবি না ক্ষমতা। ১৫৭

বিপক্ষে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

নোটন নোটন চিল শকুনে জোট বেঁধেছে

দিদির হাতে মিথ্যা ছিল ছুঁড়ে মেরেছে

আস্তে দিদি মানুষ জেগেছে। ১৫৮

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বামপন্থীদের অন্যতম প্রচার ছিল তৃণমূল শিল্প বিরোধী। আর তৃণমূল বলছে বামফ্রন্ট কৃষক বিরোধী। এই নিয়ে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষের তর্জমা ধরা পড়েছে দেওয়ালে-

১. টাটার দালাল সি পি আই(এম)-কে টাটা কর ভাই।

এবার রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার চাই। ১৫৯

২. সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নেতাই

ব্যালটে এর বদলা চাই।[১৬০]

বিপক্ষে বামেদের দেওয়াল লিখন-

কালীঘাটের ময়না,

শিল্প করতে দেয় না।

আয়রে আয় মমতা।

দেখে যা হলদিয়ার অবস্থা। [১৬১]

শিল্পাঞ্চল হিসাবে হলদিয়ার উন্নয়নকে তুলে ধরে শিল্প বিরোধী মমতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে উক্ত ছড়ায়। অপর আর একটি স্লোগান ধর্মী ছড়ায় বামফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধরা পড়েছে-

একে একে এগারো

বামফ্রন্ট এবারও। [১৬২]

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে তৃণমূলের কবির সুমন ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়লাভ করেন। শাসক বামফ্রন্ট প্রার্থীকে হারিয়ে তৃণমূলের এই জয়ের ফলে সাধারণ কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি আশাব্যাঞ্জক দেওয়াল লিখন-

দক্ষিণে কবির সুমন, উত্তরে সুদীপ

সারা বাংলায় জ্বলবে উন্নয়নের প্রদীপ। [১৬৩]

দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ২০১১ সালে তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের হাত ধরে পরিবর্তন আসে বাংলায়। এই পরিবর্তনের ফলে উজ্জীবিত তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

কাল ছিল লাল খালি

আজ ফুলে যায় ভরে। [১৬৪]

কিছুদিন পর বামফ্রন্ট এই পরিবর্তনকে ব্যঙ্গ করে লিখল-

কি পরিবর্তন আনলে কাকা

বাজার করতে পকেট ফাঁকা। ১৬৫

এরপর ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে স্বাভাবিক ভাবেই আক্রমণাত্মক দেওয়াল লিখন-

মানুষের পাশে আছে কাস্তে হাতুড়ি

সেই দেখে মুষড়ে পড়েছে মুকুল

দিল্লির স্বপ্ন দেখ না দিদিমণি

বাংলার মানুষ করবে না আর ভুল। ১৬৬

বিপক্ষে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

বদলা নয় বদল চাই,

ধ্বংস নয় সৃষ্টি।

ফিরিয়ে মোরা আনবই

বাংলার হারানো কৃষ্টি। ১৬৭

২০১৪ সালের প্রাইমারী নিয়োগ নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

যে বেকারের জ্বলছে পেট

ঘুষ না দিয়ে পায়নি টেট।

সে বেকারেরা দিচ্ছে ডাক

তৃণমূল সরকার নিপাত যাক। ১৬৮

তৃণমূলের অন্যতম স্লোগান ছিল- 'চুপচাপ ফুলে ছাপ'

এর পাল্টা হিসাবে বামফ্রন্ট লিখল-

আর নয় চুপচাপ

কাস্তে হাতুড়িতেই দেব ছাপ। ১৬৯

শাসক দলের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুসারে ভারতের মুঘল শাসনব্যবস্থা ও ইংরেজ শোষণের চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাধীনতার পর দীর্ঘকালব্যাপি কংগ্রেস ও সি পি আই(এম)-এর শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনা করে বর্তমান সরকারের অবস্থান ধরা হয়েছে একটি দেওয়াল লিখনে-

মুঘল করেছে শাসন

ইংরেজ করেছে শোষণ

কংগ্রেস করেছে স্বজনপোষণ

সি পি আই(এম) করেছে নির্যাতন

মা মাটি মানুষের সরকার

চায় উন্নয়ন আর উন্নয়ন। ১৭০

অন্য নির্বাচনের তুলনায় দেওয়াল দখলের লড়াইয়ের পিছিয়ে থাকলেও ছড়া রচনায় পিছিয়ে নেই সি পি আই(এম)। রাজ্য সরকারের শিল্প বিদ্বেষী মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে বামফ্রন্ট লিখল-

শিল্প তাড়াবো

বেকার বাড়াবো

ওড়াব জয়ের ফানুস

আমার যাত্রা পালাটার নাম

মা, মাটি আর মানুষ। ১৭১

হাওড়ার ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি গ্রামে তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জীর নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখন- কংগ্রেস হারিয়ে গেছে

সি পি আই(এম)-এ অ্যালার্জী

বিজেপি কে হারাতে হবে

জিতবে প্রসূন ব্যানার্জী। ১৭২

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান, নিরাপত্তা ও মানুষের মানসিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে কংগ্রেসের রচিত একটি ছড়ায়-

ভাইয়ের আয়ু বাড়বে বলে

ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ

বোনের জন্য থাকে কেবল

ইভটিজিং আর ধর্ষণ। ১৭৩

অন্য আর একটি সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের নেতা মন্ত্রীরা 'সারদা চিটফান্ড' কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ধরা পড়েছে সি পি আই(এম)-এর একটি ব্যঙ্গাত্মক দেওয়াল লিখনে-

তৃণমূলের ৩৪ মাস

মানুষের সর্বনাশ

দিদির পায়ে হাওয়াই চটি

দিদির ভাইয়েরা সব কোটিপতি। ১৭৪

এখানে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের সঙ্গে তৃণমূলের ৩৪ মাসের সরকারের তুলনা করা হয়েছে উক্ত ছড়ায়। এর জবাবে তৃণমূলের দেওয়াল লিখনঃ

এত যন্ত্রণা, এত বঞ্চনা, এত কুৎসার পরে,

তবুও তুমি একাই একশো রুখতে না কেউ পারে।

সরাতে তোমার চাইছে যারা থামবে তারা থামবে,

তোমার পথেই জনস্রোত বৃষ্টি হয়ে নামবে। ১৭৫

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনাকে ইস্যু করে বিরোধী বামেরা দেওয়াল লিখল:

চলছে নারীর সম্ভ্রমহানি

গেদে মধ্যমগ্রাম কামদুনি

বলছে দিদি কিছু হয়নি।১৭৬

হাওড়ার আমতা এলাকার তৃণমূল প্রার্থী সুলতান আহমেদের পক্ষে দেওয়াল লিখন:

কন্যাশ্রী মমতার দান

মানুষের পাশে আছেন সুলতান

উন্নয়ন কাকে বলে বুঝে নিন

সুলতান আহমেদকে ভোট দিন।

বারাসতের বিজেপি প্রার্থী পি সি সরকারের হয়ে তার দলের দেওয়াল লিখন-

দিল্লিতে মোদী সরকার

বারাসতে পি সি সরকার। ১৭৮

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের দেওয়াল লিখন-

বাংলা এখন বদলে গেছে

উন্নয়নের নতুন সুর।

পশ্চিমবঙ্গ মমতা ময়

কল্যাণময় শ্রীরামপুর। ১৭৯

২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের ফলে অনেক স্থানে সি পি আই(এম)-এর পার্টি অফিস ভাঙচুরের খবর আসে। সেই পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের ১ লা মে থেকে ১০ ই মে পর্যন্ত সি পি আই(এম)-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পার্টি অফিস পুনর্নির্মাণের যে কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছিল সেখানে শাসক দলের আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং পার্টি কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য পোস্টারে লেখা একটি ছড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

ওরা যত মারবে

মিছিল তত বাড়বে

ওরা যত ভাঙবে

মানুষ তত গড়বে। [১৮০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ওরা' বলতে এখানে শাসকদল তৃণমূলকে বোঝানো হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষের ভিটে পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) অর্থাৎ পদ্মার ওপার। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের শোচনীয় হারের পর তাঁকে ব্যঙ্গ করে শাসক তৃণমূলের দেওয়াল লিখন:

ইলিশ মাছের ত্রিশ কাঁটা

বোয়াল মাছের দাড়ি

বুদ্ধবাবু কিনবে এবার

পদ্মাপারের বাড়ি। [১৮১]

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির কিছু দেওয়াল লিখন লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের সদ্য পরিবর্তনকে ব্যঙ্গ করে একটি ছড়া-

১. পরিবর্তন কাহারে কয়

সি পি আই(এম) হল তৃণমূল,

প্রকৃত তৃণমূল হল নির্মূল।

মা সইবে না আর ভুল,

মাটিতে ফুটবে না আর জোড়াফুল

এক মাত্র বিকল্প হল পদ্মফুল। ১৮২

২. ভয় ভুক আর ভ্রষ্টাচার, মূল্যবৃদ্ধি বারবার,

জন জন করে পুকার, এবার মোদী সরকার। ১৮৩

রাজ্যের সকল বিরোধী দলকে চ্যালেঞ্জ করে শাসক তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

হাত হাতুড়ি কাস্তে তারা

এবার হবে বাংলা ছাড়া

ফুটবে নাকো পদ্মফুল

ভারত গড়বে তৃণমূল। ১৮৪

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনের ইতিহাসে বৃহত্তম জনসংযোগের রেকর্ড আপাতত ঝুলিতে। ভোটের প্রচারে ৩০০০০০ কিমি যাত্রা, ২৫ টি রাজ্য ঘুরে ৪৩৭ টি জনসভা, ৪০০ টি চায়ে পে চর্চা, ১৯৬ টি রোড শো। এহেন মোদীর প্রশংসায় পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সমর্থকেরা দেওয়াল ভরালেন-

দুপুর গেল সন্ধ্যা হল

ফিরল পাখি বাসায়

পথ চেয়ে বসে আছি

নরেন্দ্র মোদীর আশায়

ঢোল বাজায় কাঁশি বাজায়

বাজায় বিরোধী দল

উঠেছে মোদীর ঝড়

পারবি কি রুখতে

ক্ষমতা থকলে বল। [১৮৫]

এই নির্বাচনের প্রাক্কালে মোদীর স্বপক্ষে রব উঠল-

হর হর মোদী

ঘর ঘর মোদী। [১৮৬]

একই সুরে পাল্টা বিরোধীরা বলল-

থর থর মোদী

ডর ডর মোদী। [১৮৭]

একইভাবে বাংলার শাসক তৃণমূল লিখল-

হরে কৃষ্ণ হরে হরে

তৃণমূল ঘরে ঘরে।

কোথাও আবার- ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল

সব কেন্দ্রে তৃণমূল। [১৮৮]

বিপক্ষে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

তৃণমূল মানে ধর্ষণ

তৃণমূল মানে খুন

লাল বাংলায় জ্বলবে

অশান্তির আগুন। [১৮৯]

পাল্টা তৃণমূল লিখল- সূর্য কাঁদিয়া কহে

বিমান আমার ভাইরে

বুদ্ধকে বলে দিও

ভারতে বামফ্রন্ট আর নাইরে। ১৯০

জবাবে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন:

চাল খেকো, ডাল খেকো, রক্ত খেকো সরকার

পশ্চিমবাংলায় আর নেই দরকার। ১৯১

২০১৫-র কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে অন্যদের তুলনায় শাসক দলের দেওয়াল লিখন একটু বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাচনে শাসক তৃণমূল তার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান বাংলার জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন ছড়ার মাধ্যমে। যেমন-

১. ঝকঝকে রাস্তা

ঝলমলে আলো

সবাই বলছে

তৃণমূল ভালো। ১৯২

২. নেই জলের হাহাকার

নেই রাস্তায় অন্ধকার

আমরা সবাই একজোট

তৃণমূলে সব ভোট। ১৯৩

৩. এলাকাবাসী বলছে ভাই

তৃণমূলে ভোট চাই।

সবুজ সবুজ সবুজ চাই,

লাল বাবুদের দেখা নাই। ১৯৪

বিপক্ষে তৃণমূল ও বিজেপিকে কটাক্ষ করে সি পি আইএর-(এম) দেওয়াল লিখন-

এক ফুল দুই ফুল

সব ফুল শুধু ভুল

যদি চাও বাঁচতে

তোমার প্রতীক হোক

তারা হাতুড়ি কাস্তে। ১৯৫

তৃণমূলের জনপ্রিয় স্লোগান 'মা মাটি মানুষ'-কে ব্যঙ্গ করে বিজেপির দেওয়াল লিখন-

মা- কাঁদছে

মাটি- ফাটছে

মানুষ- বলছে

বিজেপি আসছে। ১৯৬

বিপক্ষে তৃণমূল লিখল- হিংসা দাঙ্গা ষড়যন্ত্র

বিজেপির মূলমন্ত্র

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি

বিজেপির মূলনীতি। ১৯৭

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই নির্বাচনের পূর্বে শাসক দলের অনেক নেতা মন্ত্রী সারদার পাশাপাশি নারদা স্ট্রিং অপারেশনে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা শাসক দলের নেতা কর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত হানে। দ্বিতীয়ত নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে রাজ্যে বাম-কংগ্রেস জোট শাসক দলের অন্দরে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। অন্যদিকে বিরোধীদল হিসাবে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি সব মিলিয়ে একটা জমজমাট নির্বাচনী প্রচার লক্ষ্য করা যায় এই নির্বাচনে। তার প্রতিফলন ঘটেছে হোর্ডিং, পোস্টার,

ব্যানারের পাশাপাশি দেওয়াল লিখনে। এই নির্বাচনে বিরোধীদল সি পি আই(এম) ও বিজেপির প্রতীক চিহ্নকে আক্রমণ করে শাসক দলের দেওয়াল লিখন-

পদ্মফুল শুকিয়ে গেছে

মরচে ধরা কাস্তে

তৃণমূলকে ভোট দিয়ে

মানুষ চাইছে বাঁচতে। ১৯৮

কিংবা- সবুজে ঘেরা রাজপথে

চলেছি মোরা একসাথে

সারা বাংলা দিচ্ছে ডাক

মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ। ১৯৯

বিপক্ষে বামফ্রন্ট লিখল- দুষ্টু রাজা মিথ্যে রাণী

চড়ছে ফানুস, লুটছে মানি

ফুঁসছে মানুষ বলছে এবার

ষোলোয় সুযোগ পাল্টে দেওয়ার। ২০০

অন্য আর একটি দেওয়াল লিখনে শাসক দলের আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে-

এগারোর পর ষোল

নতুন সকাল হল

বাংলার মানুষ করবে না ভুল

আসছে আবার তৃণমূল। ২০১

কিংবা- নতুন স্বপ্ন নতুন আশা

বেঁচে থাকার নতুন ভাষা

উন্নয়নে জোড়া ফুল

বার বার তৃণমূল। ২০২

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে জোড়াসাঁকোর কাছে নির্মীয়মান উড়ালপুল ভেঙে পড়ে এবং অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়। যার ফলে নির্বাচনের আগে জনমানসে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শাসক তৃণমূলকে ব্যঙ্গ করে রাজ্যের বিরোধীদল সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন-

মন্ত্রী জেলে এম পি জেলে

তবুও আবার টাকা খেলে।

তাই ভাঙল উড়ালপুল

আর নয় তৃণমূল। ২০৩

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সারদা চিটফাণ্ড' মামলায় রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র ও তৃণমূলের সাংসদ কুণাল ঘোষের জেল হয়। পরে অবশ্য জামিনে ছাড়া পান কিন্তু দেওয়ালে তার প্রমাণ থেকে গেল। মানুষের কাছে বিশ্বাস অর্জনের জন্য তৃণমূলের আবেদন-

বিশ্বাস রাখুন

ভরসা রাখুন

রাখুন আপনাদের আস্থা

বাংলার উন্নয়নে

তৃণমূল কংগ্রেস-ই

একমাত্র রাস্তা। ২০৪

কিংবা- তৃণমূলের হাত ধরেই,

উন্নয়ন চলছে।

উন্নয়নই শেষ কথা

তৃণমূল বলছে। ২০৫

তৃণমূলের উন্নয়নকে ব্যঙ্গ করে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

মরছে কৃষক, মরছে মজুর

মরছে জনগণ।

তৃণমূল হেঁকে বলে

এটাই উন্নয়ন! ২০৬

শাসকদল তৃণমূল আবার বাংলার মানুষের আশীর্বাদে ক্ষমতায় আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন,দেওয়াল লিখনের ছড়ায়-

হাত হাতুড়ি পদ্ম

মানুষ করবে জব্দ

যতই নাড়ো কলকাঠি

নবান্নে আবার হাওয়াই চটি। ২০৭

অথবা- হাত হাতুড়ি পদ্ম ভুলে

ভোট দিন জোড়া ফুলে

আসছে ষোল সবাই বলো

উন্নয়নের সঙ্গে চলো। ২০৮

ভারতীয় রাজনীতির খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জোট রাজনীতি। জোট গঠন বা জোট ভাঙা ভারতের রাজনীতির নতুন বিষয় নয়, বরং এর ইতিহাস বিস্তৃত আছে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

যদিও ভারতীয় রাজনীতিতে জোটের খেলা শুরু হয়েছে মূলত ষাটের দশকে কিন্তু এর ট্রেণ্ড আজও বিরাজমান এবং ভবিষ্যতে-ও এই ট্রেণ্ড চলবে। কারণ ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি। যাইহোক দেওয়ালের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি এই দীর্ঘ জোট রাজনীতির ইতিহাস। দেওয়ালেরও যে কান আছে, তার সত্যতা অনুধাবন করা যাবে ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে। যেমন- ষাটের দশকে কংগ্রেস-সি পি আই-এর জোট নিয়ে বামেদের দেওয়াল লিখন-

দিল্লি থেকে এল গাই

সঙ্গে বাছুর সি পি আই।

পরবর্তীতে রামে-বামে জোটের জামানায় কংগ্রেস দেওয়াল লিখেছিল-

একটি গরুর দুটি শিং

জ্যোতি বসু ভি পি সিং।

কিংবা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় তৃণমূল- বিজেপির জোটকে ব্যঙ্গ করে সি পি আই(এম)-এর দেওয়াল লিখন- বিষবৃক্ষের দুটি ফুল

বিজেপি ও তৃণমূল।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের টেক্সট বই খুলে ভুল ধরিয়েছিল তৃণমূল-

বিষবৃক্ষের ফুল হয় না

মূর্খ সি পি আই(এম) তাও জানে না। ২০৯

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বাম-কংগ্রেস জোট সম্ভবত এবার ভোটের সবচেয়ে বড় আকস্মিক ঘটনা। যা সম্ভবত ভাবিয়ে তুলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। তাই এই অনৈতিক জোটকে ব্যঙ্গ করে ছড়া রচনা করা হয়েছে-

১. সাপের ঘরে ব্যাঙের বাসা

হাত হাতুড়ির ভালোবাসা। ২১০

২. কংগ্রেস ছিল ধর্ষণকারী

সি পি আই(এম) ছিল খুনি

এখন তারা জোট করে

শোনাচ্ছে ধর্মের বাণী। ২১১

৩. কেরলে করে দাঙ্গা

পশ্চিমবঙ্গে হয় প্রেম

এরাই আবার বড়াই করে বলে

বন্ধু আমরা কংগ্রেস-সি পি এম। ২১২

৪. কাস্তের সাথে মিশে গেছে

কব্জি কাটা হাত

কংগ্রেস খাচ্ছে তাই

সাঁই বাড়ির রক্তমাখা ভাত। ২১৩

অথবা- হার্মাদদের ভোজসভায়

অধীর পেতেছে পাত

মেনুতে আছে সাঁইবাড়ির

রক্তমাখা ভাত। ২১৪

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের বিরুদ্ধে বামদলগুলি ১৭ মার্চ বনধ্ ডাকেন। এদিনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল বর্ধমান শহরে সি পি আই(এম)-এর এক বিশাল মিছিলের দ্বারা আক্রান্ত হয় বর্ধমান শহরের কংগ্রেস সমর্থক মলয় সাঁইয়ের বাড়ি এবং ঘটনাস্থলে নৃশংসভাবে খুন হন মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই ও যতীন রায় নামে তিন ব্যক্তি। স্বভাবতই রাজ্যের শুভবুদ্ধি

সম্পন্ন মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হন। অতীতের এই ঘটনাকে তুলে ধরে জোটবদ্ধ দুটি দলের সম্পর্কের ইতিহাস মনে করানোর চেষ্টা করেছেন ছড়াকারগণ। ২১৫

এই জোটকে নিয়ে শাসক তৃণমূলের নেতা কর্মীরা এখানে থেমে থাকেন নি। তারা প্যারোডিও রচনা করলেন-

সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ

ইন্দিরাকে ডাইনি, রাজীবকে বোফর্স গান্ধি বলল যে সি পি এম

কলিযুগের কংগ্রেস করছে তারই সাথে প্রেম। ২১৬

কিংবা- আতা গাছে তোতা পাখি,

ডালিম গাছে মৌ।

কংগ্রেস পার্টি বর সেজেছে

সি পি এম তার বৌ। ২১৭

রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা মিত্র বলে কিছু হয় না, তার বড় প্রমাণ জোট রাজনীতি। একটা সময় কংগ্রেস ও সি পি আই(এম)-এর মধ্যে ছিল সাপে নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু **২০১৬**-র বিধানসভা নির্বাচনে সেই বাম-কংগ্রেসের জোট হয়। অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে ছিলেন কংগ্রেসের নেত্রী। পরে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করলেন এবং বিজেপির সাথে জোট করে কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেন। অথচ বর্তমানে বিজেপির সাথে তৃণমূলের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। এই সব ঘটনা প্রবাহের সাক্ষী দেওয়াল, আগেও ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বাম-কংগ্রেসের জোটকে আক্রমণ করে যেমন শাসকদল দেওয়াল ভরিয়েছে, ঠিক তার পাল্টা হিসেবে বিরোধী জোট সারদা, নারদা-র মত ইস্যুতে শাসকদলের নেত্রীকে তুলোধোনা করেছেন। যেমন- ১. এক বৃন্তে দুটি ফুল

চিটফাণ্ড আর তৃণমূল।

২. এসেছেন স্যাণ্ডেলে

যাবেন স্ক্যাণ্ডেলে।

৩. দিদির পায়ে হাওয়াই চটি

দিদির ভাইয়েরা সব কোটিপতি। ২১৮

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের কৃতিত্ব রাজ্য সরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে নিচ্ছে, এই মর্মে বিজেপির দেওয়াল লিখন-

টাকা দিচ্ছে মোদী

ছাপ লাগাচ্ছে দিদি। ২১৯

তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন-

বঙ্গে আসছে ঝড়

ভাঙবে মোদির ঘর

বাংলা দেখাল পথ

ছুটবে দিদির রথ

দিদির বিকল্প নাই

বাংলায় তৃণমূল চাই। ২২০

কিংবা- সেতু, বিদ্যুৎ, রাস্তা

অর্জিত আজ আস্থা

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য

করছে যথাসাধ্য

ভরসা জাগায় মমতা

বলছে বঙ্গ জনতা। ২২১

অন্যদিকে পাল্টা হিসেবে বিজেপি লিখল-

গড়তে বাংলা আনতে সুদিন

বিজেপিকে ভোট দিন। ২২২

রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে বাম টিপ্পনী-

গত পাঁচ বছরে দুটি শিল্প

চপ শিল্প আর ঢপ শিল্প। ২২৩

এর পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

বসন্তের এই দিনগুলিতে

সবাই মোদের চিনে নিন

আমরা সবুজ আমরা নতুন

থাকব মোরা চিরদিন।

জবাবে সি পি আই(এম) –

বসন্ত এসে গেছে

মদনতো ফেঁসে আছে। ২২৪

শাসকদলের পক্ষ থেকে কটাক্ষ করা হয়েছে সি পি আই(এম)-কেও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী সূর্যকান্ত মিশ্রের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে একটি গানের প্যারোডি করা হয়েছে এভাবে- আমায় একটু জায়গা দাও

আমি অনামুখো একজন

অনেক দোষের দোষী। ২২৫

প্যারোডির জবাব প্যারোডিতে দিল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন DYFI। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে 'জাতিস্মর' নামে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি ছিল রূপঙ্করের কণ্ঠে –'এ তুমি কেমন তুমি/চোখের তারায় আয়না ধর/এ কেমন কান্না তোমার/ আমায় যখন আদর কর'। এই গানের সূত্র ধরে প্যারোডি লেখা হয়েছিল এভাবে-

এ তুমি কেমন তুমি

চুরির টাকায় ফূর্তি কর

এ কেমন কাণ্ড তোমার

চোরের জন্য মিছিল কর। ২২৬

রাজ্যের শাসকদলের নেতা কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বও চাপা থাকেনি, তারও ছাপ রয়েছে দেওয়ালে। রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে দল দীর্ণ। প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরব দলেরই লোকজন। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মেটাতে লেখা হল-

১. সকল বিভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে

ভোট দেব জোড়া ফুলে

উন্নয়নের পতাকা তুলে

আমরা আছি তৃণমূলে। ২২৭

২. তৃণমূল মানে পেট ভরে ভাত,

খাদ্য সাথীর আহ্বান।

তৃণমূল মানে সবুজ সাথীতে,

কন্যাশ্রীর জয়গান। ২২৮

৩. তৃণমূল মানে শিরদাঁড়া সোজা

বাংলার মান হুঁশ,

তৃণমূল মানে সামনে মমতা

সঙ্গে মা মাটি মানুষ। [২২৯]

৪. পদ নয়, পতাকা

প্রার্থী নয়, প্রতীক

বিবাদ নয়, একতা

আমাদের নেত্রী, মমতা। [২৩০]

৫. অনেক হয়েছে আর নয়

কাস্তেতে নয়, হাতেও নয়, নয় পদ্ম ফুলে,

মা বোনেরা সব জোট বেঁধেছে

ভোট দেব তৃণমূলে। [২৩১]

জবাবে বামফ্রন্ট লিখল-

১. পরিবর্তনের একই হাল

পাড়ায় পাড়ায় তাপস পাল

বুক ফুলিয়ে গুণ্ডা চলে

পুলিশ লুকায় টেবিল তলে।

রোজ রোজ নতুন ঢপ

শিল্প শুধুই আলুর চপ। [২৩২]

২. ঘাস ফুল আর পদ্ম

বাংলা ছাড়বে সদ্য

দিদি মোদী এক ঠাঁই

তোতা পাখি সি বি আই। ২৩৩

৩. বিকায় ছবি বিকায় কোট

কালো টাকার দামে।

দুর্নীতিতে সমান সমান

তফাৎ শুধু নামে। ২৩৪

৪. উঠছে বাংলায় উত্তাল হাওয়া

কারো আশা কারো যাওয়া।

পশুরাও চমকে গেছে

তৃণমূলের টাকা খাওয়া। ২৩৫

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যঙ্গ করে শাসক তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

পারলে না মোদী তুমি, বিহার সামলাতে

ভুল করে ঢুকো না, সোনার বাংলাতে

ঘুরে কি লাভ, এখানে সেখানে

ফিরে যাও তুমি আবার, চায়ের দোকানে।২৩৬

কেন্দ্রে মোদী সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এর অল্প কিছুদিন পরে গুজরাটের বিখ্যাত হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী কয়েক হাজার কোটি টাকা পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অবস্থায় দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যঙ্গ করে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন-

আগে বেচত চা, সঙ্গে ছিল কেটলি

এখন বেচছে দেশ, সঙ্গে আছে জেটলি। [২৩৭]

বিপক্ষে বিজেপি লিখল-

হল ভোর খুল না দোর

দিদিমণি আসেরে

রাজ্যের সব চোর

মমতার পাশেরে।

কিংবা- ৪০০ বছরেও এত কাজ হবে না

বলছেন মমতা

তাইত রাজ্যতে চোরেদের ক্ষমতা। [২৩৮]

অপর আর একটি দেওয়ালে দেখা গেল শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করে বাম-কংগ্রেস জোটের দেওয়াল লিখন- জনগণের টাকা নিয়ে

সততার ফুলঝুরি

বাংলাকে বাঁচাতে

বাম কংগ্রেস একজোট

তৃণমূলের নয়কো ভোট। [২৩৯]

সি পি আই(এম)-এর একটি আশাব্যাঞ্জক দেওয়াল লিখন-

লাল ঝাণ্ডা লাল ঝাণ্ডা

বাংলার মা কাঁদছে

বাংলায় তুমি ফিরে এসো

বাংলার মানুষ ডাকছে। [২৪০]

১৯৭২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। সে সময় শ্রী রায়ের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন বাম দলগুলি। যার নেতৃত্বে ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সহপাঠী এবং বন্ধু জ্যোতি বসু। সে সময় পুলিশের বিরুদ্ধে একটি স্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তখন যেকোন মিছিলে পুলিশ প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে বাম নেতা কর্মীরা স্লোগান দিতেন- পুলিশ তুমি যতই মারো

মাইনে তোমার একশ বার। ২৪১

মিছিল নগরী বলে খ্যাত কলকাতার রাজনীতিতে স্লোগানের একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য আজকের নয়, দীর্ঘদিনের কখনও দেশীয় রাজনীতি কখনও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্র নিয়ে রাজনৈতিক স্লোগানধর্মী ছড়া তৈরি করেছিল কলকাতা।

নির্বাচন মানেই কি তত্ত্বের কচকচানি, বিরোধীদের কড়া সমালোচনায় কোণঠাসা করার চেষ্টা নাকি প্রতিশ্রুতির বন্যা? নিন্দুকেরা এসব বললেও নির্বাচনের সঙ্গে জুড়েছে কবিতা, ছড়া এবং সৃষ্টিশীলতার নানা দিক। সে দেওয়ালে রং দিয়ে প্রার্থীর প্রচার হোক বা মিছিলের নতুন ধরনের স্লোগান। এ প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন- 'দেখুন আলকাতরানো দেওয়ালগুলো এখন চুন কালিতে ছয়লাপ। মশাইরা দাঁড়িয়ে যান খেলা হবে খেলা'। কিংবা মনে পড়ে যেতে পারে- দেওয়াল থেকে শিখতে হয়, দেওয়াল জানতে হয়

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে, দেওয়াল জুড়ে লিখতে হয়।

এই দেওয়ালের প্রচার যুদ্ধ তো আর ঘোড়ায় চড়ে হয় না। তাই ছড়ায় চড়ে হাজির হন প্রার্থীরা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গ করে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে অস্ত্র হয় ছড়া। এ প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা-

লাগ লাগ করে লেগে যায়, এর ঢাল ওর তরোয়াল

ভোট কুড়নিরা কেড়ে নেয় ঘুটে কুড়নির দেওয়াল।১৪২

এটা প্রায় প্রত্যেক ভোটেই ঘটে থাকে। শহুরে কিংবা গ্রামের মানুষ উদাসীন কিংবা সিরিয়াস ভোটার, সকলের কাছে পৌঁছতে ছড়ার চেয়ে নিশ্চিত অথচ সহজ পথ আর নেই। ছন্দের

কারণেই তা মনে থেকে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজ্যে ভোট শুরু হলে চায়ের দোকান উত্তপ্ত হবে, দেওয়াল জুড়ে চুনকামের পোঁচ পড়বে এটাই স্বভাবিক। তাতে লাল, সবুজ, গেরুয়া নানা রঙের লড়াই। নানা ফুল, হাতুড়ি, কাস্তে, হাতের সমাহার। অবাক হলে চলবে কেন! রাজ্যে ভোট শুরু হয়েছে অথচ দেওয়াল শান্ত থাকবে তা কি করে হয়? ভোটের আঁচে তাও বর্ণময়, বিশেষ করে ছড়াময়। হাল সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার কিংবা চ্যানেলে প্রচার এসব এসেছে বটে কিন্তু সে আর কদিনের? এখনও ভোট প্রচারের ট্র্যাডিশনাল মাধ্যম তো দেওয়ালই।

তথ্যসূত্র:

১. ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৫৩-৪৫৬।

২. সোনারপুর থানা সংলগ্ন জনসচেতনতামূলক পোস্টার থেকে ২৫.০৪.২০১৬-তে সংগৃহীত।

৩. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৫ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৮৪-৮৫।

৪. বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর(১৯৪৭-১৯৯৭), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কো: প্রা: লি:, বই মেলা ১৯৯৯, পৃ. ৫-৭।

৫. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৬৮।

৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭০।

৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭০।

৮. বাংলার রাজনীতি প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া, সুশান্ত ঘোষ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৯২।

৯. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭১।

১০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১১. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১২. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭১।

১৬. যুগান্তর পত্রিকার ১৯৬২ সালের ২২ শে জুনের সম্পাদক সমীপেষুতে, জনৈক পাঠকের প্রতিবাদমূলক চিঠিতে উক্ত ছড়াটি পাওয়া যায়।

১৭. বর্তমান পত্রিকা, ৪ঠা মে ২০১৪, শিরোনাম- কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রচার, সাম্প্রতিক, পৃ. ৩।

১৮. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৪।

১৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৪।

২০. পূর্বোক্ত

২১. পূর্বোক্ত

২২. পূর্বোক্ত

২৩. বর্তমান পত্রিকা, ৪ঠা মে ২০১৪, শিরোনাম- কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রচার, সাম্প্রতিক, পৃ. ৩।

২৪. পোস্টার, বেলঘরিয়া পোস্ট অফিস সংলগ্ন দেওয়াল।

২৫. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৮।

২৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৮।

২৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৩।

২৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৪।

২৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৩০. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭২।

৩১. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪০।

৩২. প্রফুল্ল সেন-অতুল্য ঘোষ ও সমকালীন রাজনীতি, অভিজিৎ রায়, সাগর বুকস, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৩৪।

৩৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৫।

৩৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৩৫. পূর্বোক্ত

৩৬. পূর্বোক্ত

৩৭. কাঙাল মালসাট, নবারুণ ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি প্রকাশন, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ১১২-১১৩।

৩৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৩৯. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪০।

৪০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৪০।

৪১. জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ১৯৯৭, পৃ. ১৩৯।

৪২. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৫।

৪৩. বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর(১৯৪৭-১৯৯৭), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কো: প্রা: লি:, বইমেলা ১৯৯৯, পৃ. ৮৩-৮৪।

৪৪. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৫।

৪৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৫।

৪৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৫।

৪৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৫।

৪৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৬।

৪৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৬।

৫০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৬।

৫১. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৫২. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৬।

৫৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৬।

৫৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৫৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৪।

৫৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৫৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৫৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৫৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৬০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৮।

৬১. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৬২. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৭।

৬৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৮।

৬৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৮।

৬৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৯।

৬৬.পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৯।

৬৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৯।

৬৮. প্রফুল্ল সেন-অতুল্য ঘোষ ও সমকালীন রাজনীতি, অভিজিৎ রায়, সাগর বুকস, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৯৩।

৬৯. দেওয়াল লিখন- দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং স্টেশনের পশ্চিম দিকে মিঠাখালি প্রাইমারী সংলগ্ন পাঁচিল থেকে সংগৃহীত।

৭০. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৭।

৭১. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৪।

৭২. আমলাগাছি, মুদ্রার ওপিঠ, ভগীরথ মিশ্র, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৬ ই আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৫৩।

৭৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৭৪. পূর্বোক্ত

৭৫. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৭।

৭৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৩।

৭৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৪।

৭৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৬।

৭৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৬।

৮০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৯-৮০।

৮১. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৯।

৮২. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭৯।

৮৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮০।

৮৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৮৫. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮০।

৮৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

৮৭.ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৯।

৮৮. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮১।

৮৯. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৮।

৯০. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮০।

৯১. ছড়ায় সমকালের অনুরণন, তপন বর, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা- বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩২।

৯২. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮০।

৯৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

৯৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

৯৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

৯৬. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৭৯।

৯৭.পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

৯৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

৯৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮১।

১০০. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮২।

১০১. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬২।

১০২. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮২।

১০৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮২।

১০৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮২।

১০৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮২।

১০৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৩।

১০৭. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৩।

১০৮. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬০।

১০৯. ছড়ার অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা- বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৪।

১১০. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১১১. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৩।

১১২. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ১১০।

১১৩. বর্তমান পত্রিকা, ৪ঠা মে ২০১৪, শিরোনাম- কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রচার, সাম্প্রতিক, পৃ. ৩।

১১৪. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৪।

১১৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৪।

১১৬. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬০।

১১৭. ছড়ায় অঙ্গে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা- বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৪।

১১৮. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬৩।

১১৯. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৪।

১২০. বর্তমান পত্রিকা, ৪ঠা মে ২০১৪, শিরোনাম- কুকথার লীলাকেত্তন!, সাম্প্রতিক, পৃ. ৩।

১২১. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৪।

১২২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১২৩. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৫।

১২৪. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬০।

১২৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ৬১।

১২৬. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৫।

১২৭. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬১।

১২৮. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৫।

১২৯. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬২।

১৩০. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৬।

১৩১. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৬।

১৩২. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৬।

১৩৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৭।

১৩৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৭।

১৩৫.পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৬।

১৩৬. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬২।

১৩৭.পূর্বোক্ত,পৃ. ৬২।

১৩৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৭।

১৩৯. দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর অঞ্চলের প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীর স্মৃতি থেকে গৃহীত।

১৪০. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৮।

১৪১. বি কে সি কলেজের গেটে টাঙানো ফেস্টুন থেকে সংগৃহীত, ডানলপ, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৩।

১৪২. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৮।

১৪৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৮।

১৪৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ৮৮।

১৪৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- দ্বন্দ্ব ভোলার ছড়ায় কবুল দ্বন্দ্বই, পৃ. ৬।

১৪৬. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৮।

১৪৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৪৮. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৬৫।

১৪৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৫।

১৫০.পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৫।

১৫১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৫২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- শহরে দেওয়াল জুড়ে ছড়ার টক্কর, পৃ. ৭।

১৫৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৫৪. পূর্বোক্ত

১৫৫. পূর্বোক্ত

১৫৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- দ্বন্দ্ব ভোলার ছড়ায় কবুল দ্বন্দ্বই, পৃ. ৬।

১৫৭. দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার মোক্তারপুর অ: প্রা: বিদ্যালয়ের দেওয়াল থেকে ২০০৯ সালে সংগৃহীত।

১৫৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৫৯. উত্তর কলকাতার বরানগর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের আর আই সি বাজার সংলগ্ন তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে ফেস্টুন থেকে ছড়াটি গৃহীত ২০১৪ সালে।

১৬০. আলাপ বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৮।

১৬১. দেওয়াল লিখন, ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজ সংলগ্ন এলাকা, তথ্য দাতা- সন্তু পুরকাইত।

১৬২. ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের ইস্তেহারে প্রকাশিত।

১৬৩. দেওয়াল লিখন, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দমদম সিঁথির মোড়ের রোডের বামদিক থেকে সংগৃহীত।

১৬৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৬৫. পূর্বোক্ত

১৬৬. পূর্বোক্ত

১৬৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের সরস দেওয়াল চিত্রে জমজমাট হাওড়া, পৃ. ৫।

১৬৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৬৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের সরস দেওয়াল চিত্রে জমজমাট হাওড়া, পৃ. ৫।

১৭০. দেওয়াল লিখন, জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট ব্লকের রাঙালী বাজার সংলগ্ন বাস স্টপেজ থেকে সংগৃহীত। (তথ্যদাতা-লিংকন দাস)

১৭১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের সরস দেওয়াল চিত্রে জমজমাট হাওড়া, পৃ. ৫।

১৭২. পূর্বোক্ত

১৭৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৭৪. পূর্বোক্ত

১৭৫. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার ডানলপ কালীমাতা মন্দিরের বিপরীত বাড়ির পাঁচিল থেকে সংগৃহীত।

১৭৬. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৮০।

১৭৭. পূর্বোক্ত

১৭৮. পূর্বোক্ত

১৭৯. পূর্বোক্ত

১৮০. পোস্টার, ২০১৪ সালের ১লা মে থেকে ১০মে পর্যন্ত সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা পার্টি অফিস পুনর্নির্মাণের কর্মসূচীতে এই স্লোগান ধর্মী ছড়াটি লেখা হয়েছিল।

১৮১. দেওয়াল লিখন, সাহাপাড়া, মিঞাপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০১৪(তথ্যদাতা- সুরজিৎ সাহা)।

১৮২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৮৩. ফেস্টুন, শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজ্যসভাপতি রাহুল সিনহার আহ্বানে প্রচারিত।

১৮৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৮৫. পূর্বোক্ত

১৮৬. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৭২।

১৮৭. পূর্বোক্ত

১৮৮. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার পিছনে জাগৃতি ক্লাবের দেওয়াল থেকে(২০১৪) সংগৃহীত।

১৮৯. দেওয়াল লিখন, বর্ধমান জেলার ভাতাড় স্টেশন সংলগ্ন রবীন্দ্রপল্লীর দেওয়াল থেকে সংগৃহীত।

১৯০. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, শিরোনাম- ভোটের ছড়া, রবিবাসরীয়, পৃ. ৯।

১৯১. দেওয়াল লিখন, বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন শৌচালয়ের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত। (তথ্যদাতা- দেবপ্রসাদ মণ্ডল)।

১৯২. এইসময় পত্রিকা, ৯ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- কার্টুন, ছড়ায় কোন্নগরে দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল, এই শহর, পৃ. ৬।

১৯৩. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার নৈনানপাড়া লেন, ২৫ নং ওয়ার্ডে বাড়ির পাঁচিল থেকে সংগৃহীত।

১৯৪. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার অন্যান্য বাস স্টপেজের পাশে বি টি রোডের উপর পেট্রোল পাম্পের পাঁচিল থেকে সংগৃহীত(২০১৪)।

১৯৫. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার টবিন রোডের কাছে ২৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তার পাশের দেওয়াল থেকে নেওয়া।

১৯৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ২০১৬, শিরোনাম- গেল ভোট রইল দেওয়াল, নদিয়া, পৃ. ১৮।

১৯৭. দেওয়াল লিখন, বরানগর পৌরসভার নেতাজি কলোনী, পি সি এম কলেজের বিপরীতে গলির পাশের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত(২০১৪)।

১৯৮. এইসময় পত্রিকা, ৯ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- কার্টুন, ছড়ায় কোন্নগরে দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল, এই শহর, পৃ. ৬।

১৯৯. বাঘাযতীন রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন দেওয়াল থেকে সংগৃহীত।

২০০. নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আয়ুর্বেদ ভবনের বিপরীত দেওয়াল থেকে গৃহীত।

২০১. শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার কালিকাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাউথ গড়িয়া রোডের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে গৃহীত(২০১৬)।

২০২. পূর্বোক্ত

২০৩. কলেজস্ট্রীট, মিনি রেস্টুরেন্টের পাশের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত।

২০৪. শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার পিয়ালি স্টেশনের পার্শ্ববর্তী রাস মাঠ সংলগ্ন দেওয়াল থেকে সংগৃহীত(তথ্যদাতা- সুমন মণ্ডল)।

২০৫. রাণীকুঠী অটোস্ট্যান্ডের কাছাকাছি খেলার মাঠের পাঁচিল থেকে গৃহীত।

২০৬. পূর্বোক্ত

২০৭. সোনারপুর বাজার সংলগ্ন দেওয়াল থেকে ০৮/০৩/২০১৫ তারিখে সংগৃহীত।

২০৮. শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার কালিকাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাউথ গড়িয়া রোডের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ১০/০১/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২০৯. তর্জমাটি ৩রা জানুয়ারি ২০১৮ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গৃহীত।

২১০. বাঁশদ্রোণী মেট্রো স্টেশনের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ৬/০২/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২১১. বারুইপুর ক্যানিং রোডের মধ্যবর্তী ক্যানিং হসপিটাল মোড়ের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ০৬/১১/১৫ তারিখে সংগৃহীত(তথ্যদাতা- জগদীশ নস্কর)।

২১২. দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাম্পাহাটির সাউথ গড়িয়া ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন দেওয়াল থেকে ০৯/১২/১৫ তারিখে সংগৃহীত।

২১৩. বাঁশদ্রোণী মেট্রো স্টেশনের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ৬/০২/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২১৪. গড়িয়া কামাল গাজী রোডের মধ্যবর্তী মহামায়াতলার কাছাকাছি রাস্তার বাম পাশের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত।

২১৫. বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর(১৯৪৭-১৯৯৭), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কো: প্রা: লি:, বই মেলা ১৯৯৯, পৃ. ৭৮-৭৯।

২১৬. সোনারপুর থানার খেয়াদা হাই স্কুলের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ০৮/০৩/২০১৫ তারিখে সংগৃহীত।

২১৭. তর্জমাটি ৩রা জানুয়ারি ২০১৮ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গৃহীত।

২১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা মে ২০১৮, মল্লারপুর, ময়ূরেশ্বর থেকে অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।

২১৯. পূর্বোক্ত

২২০. পূর্বোক্ত

২২১. বর্ধমান জেলার কালনা বাজার সংলগ্ন দেওয়াল থেকে ২০১৬ সালে সংগৃহীত(তথ্যদাতা- দেবপ্রসাদ মণ্ডল)।

২২২. উত্তর ২৪ পরগণার মালঞ্চ বসিরহাট রোডের মাঝামাঝি ভেবিয়া শ্মশানের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে গৃহীত(তথ্যদাতা- সঞ্জীব সরদার)।

২২৩. গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন খালপাড়ের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে সংগৃহীত।

২২৪. তর্জমাটি ৩রা জানুয়ারি ২০১৮ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গৃহীত।

২২৫. এইসময় পত্রিকা, ৯ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- কার্টুন, ছড়ায় কোন্নগরে দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল, এই শহর, পৃ. ৬।

২২৬. সোনারপুর গোড়খাড়া ঘোষ পাড়ার দেবালয় এপার্টমেন্টের বিপরীত দেওয়াল থেকে ২৭/০২/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২২৭. এইসময় পত্রিকা, ৯ মার্চ ২০১৬, শিরোনাম- কার্টুন, ছড়ায় কোন্নগরে দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল, এই শহর, পৃ. ৬।

২২৮. বরানগর পৌরসভার বনহুগলি লেকের পার্শ্ববর্তী সারদা গার্লস স্কুলের পাঁচিল থেকে ১৫/০১/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২২৯. সোনারপুর তেমাথা রোডের ঘাসিয়াড়া মোড়ের পার্শ্বের দেওয়াল থেকে ০২/০৩/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২৩০. পূর্বোক্ত

২৩১. শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার কালিকাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাউথ গড়িয়া রোডের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ১০/০১/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২৩২. যাদবপুর এক নং প্লাটফর্মের বাইরে রাস্তার পার্শ্বের পাঁচিল থেকে ১৬/১২/২০১৫ তারিখে সংগৃহীত।

২৩৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ২০১৬, শিরোনাম- গেল ভোট রইল দেওয়াল, নদিয়া, পৃ. ১৮।

২৩৪. শিয়ালদহ ক্যানিং শাখার কালিকাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাউথ গড়িয়া রোডের পার্শ্ববর্তী দেওয়াল থেকে ১০/০১/২০১৬ সংগৃহীত।।

২৩৫. দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী বাজারের কলাহাজরা মোড় সংলগ্ন দেওয়াল থেকে গৃহীত।

২৩৬. নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে ডাবর কোম্পানীর পাঁচিল থেকে ১৪/০৩/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২৩৭. শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাজাবাজারের দিকে যেতে নারকেলডাঙ্গা অটোস্ট্যাণ্ডের পার্শ্বের দেওয়াল থেকে ০৫/০২/২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

২৩৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ২০১৬, শিরোনাম- গেল ভোট রইল দেওয়াল, নদিয়া, পৃ. ১৮।

১৩৯. পূর্বোক্ত

২৪০. সোনারপুর থানার অন্তর্গত খুঁড়িগাছি মোড় সংলগ্ন দেওয়াল থেকে ২৫/১১/২০১৫ সংগৃহীত।

২৪১. সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজের বটানির অধ্যাপক মাননীয় মতিউর রহমান মহাশয়ের স্মৃতি থেকে গৃহীত।

২৪২. ছড়াসংগ্রহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১১, গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা, পৃ. ২২৭-২৩৮।

পঞ্চম অধ্যায়: রাজনৈতিক ছড়ায় বাংলাদেশ

৫.১. দেশভাগের প্রেক্ষিত।

৫.২. পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশ।

৫.৩. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ।

৫.৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৭-১৯৪৭ এই দশ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন, যার লক্ষ্য ছিল সকল সম্প্রদায়ের অধিকার, দেশীয় রাজাদের মর্যাদা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থসিদ্ধি। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন, বোম্বে প্রদেশ থেকে সিন্ধু দেশের স্বতন্ত্রীকরণ, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি ছিল এ শাসন আইনের উল্লেখযোগ্য বিধি ব্যবস্থার অন্যতম। এরপর ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে প্রথম থেকেই সমস্যা দেখা দেয়। কারণ পরিষদে কোন দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অত:পর কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পর মুহম্মদ আলি জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nation Theory) ঘোষণা করেন। পরের বছর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে এ সময় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ গৃহীত হয় এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানানো হয়।

১৯৩৪ সালের ১৩ এপ্রিল খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং এর অল্প দিনের মধ্যে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় জাপানীদের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশের যানবাহন নষ্ট করে দেয় এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করে গুদামজাত করে ও সৈন্যদের প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এতে বাংলায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে যখন ব্রিটিশের বিপর্যয় ঘটে এবং জাপানি বাহিনী ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাসহ ভারতে পাঠান। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মার্চ ক্রীপস নয়া দিল্লি পৌঁছান। তিনি কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং ৩০ শে মার্চ তিনি তাঁর শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ শেষে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা গঠিত হবে কিন্তু ক্রীপস প্রস্তাব বিভিন্ন কারণে কংগ্রেস ও লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। কংগ্রেস ‘অখণ্ড ভারত’ নীতিতে অটল থাকে, অপর দিকে মুসলিম লীগ ও লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারে অটল থাকে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ টি মুসলমান আসনের সবকটিতে মুসলিম লীগ জয়ী হয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচনের

ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা গেল বাংলার মুসলমান ভোটারগণ পাকিস্তানের দাবিতে তাদের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে। মুসলিম লীগ ১৯৯ আসনের মধ্যে ১১৩ টি আসন দখল করে। অতঃপর সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা ছিল তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের পাকিস্তানের দাবি সুদৃঢ় হয়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ হবে বলে সিমলা কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে সূত্র অনুসারে ১৯৪৬ খ্রীঃ শ্রমিক দল 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠান। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তিনটি স্তর বিশিষ্ট ফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয়। এ প্রস্তাব অনুযায়ী – ১। কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে ২। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে ৩। ভারতীয় প্রদেশগুলিকে তিনটি বিশেষ গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে; প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, এ গ্রুপগুলির সদস্যগণ একটি সংবিধান পরিষদে মিলিত হয়ে সমগ্র ভারতের জন্য একটি গঠনতন্ত্র রচনা করবে। গ্রুপগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব হয়- (ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বম্বে ও মাদ্রাজ (খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান (গ) বাংলাদেশ ও আসাম। এ তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে থাকবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ ও মুদ্রাবিভাগ। বাদবাকি সকল বিভাগ প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে। প্রতি দশ বছর ইচ্ছা করলে প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যাধিক্য সদস্যরা শাসনতন্ত্রের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার দাবি করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সংবিধান পরিষদের মোট ৩৮৫ টি আসনের মধ্যে ৭৮ টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। কোন গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পর ভারতীয় রাজনীতিতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতি সুস্পষ্ট হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন। গ্রুপিং ব্যবস্থার মধ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের পরিকল্পিত পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি দেখতে পান এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেখেন এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে তাঁদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন।

এমত অবস্থায় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগস্ট লর্ড ওয়াভেল নেহেরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পণ্ডিত নেহেরু এ ব্যাপারে বড়লাটের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি তাঁর শর্তাধীন ৫ জন মুসলিম লীগ সদস্যকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নিতে রাজি হন। কিন্তু মুসলিম লীগ কর্মকর্তাগণ এ শর্ত গ্রহণ করেননি। ১৯৪৬-এর ২৪ জুন পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রথমে এ সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাদের প্রতিনিধি না থাকার ফলে মুসলমানদের স্বার্থহানি হচ্ছে। অক্টোবরে লীগের ৫ সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেন। অন্তর্বর্তী সরকারে বাংলার কোন মন্ত্রী ছিল না। সে সময় দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটছিল তার মোকাবিলা করে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যর্থ হয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ অ্যাটলি ভারতের এ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য ১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পার্লামেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে মার্চ লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন শেষ বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এ সময় জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের পাকিস্তান দাবির প্রতি অটল মনোভাব প্রদর্শন করলে কংগ্রেস এ দাবি মেনে নেয়। গান্ধিও ২রা এপ্রিল দ্বিতীয়বার মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এ পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে মত দেন। কিন্তু কংগ্রেস সে সময় এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, বাংলা ও পাঞ্জাব হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী এলাকা হিসেবে ভাগ করতে হবে। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ, পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার জেনকিনস, বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী এবং গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বাংলার কংগ্রেসের অন্যতম অসাম্প্রদায়িক নেতা শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায় সহ আরও অনেকে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। যে কারণে এ প্রস্তাবটি 'বসু-সোহারাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কিন্তু পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ ই আগস্ট ব্রিটিশ শাসিত ভারত বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১]

২. পাকিস্তানি শাসনে বাংলাদেশ:

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বিতর্কিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ববাংলা নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাসে 'পাকিস্তানি আমল'।

১৯৪৭-১৯৫৪ পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের শাসন অব্যাহত ছিল। মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনমানস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আমলা, গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সেনাবাহিনীর সমর্থনে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অ-গণতান্ত্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, দেশে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা এবং পাঞ্জাবে গণ্ডগোলের অজুহাতে নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলায় বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন যুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ কঠিন বিবেচনা করে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি ঐক্যজোট গঠিত হয়। ফজলুল হক ইতিমধ্যে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছিলেন। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী মুসলিম লীগ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে আন্দোলন করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা চিন্তা করেন। তাঁর ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' বা জনগণের মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরে এ দলের নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় 'আওয়ামী লীগ'। পূর্ববাংলায় এ দল অল্প দিনের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে যে ঐক্যজোট হয়েছিল তার দলগুলি হল- আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা' এবং একুশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফার মধ্যে দুটি বিশেষ দফা ছিল পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি। বাঙালি জাতির জনক ও জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের দেওয়াল লিখন ছিল-

পদ্মা মেঘনা মধুমতি

নৌকা ছাড়া নাইকো গতি

নৌকার মাঝি মুজিব ভাই

আপনাদের কাছে দোয়া চাই।[২]

সীমাহীন দুর্নীতি, প্রশাসন বিভাগে অসমতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কারণে পূর্ববাংলার মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। মানুষের সুষ্ঠভাবে বাঁচার জন্য যেগুলি প্রয়োজন তা হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। যখন এর একটির অভাব মানুষের জীবনে আসে তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। এ রকম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পূর্ববাংলার মানুষ যখন দিন কাটাচ্ছে তখন হঠাৎ করে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সে সময় স্লোগান উঠেছিল-

ভোটের আগে ভাত চাই

নইলে এবার রক্ষা নাই,

মোরা করেছি পণ

হতে দেব না নির্বাচন।[৩]

প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯ টি আসন। সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয় ছিল মুসলিম লীগের সাত বছরের কুশাসন ও শোষণের জর্জরিত পূর্ববাংলার জনগণের পুঞ্জিভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। এরপর কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ও যুক্তফ্রন্ট প্রধান শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আত্মপ্রকাশে আশঙ্কা করেছিল। তাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর জন্য কেন্দ্রে শীঘ্রই ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ফজলুল হকের কলকাতা গমন এবং দমদম বিমান বন্দরে তাঁর ভাষণকে কেন্দ্র করে নানা কুৎসা রচনা করতে থাকে। তাঁকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলেও চিহ্নিত করা হয়।

পূর্ববাংলার জননেতা এ. কে ফজলুল হক সাহেব রাজনৈতিক বক্তৃতার মাঝে প্রায়শই প্রতিপক্ষ দলকে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলে ঠাট্টা করতেন-

কি মোহিনী জানো রে জাদু

কি মোহিনী জানো।

মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলিয়া

ডাঙায় বইসা টানো।[৪]

এই ঠাট্টার অর্থ হল ঠাণ্ডা ঘরে বসে কেবল গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেই জননেতা হওয়া যায় না। প্রকৃত নেতা হতে গেলে জনতার দরবারে যেতে হয়। যেমন ডাঙায় বসে মাছ ধরা যায় না, তার জন্য জলে নামতে হয় ঠিক তেমনি জনগণের কাছে না গেলে জননেতা হওয়া যায় না।

প্রাদেশিক সরকার দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে- এ অজুহাতে দু-মাস অতিবাহিত হওয়া আগেই গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ববাংলায় গভর্ণরের শাসন জারি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা নতুন গভর্ণর হয়ে আসে। মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বিদেশে ছিলেন তাই যুক্তফ্রন্টের সকল অপবাদ ফজলুল হকের উপর এসে পড়ে। তাঁকে স্ব-গৃহে বন্দী করে রাখা হয়। ৯২(ক) ধারা জারি করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ও আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবর রহমান সহ প্রায় তিনহাজার নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। এই ঘটনার অল্প কিছু দিনের মধ্যে স্বৈরাচারী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর সার্বভৌম গণপরিষদ বাতিল করে দিয়ে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৫৫ সালের ৭-ই জুলাই দ্বিতীয় গণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট মিলিতভাবে চৌধুরী মুহম্মদ আলির নেতৃত্বে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে (১১-ই আগষ্ট ১৯৫৫)। এ. কে. ফজলুল হক এই মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অপরদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণপরিষদের বিরোধী দলনেতা হন। এই সরকারও খুব বেশি দিন স্থায়িত্ব পায়নি। ইস্কান্দার মীর্জার হস্তক্ষেপের ফলেই ১৯৫৬ সালের ৭-ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকটের কারণে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে গভর্ণর ফজলুল হক ৬-ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেন। এই ঘটনার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে (১২-ই সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রে মন্ত্রীসভার বদল হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এক বছরের মধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে ইস্কান্দার মীর্জা ভয় পেয়ে যান। তাই আবার শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত রিপাবলিকান পার্টির ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় পরিষদের আহ্বান ছাড়াই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতির আবারও জয় হয়। ১৯৫৭ সালের ১৬ অক্টোবর তিনি পদত্যাগ করেন।

এরপর রিপাবলিকান প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি বরং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটির পর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। এমত অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে স্পীকার আব্দুল হাকিমের কার্যকলাপে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ অনাস্থা প্রকাশ করলে তার স্থলে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে মনোনীত করা হয়। ফলে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পরিষদ কক্ষে তুমুল গোলযোগ ও মারামারি হয়। এতে ডেপুটি স্পীকার সাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সেনা প্রধান জেনারেল মুহম্মদ আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[৫]

ইস্কান্দার মীর্জা বহু উচ্চাশা করে সেনাপতি আয়ুব খানকে দেশে গণতন্ত্র হত্যার কাজে গোপন ষড়যন্ত্র ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, সামরিক আইন ঘোষণার মাত্র ২০ দিন পর অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর আয়ুব খান রাজনৈতিক অবস্থার অবনতির অপরাধে ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করেন এবং নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও বহাল থাকবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদ বাতিল করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে তিনি পূর্বপাকিস্তানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। এছাড়া তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট পোডো (Public Office Disqualification Order) এবং এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) নামে দুটি আদেশ জারি করে দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেন। দেশের চরম রাজনৈতিক সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দেশকে রক্ষা করা ও অরাজকতার অবসান ঘটানোর নামে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ তথা নির্বাচনকে বানচাল করার ফন্দি ছিল সামরিক আইন জারি। আয়ুব খানের এই অ-গণতান্ত্রিক সামরিক শাসন চলেছিল ১৯৫৮-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত।

১৯৬১ সালের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ভয়াবহ রূপলাভ করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ নিয়ে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (Student Action Committee- SAC) গঠিত হয়। দেশে যখন নেতৃত্বের অভাব ঠিক তখনই 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এ

সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই সময় আয়ুব খানকে নিয়ে একটি ছড়া ঢাকার রাজপথের পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে দেখা যেত-

আয়ুব বেটা গরু(মুরগি) চোর,

বেড়া ভেঙ্গে দিল দৌড়।

ধরল কেঠা ধরল কেঠা,

বীর বাঙালি! বীর বাঙালি!৬

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খান আহূত গোল টেবিল বৈঠক বসে। Democratic Action committee-র প্রতিনিধিগণ এবং বিচারপতি মুর্শেদ ও এয়ার মার্শাল আজগার খানের মত স্বতন্ত্র নেতৃবৃন্দও এতে যোগ দেন। কিন্তু জুলফিকার আলি ভুট্টো, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এতে যোগদান করেন নি। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈঠকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না মানায় শেখ মুজিবর বৈঠক বর্জন করেন এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে গণ-ঐক্য জোটও ভেঙে যায়। ইতিমধ্যে গণ আন্দোলন আরও তীব্র হয়। দেশের নানা স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড ঘটতে থাকে। আইন ও প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শীঘ্রই তিনি দেশের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। আওয়ামী লীগের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে। এছাড়া তিনি ১৯৭০ সালের ১ লা জানুয়ারি থেকে দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেন। এই নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগের প্রতীক চিহ্ন 'নৌকা'-র সুখ্যাতি করে রচিত একটি ছড়া-

তোমার আমার ঠিকানা।

পদ্মা মেঘনা যমুনা।।

নৌকা চলে ভাসিয়া।

ভোট দিবেন হাসিয়া।।

সাইকেলে পাম্প নাই।

নৌকা দিয়ে হাটে যাই।।

হারিকেনে তেল নাই।

নৌকা ছাড়া গতি নাই।।

চিন্তা কইরা দেখলাম ভাই।

নৌকা ছাড়া উপায় নাই।।

নৌকা চলে টিক টিক।

ভোট দেবেন ঠিক ঠিক।।[৭]

৩. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভ:

দেশের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য কোন কোন দল দাবি তুললেও আওয়ামী লীগ তা মেনে নিতে রাজি হল না। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচন বন্ধ করলে তিনি বিপ্লব আরম্ভ করবেন। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং পূর্বপাকিস্তানের জন্য ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয়ী হয়ে ৩১৩ টি আসন বিশিষ্ট পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসন লাভ করে, অবশিষ্ট ১২ টি পায় অন্যান্য দল। পশ্চিমপাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি জয়ী হয়। তারা জাতীয় পরিষদের ১৪৪ টি আসনের মধ্যে ৮৮ টি দখল করতে সমর্থ হয়। পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিমপাকিস্তানে পিপলস পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও কেউ নিজ অঞ্চল ছাড়া অন্য অঞ্চলে একটি আসনও পায়নি। এই নির্বাচনে বস্তুতপক্ষে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের ধারণা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো নির্বাচিত হয়ে দাবি করেন যে, তিনি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি। তিনি আওয়ামী লীগের ছয় দফা মানতে রাজি নন এবং আওয়ামী লীগ তাদের দাবি সংশোধন না করলে তিনি জাতীয় পরিষদ বর্জনের হুমকি দেন। এ দিকে শেখ মুজিব ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল থাকেন। এভাবে শুরু হয় রাজনৈতিক সঙ্কট।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ১৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন এবং তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। কিন্তু তিনি জাতীয় পরিষদের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে টালবাহানা আরম্ভ করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, ছয় দফা দাবির রদবদল না করা হলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। এরপর ১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। শেখ মুজিব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন এবং জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, শুধু আন্দোলনের দ্বারা দাবি পূরণ হবে না, তখন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। জনগণকে তিনি নতুন কর্মসূচি দিলেন- ২-রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা বাংলায় হরতাল, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী

উদ্যান) জনসভা। শেখ মুজিবের ঘোষণা অনুযায়ী ২রা মার্চ ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও নিশ্চুপ ছিলেন না। হরতালের কর্মসূচিকে নস্যাৎ করার জন্য ২রা মার্চ রাত্রি পৌনে আটটায় শহরে কারফিউ জারি করলেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা কারফিউ অমান্য করল। সামরিক বাহিনী রাজশাহী, যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকার টাঙ্গী এলাকায় শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করলে বহু লোক হতাহত হল। বাংলাদেশের চতুর্দিকে তখন ভয়-ভীতি-সন্ত্রাসের পরিবেশ হলেও রাজনৈতিক ছড়া সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত নয়। যেমন-

এহিয়ারে(ইয়াহিয়া) ধর,

খুঁড়ির মধ্যে ভর।

খুঁড়ি গেল ভাইঙ্গা,

এহিয়া মরে কাইন্দা। [৮]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বিকেল ৩ টায় রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন;

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

যাইহোক ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য শেখ মুজিব ৩৫ টি বিধি জারি করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ঐ দিন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তাঁর সাথে আসেন তাঁর ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ। ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভে ইয়াহিয়া সংঘটিত সকল ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য আগ্রহ দেখান। কিন্তু আলোচনার গতি সন্তোষজনক নয় মনে করে ঐ দিন রাত্রে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কাখানকে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

সকল প্রকার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হবার পর ২৫ মার্চ তারিখে আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা না করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর দলবলসহ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। পালিয়ে যাবার প্রাক্কালে তিনি পাক হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে যান নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম গণহত্যার অভিযান। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকেও সে সময় ছড়ার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে-

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা,

বোয়াল মাছের দাড়ি।

টিক্কাখান ভিক্ষা করে,

বাংলাদেশের বাড়ি। ৯

অন্যত্র কোন কোন ছড়ায় 'খান' এর পরিবর্তে স্ত্রীর ভ্রাতা হিসেবে প্রচলিত সম্বোধনে সম্বোধন করা হয়েছে। উক্ত ছড়াটির অনুসরণে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথাও কোথাও 'বাংলাদেশের বাড়ি'-এর পরিবর্তে 'শেখ মুজিবের বাড়ি' বলা হয়েছে। যেমন-

ইলিশ মাছের ত্রিশ কাঁটা,

বোয়াল মাছের দাড়ি।

টিক্কাখান ভিক্ষা করে,

শেখ মুজিবের বাড়ি। ১০

৩ রা ডিসেম্বর বিকালে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর ও আগ্রার উপর অতর্কিত বিমান হামলা চালালে সেদিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪ ঠা ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে লড়তে থাকে। অবশ্য একই সঙ্গে ভারতকে পশ্চিম রণাঙ্গনেও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর যে সামান্য কটি বিমান ছিল তা ৬ ই ডিসেম্বরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে মিত্র বাহিনীর অগ্রগতির খবর পৌঁছতে থাকে ঢাকায়। সেই সাথে পৌঁছয় পাক বাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদ। ইস্টার্ন কমাণ্ডের অধিনায়ক এ. কে. নিয়াজী আরো জানতে পারেন যে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে সবকটি কামান মূল পাক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত পথগুলি এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। নিয়াজীও ঢাকার অন্যান্য পাক সমর নায়করা বুঝে নিয়েছে যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সে সময় ঢাকার দেওয়াল জুড়ে নিয়াজীকে নিয়ে আক্রমণাত্মক ছড়া রচিত হয়েছিল-

নিয়াজী রে নিয়াজী,

তোরে খামু পিঁয়াজি।

তোরে দিমু শিক্ষা,

বুড়ি গঙ্গায় ফিক্কা। ১১

তদানীন্তন বাংলা বেতারে শেখ মুজিবের জ্বালাময়ী ভাষণ ছড়াকারদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে গ্রাম বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে-

বীর বাঙালি অস্ত্র ধর,

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।[১২]

কিংবা- বীর বাঙালি অস্ত্র ধর,

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান,

আজিমপুর গোরস্থান।[১৩]

উক্ত রাজনৈতিক ছড়াগুলি 'echo of the past' হলেও কোন কোন সময় 'vigorous voice of the present' হিসেবেও ইতিহাসের মালমশলা প্রদান করতে পারে।

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিকেল ৪-২১ মিনিটে পাক হানাদার বাহিনীর প্রধান এ. কে. নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এইভাবে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের সর্বত্র তখন পাকিস্তানী মিলিটারির অত্যাচারের চিহ্ন। হাসপাতাল ভর্তি বুলেট বিদ্ধ বাঙালি। স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ছুটেছে রক্ত দেওয়ার জন্য। রাজপথে, মহল্লায় সরকারি ভবনে পাহারাদার আওয়ামী লীগের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। পাকিস্তানের পতাকা পুড়ে হয়েছে ছাই। এখন তাদের হাতে নতুন পতাকা। আর মুখে মুখে বাংলার জয়ধ্বনি-

জয় জয় জয় বাংলা

পদ্মা মেঘনা যমুনা

মুক্তি ধারার সীমানা

জয় জয় জয় বাংলা।[১৪]

৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন:

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও দেশের একচ্ছত্র নেতা ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বিশ্ব জনমতের প্রবল চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দিয়েই তাঁকে পাকিস্তান থেকে সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হয় লণ্ডনে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। লাখ লাখ উদ্বেগাকুল মানুষ বঙ্গবন্ধুকে এদিন ঢাকা বিমান বন্দরে তাঁকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। পরে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন সাত কোটি বাঙালির বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন থাকবে।

১১ জানুয়ারি বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম বাংলাদেশ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১২ জানুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরি রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। ১১ জন মন্ত্রীও এদিন শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর আইন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করেন। ৪ নভেম্বর সংবিধান জাতীয় পরিষদে গৃহীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর সংসদ সদস্যরা স্বাক্ষর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, থাকাটা স্বাভাবিক কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের কাণ্ডারি শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রথম মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়। ফলে এই নির্বাচনের আগে আওয়ামীলিগের বিরুদ্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ইস্যু ছিল না বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির। ফলে এই নির্বাচনে জনমত ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে। এই নির্বাচনে ৩০০ টি সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টি আসনে জয়ী হয়। ফল প্রকাশের পর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত রব-জলিলের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জামাদ) ভোটে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। অবশ্য এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক বাহিনীর অফিসারগণও কোন কোন স্থানে ভোট কারচুপি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এই নির্বাচনে কারচুপি না হলেও আওয়ামী লীগ অন্তত ২৮০ টি আসন অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হত। এই নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগের সমর্থনে কয়েকটি দেওয়াল লিখন ছিল এরকম-

আমার বন্ধু তোমার বন্ধু

বঙ্গ বন্ধু বঙ্গ বন্ধু (শেখ মুজিব)।[১৫]

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রলীগ'-এর পক্ষ থেকে লেখা সে সময়ের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেওয়াল লিখন হল-

জয় বাংলা জয় বাংলা

জয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

নেতা মোদের শেখ মুজিব। ১৬

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক দল সেনাবাহিনীর হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হন। আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ নতুন প্রেসিডেন্ট এবং মাহমুদউল্লাহ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথমে ১০ জন মন্ত্রীসহ ৬০ জন প্রতিমন্ত্রী, পরে আরও ৫ জন প্রতিমন্ত্রী বলতে গেলে নিহত শেখ মুজিবের লাশ মাড়িয়ে গিয়েই শপথ গ্রহণ করেন। দেশবাসী বিস্ময় হয়ে দেখেন এঁরা সবাই আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা ও সদস্যই। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালে সবথেকে তটস্থ মোসাহেব ছিলেন খোন্দাকার মোশতাক। পরবর্তীতে সেই মোশতাকই নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার ষড়যন্ত্রে। তাঁকে হত্যা করার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রপতি হলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ অপর ৪ সহযোগী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মন্সুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে। তার পর ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর তাঁর নির্দেশেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আবার হত্যা করেন এই চার জাতীয় নেতাকে। ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা খন্দকার মোশতাককে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়ে ছিলেন। মোশতাক ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর ঘোষণা করা হয়, প্রতিশ্রুত এই নির্বাচন আপাতত হচ্ছে না। এই ঘোষণার এক সপ্তাহ পরেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে বিচারপতি সায়মকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান উপপ্রধান থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, জাতীয় স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। এর ঠিক পাঁচমাস পর প্রেসিডেন্ট পদেও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেকে নিয়োগ করেন এবং বিচারপতি সায়মকে পদচ্যুত করা হয়। এই সময় সারাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও গ্রেফতার করা হয়। এমনকি ১৫ আগস্টের পর থেকেই একদিকে যেমন শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করা হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি রাজাকার ও পাকিস্তানপন্থী নেতাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হতে থাকে জেল থেকে। জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট পদে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরদিনই

এক সামরিক আদেশ বলে দেশের সংবিধান থেকে চারটি মূলনীতি ‘জাতীয়তাবাদ’, ‘সমাজতন্ত্র’, ‘গণতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বিলুপ্ত করে কার্যত এর মৌলিক চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটান।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান এক বেতার ভাষণে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তবে তাঁর উপর জনগণের আস্থা আছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি একটি গণভোটের আয়োজন করেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ‘গণভোট’। প্রদত্ত গণভোটের ৯৮.৮৮ শতাংশ জিয়ার পক্ষে পড়েছে বলে দাবি করা হয়। রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীফ্রন্ট গঠন করার ঘোষণা করেন এবং ৯ এপ্রিল জিয়া জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)-এর প্রধান হিসেবে যোগদান করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরাসরি তাঁর তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৭৮ সালের ৩ রা জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে বলা হয়, ১লা মে থেকে রাজনৈতিক সভা সমাবেশ করা যাবে।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন অনুষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ‘জাতীয়তাবাদী’ ফ্রন্টের প্রার্থী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন ‘গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটে’র প্রার্থী মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউর গনি ওসমানীকে। এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে জেনারেল ওসমানী কারচুপির অভিযোগ আনেন। প্রদত্ত ভোটের ৭৬.৭ শতাংশ পান জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল ওসমানী পান ২১.৭ শতাংশ ভোট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১লা সেপ্টম্বর জিয়াউর রহমান ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল’ (বি. এন. পি) গঠন করে এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জিয়াউর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালের পর থেকেই দশ দলীয় জোটের প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এই জোটের প্রধান শরিক ‘আওয়ামী লীগ’ দলের নেতৃত্বের হাল ধরতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার। কেবল বাংলাদেশ নয় এই উপমহাদেশের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতেও জোট রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন চার দলীয় ঐক্য জোট (বি.এন.পি) এখন আঠারো দলীয় জোটে এবং চোদ্দ দলীয় জোট এখন মহাজোটে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব জোট নিয়েও ছড়ার জন্ম হয়েছে- ১. চার দলীয় ঐক্য জোট

ভেঙে চুরে নৌকায় ওঠ। [১৭]

২. আর নয় চারদলীয় জোট

এবার সরকার গড়বে মহাজোট। [১৮]

৩. পাগল পাগলী বেঁধেছে জোট

নৌকা মার্কায় দিবে ভোট। [১৯]

তবে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র বার বার বিপন্ন হয়েছে, সে দেশের একাধিকবার সেনা অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন জারির ফলে। ১৯৮০ সালের ১৭ জুন তারিখে ১৯৭৫ সালের সেই একই হন্তারক গোষ্ঠী আবারো জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে অপচেষ্টা চালায় এবং তা ব্যর্থ হয়। ঠিক এক বছর পর ১৮৮১ সালের ৩১ মে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো হয় চট্টগ্রামে। রাষ্ট্রপতি জিয়া এই সময় চট্টগ্রাম সফরে ছিলেন। সে রাতে স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২রা জুন নিহত রাষ্ট্রপতির লাশ ঢাকায় আনা হলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। বস্তুতপক্ষে জীবিত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের তুলনায় মৃত জিয়া অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর আবার তড়িঘড়ি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এই নির্বাচনে বিচারপতি এম. এ. সাত্তার 'বি.এন.পি'র প্রার্থী হন। আর আওয়ামী লীগও একতা পার্টির ডঃ কামাল হোসেনকে প্রার্থী করে। নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ড: হোসেনের চেয়ে ৮৫ লাখ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাত্তারের তেমন যোগ্যতা না থাকলেও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নির্বাচনে। এছাড়া বিচারপতি সাত্তার বৃদ্ধ বয়সের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও মূলত তিনি ছিলেন দুর্বল চিত্তের অধিকারী। এই সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ইত্যাদি সঙ্কটজনক অবস্থার মুখে ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে বসেন। তাঁর ক্ষমতা দখলের এই নাটক ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের অনুকরণেই ঘটে। এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের(বি.এন.পি) নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করন।

এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসনের কারাগারে বন্দী হয়। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিণত হয় পুলিশি রাষ্ট্রে। এই পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সে সময় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। তবে বাংলাদেশের দুটি প্রধান ছাত্র সংগঠনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যথা- প্রথমত আওয়ামী ছাত্র

পরিষদ যেটি 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নামে পরিণত। আর দ্বিতীয়টি হল বি.এন.পির ছাত্র পরিষদ যেটি 'বাংলাদেশ ছাত্রদল' নামে পরিচিত। সে সময় ছাত্রলীগের স্লোগান ছিল-

১. আমরা সবাই মুজিব সেনা,
ভয় করি না বুলেট বোমা।[২০]

২. একটা গুলি চললে, হাজার গুলি চলবে।
একটা লাশ পড়লে, হাজার লাশ পড়বে।[২১]

৩. শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি
ছাত্রলীগের মূল নীতি।[২২]

অপর দিকে বি.এন.পি- র ছাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রদল' এর স্লোগান-

১. রুশ-ভারত-মার্কিন
ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।[২৩]

২. খালেদা জিয়ার বাহুবল
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।[২৪]

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ আমলের প্রথম সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক মহল বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৫ দলীয় জোট ভেঙে যায়। এর থেকে বের হয়ে পাঁচটি বামপন্থী দল নতুন জোট গঠন করে। ১৫ দলের ৮ টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ৭ টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিভক্তির ভেতরেও নির্বাচনে এরশাদের ভরাডুবি ঘটতে থাকে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল ভালো ফল করতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে এরশাদ রেডিও- টেলিভিশনে সরাসরি নির্বাচনী ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেন এবং পরে তাঁর জাতীয় পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দেখানো হলে বিরোধী দল তা প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ আমলে এই নির্বাচন 'মিডিয়াক্যুর' নির্বাচন বলে কুখ্যাতি লাভ করে।

এই ঘটনার পর সারাদেশে 'এরশাদ হঠাও' আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের গতি সঞ্চার করতে দেশের দুই নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা প্রথম যৌথ বৈঠকে বসলেন। ১৯৮৭ সালের ৯ নভেম্বর এই বৈঠকের পর এরশাদের পতন সময়ের

অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াল। এই ঘটনার পরের দিন ১০ নভেম্বর নূর হোসেন নামে এক অসম সাহসী যুবক- 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক'।[২৫]

এই স্লোগান বুকে ও পিঠে লিখে মিছিল করেন। এর ফলস্বরূপ এরশাদের পুলিশ তাকে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করে। স্বাভাবিকভাবে পরের দিন ১১ নভেম্বর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এরপর ১৯৯০ সালের ২০ শে নভেম্বর ৮ দল (আওয়ামী লীগ), ৭ দল (বি.এন.পি) ও ৫ দলের (বাম দলগুলি) যৌথ ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এতে এরশাদের পদত্যাগ প্রক্রিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা সানাউল হক নারু ও গোলাম ফারুকের গোপন আঁতাতে সরকারের পেটোয়া বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজত্ব কায়েম করে। ২৭ শে নভেম্বর তারা ডঃ শামসুল আলম মিলনকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়লে পুরো ঢাকা শহর গর্জে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬৯ সালে ছাত্রনেতা আরশাদের মৃত্যুর ফলে মহা-অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটলে যেমন আয়ুব খানের পতন ঘটে। ঠিক তেমনি ১৯৯০ সালে ড: মিলনের মৃত্যুর ফলে এরশাদের পতন আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অবশেষে ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে দীর্ঘ ৯ বছর পর বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৮২ সাল থেকে গেড়ে বসা স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। এরশাদকে অপমানজনকভাবে বিদায় নিতে হয়। ১৯৯০ সালের ৬ নভেম্বর এরশাদ বিরোধী সব কটি রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহবুদ্দিন আহমেদ শপথ নিলেন নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে।

১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের পূর্বে পূর্বতন শাসক দলের স্লোগান ছিল-

কথায় কথায় গদি ছাড়

গদি কি তোর বাপ দাদার।[২৬]

বিপক্ষে এরশাদ বিরোধী সবকটি রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল-

লড়াই লড়াই লড়াই চাই

লড়াই করে বাঁচতে চাই। [২৭]

জাতীয় সংসদের নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বি.এন.পি) ১৪০টি আসন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮ টি

আসন লাভ করে। তবে গণআন্দোলনে বিতাড়িত এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও এতে ৩৫ টি আসন লাভে সমর্থ হয়। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর ১৯৯১ সালের ৩রা মার্চ বেগম খালেদা জিয়া এই প্রথম আবার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও গৌরবের অধিকারী হন। আর বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে জাতীয় সংসদে আসন গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৯২ সালটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যার হোতা মৌলবাদী হন্তারকদের বিচার-কল্পে সূচিত আন্দোলন। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের দীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধানে ক্রমশ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান, তাদের হাতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক নিহত হওয়ার ঘটনা এবং স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে দুসমনি এই সবের প্রেক্ষাপটে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির তরফ থেকে সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি', ইত্যাদি। এই আন্দোলনে রাজাকার বিরোধী স্লোগান ছিল-

১. ক'তে কাদের মোল্লা

তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।

গ'তে গোলাম আজম

তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।

স'তে সাকা চৌধুরী

তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।[২৮]

২. জামাত শিবির রাজাকার

এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়।[২৯]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল দুটি দল, মূলত শাসক খালেদা জিয়ার বি এন পি ও শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচনে শাসক ও বিরোধী উভয় দলের পক্ষ থেকে প্রচুর দেওয়াল লিখন রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বি এন পির দেওয়াল লিখন-

১. ডানে কারা ধানের শিষ

বামে কারা ধানের শিষ

সামনে কারা ধানের শিষ

পিছনে কারা ধানের শিষ

যেদিকে দেখি ধানের শিষ।[৩০]

২. ঝিকির গাছার মাটি

খালেদা জিয়ার শক্ত ঘাঁটি।[৩১]

প্রথম ছড়াটিতে উল্লেখ্য 'ধানের শিষ' হল বি এন পির নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন। বিপক্ষে আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষের দেওয়াল লিখন-

১. শেখ হাসিনার সালাম নিন

নৌকা মার্কায় ভোট দিন।[৩২]

২. ভোট দিন, ভোট দিন

নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

ভোট চাই ভোটারের

দোয়া চাই সকলের।[৩৩]

উক্ত ছড়া দুটিতে উল্লেখ্য 'নৌকা' চিহ্ন হল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের আগে দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এই ধরনের রাজনৈতিক ছড়াগুলি রচনা করে থাকেন। মূলত এই ধরনের ছড়া রচনার উদ্দেশ্য হল নিজস্ব প্রতীক চিহ্ন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে জনপ্রিয় করে তোলা। পাশাপাশি সাধারণ ভোটারের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে রাজনৈতিক দলগুলি। বিভিন্ন দলের রচিত এই ধরনের কয়েকটি ছড়া, বিশেষ করে প্রতীক চিহ্ন নিয়ে রচিত ছড়াগুলি নিম্নে উল্লেখ করলাম-

১. দাদা-দাদীকে বলে যাই

হাতি মার্কায় ভোট চাই।

হাতি মার্কায় দিলে ভোট

শান্তি পাবে দেশের লোক।[৩৪]

২. আকাশে উড়ছে চিল

তালা মার্কায় মারেন সিল।[৩৫]

৩. আর নয় লগি বৈঠা

এবার হবে দাঁড়ি পাল্লা।[৩৬]

৪. আকাশে লক্ষ তারা

চাঁদ কিন্তু একটাইতো।[৩৭]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্নের পাশাপাশি দলীয় প্রার্থীকে নিয়েও নানা রকমের ছড়া পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ১৮ দলীয় প্রার্থী বুলবুল ও ১৪ দলীয় প্রার্থী লিটনকে নিয়ে তাঁর সমর্থকরা তৈরি করেছেন নিম্নলিখিত ছড়াগুলি-

১. ট্যাংরা মাছের তিনটি কাঁটা

লিটন ভাই বাপের বেটা।

গাছের ডালে জোড়া পক্ষী

লিটন ভাই বড়ই লক্ষী।[৩৮]

২. তু- তু- তু তুতু তারা

লিটন ভাই সবার সেরা।[৩৯]

৩. প্রার্থী মোদের বুলবুল

যেন একটা গোলাপ ফুল।[৪০]

৪. রাস্তা ঘাটে আলো না জ্বলে

গাছের মাথায় মরিচ ঝুলে।

পদ্মা নদীর দুই কূল

প্রার্থী মোদের বুলবুল।[৪১]

এছাড়া প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে এই ধরনের ছড়া অনেক আছে। তবে এই ধরনের প্রার্থী কেন্দ্রিক বা প্রার্থীর গুণগান করে রচিত ছড়ার ব্যবহার বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের ছড়া লক্ষ্য করা যায় তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। প্রার্থী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন- ১. চারিদিকে একই ধ্বনি

আনছার ভাইয়ের জয়ধ্বনি।

আনছার ভাই ভালো লোক

জয়ের মালা তারই হোক।[৪২]

২. তারেক রহমান বীরের বেশে

আসবে ফিরে বাংলাদেশে।[৪৩]

১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের শাসনভার পরিচালনা করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর জোট ও তাঁর জোট সরকার। হাসিনা এই পাঁচ বছরের সময়কালকে বাংলাদেশের 'স্বর্ণ যুগ' বলেছিলেন। এই সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দেওয়াল লিখন ছিল এ রকম- দশ টাকায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

দশ টাকায় চাল।

শায়েস্তা খান নয়রে এটা

শেখ হাসিনার কাল।[৪৪]

বিপক্ষে খালেদা জিয়ার দল বি এন পির দেওয়াল লিখনে ধরা পড়েছে শেখ হাসিনার সরকারের পাঁচ বছরের অপশাসনের কথা-

যত্র তত্র মাতাল হচ্ছে

মুখ ভর্তি বমি করছে

দেশ বলে কিছু আছে

আওয়ামী লীগ ভুলে গেছে।[৪৫]

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্বতন শাসক দল আওয়ামী লীগের পরাজয় ঘটে। ৩০০ টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬২ টি আসন লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। অপর দিকে বি এন পি- জামাত জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনে বেশ কিছু ব্যক্তি আক্রমণের ছড়া লক্ষ্য করা যায়। যথা-

হাসিনারে হাসিনা

তোর কোথায় নাচিনা

তোর বাপের কথায় নাইচ্যা

দেশেরে দিচ্ছি বেইচ্যা।৪৬

উক্ত ছড়াটির মধ্য দিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও তাঁর পিতা শেখ মুজিবর রহমানকে ব্যঙ্গ করে লিখিত হয়েছে। এই ছড়ার মধ্যে দিয়ে বি এন পির সুস্পষ্ট বক্তব্য হল বাবা মেয়ের কথা মত না নেচে তারা দেশকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। অপর আর একটি ছড়াতেও হাসিনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এভাবে-

চশমাওয়ালী বুবুজান

নৌকা চড়ে ভারত যান।৪৭

বিপক্ষে আওয়ামী লীগের দেওয়াল লিখন-

ভ্রু কাটা পামেলা

আর করিস না ঝামেলা।৪৮

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের দুই তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বেগম খালেদা জিয়া ও মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। দুজনেই সুন্দরী কিন্তু খালেদা জিয়া সর্বদা ভ্রু কেটে সেজে গুজে থাকেন তাই তাঁকে বলা হয় 'গোলাপী'। আর হাসিনা যেহেতু খুব ভালো বক্তৃতা দেন তাই তাঁকে বলা হয় 'আলাপী'। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই 'গোলাপী' ও 'আলাপী'কে নিয়ে রাজনৈতিক ছড়া তৈরি হয়েছে এভাবে (বি এন পির দেওয়াল লিখন)-

শুন বলি আলাপী

তোর মন খান জিলাপী।

কেবল কথার প্যাঁচ

ক' দেখি কি দিবি?[৪৯]

বিপক্ষে আওয়ামী লীগের দেওয়াল লিখন-

ক্যান্টনমেন্টের গোলাপী

আর কত কাল জ্বালাবি।[৫০]

বাংলাদেশের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ 'আলাপী' ও 'গোলাপী'কে আক্রমণ করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখনে ধরা পড়েছে ব্যঙ্গের চিত্র-

বলি একটি কথা শোন

গোলাপী- আলাপী যমজ বোন।[৫১]

আসলে 'গোলাপী' ও 'আলাপী' হল টাকার এপিঠ-ওপিঠ অর্থাৎ যমজ বোন বলে কটাক্ষ করা হয়েছে উক্ত ছড়াটিতে। তার কারণ দুটি দলেরই পাঁচ বছর করে শাসন কার্য দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের এবং সেই অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উক্ত ছড়াটিতে।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বি এন পির নেত্রী খালেদা জিয়া হাসিনা সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়েছিলেন। যা তাঁর দলের অনুগামীরা সমগ্র বাংলাদেশের দেওয়ালে দেওয়ালে রাঙিয়ে তুলেছিল এভাবে-

হটাও হাসিনা বাঁচাও দেশ

খালেদা জিয়ার নির্দেশ।[৫২]

বিপক্ষে শাসক দল আওয়ামী লীগের দেওয়াল লিখন-

শেখ হাসিনার সরকার

পুনরায় দরকার।[৫৩]

কিংবা - আল্লাহ্‌র আইন চাই

সৎ লোকের শাসন চাই।[৫৪]

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পুনরায় বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে। এই জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর(যুগান্তর: ০৪. ০১. ২০০৯) বলেছেন-

"জনগণ বি এন পি-জামায়াতে ইসলামীকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে। লাগামহীন ও বেপরোয়া দুর্নীতি বি এন পি- জামায়াত জোটের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। ...কিন্তু এক্ষেত্রে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, জনগণ ধর্মের সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছে। এ রায় দিতে গিয়ে তারা ধর্মব্যবসায়ী জামায়াতে ইসলামী ও সেই সঙ্গে অন্যান্য চুটকো ইসলামী সংগঠনকে বাতিল করেছে। তারা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে ধর্মের নামে রাজনীতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। কোন বর্তমানও নেই। বি এন পি-র শাস্তির বড় কারণও হল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তাদের এই গাঁটছড়া বাঁধা"।$_{৫৫}$

২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের রচিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ছড়াগুলি হল-

১. সন্ত্রাসহীন দেশ চাই

হাসিনাকে দরকার তাই।$_{৫৬}$

২. শেখ হাসিনার দুই নয়ন

বাংলাদেশের উন্নয়ন।$_{৫৭}$

৩. একটা স্বপ্ন একটা আশা একটাই দেশ

সবাই বলে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।$_{৫৮}$

প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ ভোট দেয় দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের আশায়। ভোটের সময় নেতারা নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন। জনগণের সকল চাহিদা তাঁরা মেটাবেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করার পর জনগণের কাছে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন আর দুর্নীতিতে মত্ত হয়ে ওঠেন। তবে রাজনৈতিকভাবে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। বাঙালি জাতি সবই পারে তাই তারা শপথ নিয়েছে আর কোন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হবে না। তাদের রচিত ছড়ায় সেই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে-

আর নয় দুর্নীতি

এবার হবে উন্নতি।$_{৫৯}$

ভোটাধিকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার প্রতিটি ভোটারের কর্তব্য। ভোটদানের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

সেখানে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সচেতনতামূলক দেওয়াল লিখন-

১. আমার ভোট আমি দেব
যাকে খুশি তাকে দেব।[৬০]

২. আমার ভোট আমি দেব
দেখে শুনে বুঝে দেব।[৬১]

দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটের মাধ্যমে যোগ্য লোক নির্বাচন করা অতীব জরুরি। কারণ একজন যোগ্য শাসকই পারেন সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে। তাই নিজের একটি ভোটকে অবহেলা না করে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ছড়াটিতে-

একটি ভোটের মূল্য আছে
ভোট দেবেন না কলা গাছে।[৬২]

এখানে 'কলাগাছ' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যবান ভোটটি নষ্ট করবেন না। সঠিকভাবে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে উক্ত ছড়াটিতে।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, নবম সংস্করণ,খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি- ২০১৪, পৃ. ৬৩০-৬৩০।

২. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ওমেহেদী হাসান, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদক- বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা- ২০১৪, পৃ. ৪০১।

৩. তদেব, পৃ. ৪০১-৪০২।

৪. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৯৯।

৫. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, নবম সংস্করণ,খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি- ২০১৪, পৃ. ৬৪২-৬৪৭।

৬. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০০।

৭. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০০।

৮. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০০।

৯. তদেব।

১০. ফোকলোর অধ্যয়ন, ডঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, অন্যনা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ২০১৫, পৃ. ৮৮।

১১. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০০।

১২. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০১।

১৩. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ওমেহেদী হাসান, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদক- বরুণকুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা- ২০১৪, পৃ. ৪০১।

১৪. বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান, বিশ্ব বিশ্বাস, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১০৭।

১৫. তথ্যসূত্রঃ নূসরত জাহান আভা, রাজশাহী বাংলাদেশ, ২৮ জুলাই- ২০১৭।

১৬. তথ্যসূত্রঃ মোঃ তারিক জোবায়েত, রাজশাহী বাংলাদেশ, ২৮ জুলাই- ২০১৭।

১৭. ফোকলোর অধ্যয়ন, ডঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, অন্যনা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ২০১৫, পৃ. ৮৮। ফোকলোর অধ্যয়ন, ডঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, অন্যনা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ২০১৫, পৃ. ৮৮।

১৯. তথ্যদাতাঃ হিমেল ইসহাক, শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট ভবন, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

২০. তথ্যদাতাঃ টগর মোঃ সালেহ, গ্রাম- আলিনগর, থানা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ, ২৯. ০৭. ২০১৭।

২১. তদেব।

২২. তদেব।

২৩. লোক-সাহিত্য(প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২০০।

২৪. তদেব।

২৫. হাজার বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও অ্যালবাম, ... পৃ. ১৭৩।

২৬. বাংলা ছড়ায় রাজনীতি, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৩৭০।

২৭. তদেব।

২৮. বাংলা ছড়ায় রাজনীতি, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৩৬৮।

২৯. তথ্যদাতাঃ টগর মোঃ সালেহ, গ্রাম- আলিনগর, থানা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ, ২৯. ০৭. ২০১৭।

৩০. তথ্যদাতাঃ রণি আহমেদ, শিক্ষার্থী ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

৩১. তদেব।

৩২. বাংলা ছড়ায় রাজনীতি, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৩৭০।

৩৩. তদেব।

৩৪. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০২।

৩৫. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৩।

৩৬. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭১।

৩৭. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৩।

৩৮. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৩।

৩৯. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭২।

৪০. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৩।

৪১. তদেব।

৪২. তথ্যদাতাঃ রণি আহমেদ, শিক্ষার্থী ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

৪৩. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০৩।

৪৪. তথ্যদাতাঃ অনামিকা সাহা (নূপুর), বিনোদপুর, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

৪৫. তথ্যদাতাঃ মোঃ তৌহিদুল হক EBA, Marketing, Rajshahi university, Netrakana, Mymenshinga, 28. 07. 2017।

৪৬. আলাপ-বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, ২০১২, পৃ. ৮৮।

৪৭. তথ্যদাতাঃ অনামিকা সাহা (নূপুর), বিনোদপুর, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

৪৮. বাংলা ছড়ায় রাজনীতি, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৩৭০।

৪৯. আলাপ-বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, ২০১২, পৃ. ৮৮।

৫০. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭২।

৫১. আলাপ-বিলাপ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কোরক, ২০১২, পৃ. ৮৮।

৫২. তথ্যদাতাঃ সীমা দাশ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ২৯. ০৭. ২০১৭।

৫৩. তদেব।

৫৪. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৩।

৫৫. কার দিন বদল হলো, বদরুদ্দীন উমর, আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০১০, পৃ. ৪৮।

৫৬. তথ্যদাতাঃ অনামিকা সাহা (নূপুর), বিনোদপুর, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২৮. ০৭. ২০১৭।

৫৭. তথ্যদাতাঃ সোহেল হোসেন, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ, ২৯. ০৭. ২০১৭।

৫৮. তথ্যদাতাঃ মোঃ তৌহিদুল হক EBA, Marketing, Rajshahi university, Netrakana, Mymenshinga, 28. 07. 2017।

৫৯. লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪।

৬০. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০২।

৬১. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০৩।

৬২. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বাংলা ছড়ার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন, মোঃ আব্দুল্লা আল মামুদ, মোঃ মেহেদী হাসান ও লুবনা ইয়াসমিন, বাংলা ছড়া পরিক্রমা, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪০২।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া

৬.১. ছন্দনৈপুণ্য

৬.২. কবিত্বগুণ

৬.৩. চিত্রকল্প

৬.৪. নান্দনিকতা

৬.১. ছন্দনৈপুণ্য:

মূলত ছন্দ হল শ্রুতিনির্ভর শিল্প এবং ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতির উপর সেই ভাষার ছন্দ গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলা ছন্দে যে সম্পদগত প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে তার মূলে রয়েছে প্রচ্ছন্ন আকারে বাংলা লোকমুখের ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক ছন্দের শক্তি। উচ্চারণরীতির দিক থেকে বাংলা ছন্দকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক. দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ।

খ. কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

গ. মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

দলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ কোন ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্টি নয়। বাংলায় এই স্বরবৃত্ত ছন্দ ডাক ও খনার বচন, ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া ইত্যাদিতে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথ একে 'প্রাকৃত ছন্দ' বা 'ছড়ার ছন্দ' বলেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে স্বরবৃত্ত ছন্দের বিকল্পে 'ছড়ার ছন্দ' বলার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন এই ছড়ার ছন্দ। দ্রুত লয়ের জন্য এই ছন্দে নৃত্যের ভাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে এই ছন্দ 'লাচাড়ী ছন্দ' নামে অভিহিত হত। মঙ্গলকাব্যে একটানা পয়ার ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনো কখনো যে 'লাচাড়ী ছন্দ' ব্যবহৃত তা মূলত এই ছড়ার ছন্দ। বৈষ্ণব কবি লোচন দাস এই ছন্দে তাঁর চৈতন্য ধামালি বা চৈতন্যলীলা লিখেছেন। অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র 'ধামালি' নামে এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে মধ্যযুগে এই ছন্দকে প্রকৃতভাবে জাতে তুলেছেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। তাঁর শাক্ত গীতে ব্যবহৃত মুখ্য ছন্দ হল লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

(মা) নিম খাওয়ালে/চিনি বলে/কথায় করে/ছলো (১)৪+৪+৪+২

(ওমা) মিধার লোভে/তিত মুখে/সারা দিনটা/গেল (২)৪+৪+৪+২

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে এক মাত্রার ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুই মাত্রার অতিপর্ব আছে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি পদে এই ছন্দকে ব্যবহার করেছেন খুব সুন্দরভাবে: উমার গলে/মণির হার ৪+৩

বুড়ার গলে/হারের ভার ৪+৩

কেমন করে/ওমা উমা ৪+৪

করবে বুড়ার/ঘর লো   ৪+২

হ্রস্বতম পর্বের ছন্দ হওয়ায় ও প্রতি পর্বে শ্বাসাঘাত থাকায় এই ছন্দে কবিতা পাঠের সময় বাগযন্ত্রে ক্ষিপ্রতা আসে, দ্রুত লয়ের সৃষ্টি হয়। লয়ের দ্রুততার জন্য একে এককালে ‘ধামালি ছন্দ’ বলা হত। ধামালি শব্দের অর্থ ‘ধাবমান’। দ্রুতগতির ব্যঞ্জনা, শব্দটির মধ্যেই আছে। প্রাচীন বাংলার ‘ধামালি ছন্দ’ কে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রাচীন রূপ বলা যায়।

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দকে Syllable ভিত্তিক মনে করেন। তাঁর মতে, একে ‘দলবৃত্ত’ বলাটাই বাঞ্ছনীয়। এই ছন্দ লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়ায় বহুল প্রচলিত। তাই এটি ছড়ার ছন্দ নামে সুপরিচিত। এই ছন্দে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার শব্দসম্পদ ও ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

> ‘প্রাকৃত এই বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সাধু ভাষায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব।... আবার পারসি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এক সারিতে বসিয়ে দিতে পারি... প্রাকৃত ভাষার এই উদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, একথা মনে রাখতে হবে’।[২]

গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকঐতিহ্যের প্রবহমান ধারায় যে গ্রামীণ সংস্কৃতির বীজটি ছিল তাকেই পরিশীলিত করে শাক্ত কবিতায় অষ্টাদশ শতকে ব্যবহার করলেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১২৯০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় ‘সিন্ধুদূত’ নামের একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত লেখকের নামহীন একটি প্রবন্ধে লৌকিক ছন্দের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সবশেষে এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছেঃ

'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দ অনুযায়ী হইবে'।

নামহীন এই লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে বাংলার আদিম ও স্বাভাবিক প্রাকৃত ছন্দের স্বরূপ মর্মোদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারই ফলশ্রুতি এই ধরনের প্রবন্ধ। এই ভাবনাকে তিনি দীর্ঘদিন লালন করেছেন; 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'সেকাল' কবিতায় 'ছড়ার ছন্দে'র ব্যবহার করেছেন কবিঃ

আমি যদি/জন্ম নিতেম 8+8

কালিদাসের/কালে 8+২

বন্দী হতেম/না জানি কোন 8+8

মালবিকার/জালে 8+২

কেবল 'ক্ষণিকা' নয় তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত 'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থ অবধি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে দলবৃত্ত ছন্দকে আশ্রয় করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যেতে পারেঃ

ধরার বক্ষ/ছিড়িয়া চলুক 8+8

বিজ্ঞানী হাড়/গিলা 8+২

রক্তসিক্ত/লুব্ধ নখর 8+8

একদিন হবে/ঢিলা। 8+২ (নবজাতক)

কবি সত্যেন্দ্রনাথকে বলা হয় 'ছন্দের যাদুকর'। বাংলা কাব্যে তিনি যত রকমের ছন্দ প্রয়োগ করেছেন, আর কোন কবির দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। তিনি 'ছন্দ সরস্বতী' নামে ছন্দ-বিচার সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দকে বলেছেন 'বাংলা ভাষার প্রাণপাখি'। তিনি এই ছন্দের নাম দিয়েছেন 'শব্দ-পাপড়ি গোনা ছন্দ' ।

বহু কবি এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক যুগে লৌকিক দলবৃত্তের ব্যবহার, ঈশ্বরগুপ্ত থেকে প্রায় প্রত্যেক কবি কিছু কিছু করেছেন। রবীন্দ্র সমকালীন ও পরবর্তী শিশু সাহিত্যিকরা তাঁদের ছড়া ও কবিতায় দলবৃত্তকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচীন ছড়ার ঢঙে প্রয়োজনমত নমনীয়তাও দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

ক. ওই আমাদের/ পাগলা জগাই, ৪+৪

নিত্য হেথায়/ আসে, ৪+২

আপন মনে/ গুণ গুণিয়ে ৪+৪

/মুচকি হাসি/ হাসে। ৪+২

-সুকুমার রায়

খ. মুটকু মাইতি/ বাঁটকুল রায় ৪+৩

ক্রুদ্ধ হয়ে/ যুদ্ধে যায় ৪+৩

বেঁটে খাটো/ নিটপিটে পায় ৪+৪

ছেৎরে চলে/ কেৎরে চায়। ৪+৩

-কাজী নজরুল ইসলাম

গ. তেলের শিশি/ভাঙল বলে ৪+৪

খুকুর পরে/রাগ করো ৪+৩

তোমরা যে সব/বুড়ো খোকা ৪+৪

ভারত ভেঙে/ ভাগ করো! ৪+৩ (অন্নদাশঙ্কর রায়)

সাহিত্যের অভিজাত দরবারে এই ছন্দ প্রচলিত ছিল না। বিশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কবিরা এই ছন্দকে কৌলীন্য দিয়েছেন। দলবৃত্তে প্রবহমানতা সৃষ্টির পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল সফল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘পলাতকা’ ও

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যটি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-যুগেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য' কাব্যে নতুন সংহত দলবৃত্তের পরীক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবির কাব্য সৃষ্টিতে দলবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তা অনুসৃত হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শ্রীজাতের কবিতায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি রাজনৈতিক ছড়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

১. মঞ্চে উঠে/ হাত পা ছুঁড়ে/ বাজ বিদ্যুৎ চম:কাও 8+8+8+১

হুঁশ থাকেনা/ ঘণ্টা-মিনিট/ কিংবা শ্রোতার/ সংখ্যা 8+8+8+২

চোখের জলে/ ভিজল গারদ! 8+8

পরের দুঃখে/ এমন দরদ 8+8+

যৎসামান্য/ কমতে পারে/ একটু যদি/ কম খাও। 8+8+8+২

-'সব কিছুতেই খেলনা হয়'(১৯৮৭): শঙ্খ ঘোষ

২. সোনার ধানের/ সিংহাসনে 8+8

কবে বসবে/ রাখাল 8+২

কবে সুখের/ বাণ ডাকবে 8+8

কবে হবে/ সকাল 8+২

-'পারুল বোন': সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৩. বিপ্লব হোক দী:র্ঘজীবী 8+৩

কিন্তু এখন/ শান্তি শান্তি! 8+8

প্রেতের মত/ ধুঁকছে মিছিল 8+8

উড়ছে পায়রা/ নধরকান্তি 8+8

-'লাল টুকটুকে নিশান ছিল': বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪. যা লেবে তা/ ছে আনা ৪+৩

চীনা মার্কিন/ লে আনা ৪+৩

আংলা বাংলা/ করতে সাফ ৪+৩

দে দুশ্মন ঐ/ পগার লাফ... ৪+৩

-'যুদ্ধের ট্রামপেট': শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

৫. দিদি এখন/ চিলে কোঠায় ৪+৪

কাঁদতে কাঁদতে/ ভাঙা ঝোপড়া ৪+৪

প্রেমের কথা/ লিখতে গেলেই ৪+৪

সামনে দাঁড়ান/ প্রেম চোপড়া ৪+৩

-'দিদির প্রেমিক': মল্লিকা সেনগুপ্ত

৬. হে মোগাম্বো/ এবার থামবো/ কাঁচা কাব্যে/ বুনোট কম ৪+৪+৪+৩

বাকি গল্প/ অল্প স্বল্প/ ব্যাবিলন বা/ হরপ্পার ৪+৪+৪+৩

-'মিঃ ইণ্ডিয়া যা বলেছিল': শ্রীজাত

আসলে এই ছন্দ বাঙালির, বাংলার একেবারে নিজস্ব ছন্দ, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশের স্পর্শরহিত নানান লৌকিক উৎস এর প্রাণ। এই ছন্দই পরম্পরায় বাহিত হয়ে শক্তিশালী করেছে পরবর্তীকালের কবিতার ছন্দের একটি ধারাকে। তাই আধুনিক পর্বে রচিত যে সৃজিত দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলি দেখি তার পূর্ব উৎস লৌকিক ছন্দই। অনুরূপভাবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোক আঙ্গিকের ছন্দ গ্রহণ করলেও শব্দচয়ন আধুনিক। নিম্নে রাজনৈতিক ছড়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

১. চিনের চিহ্ন/ কাস্তে হাতুড়ি ৪+৪

পাকিস্তানের তারা ৪+২

	এখনো কি/ বলতে হবে	৪+৪
	দেশের শত্রু/ কারা ?	৪+২

(১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনী ছড়ায়। উক্ত ছড়াটি তৎকালীন কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন।)

২.	গরীব ছেলে/ গরীব রবে	৪+৪
	চাষির ছেলে/ চাষা।	৪+২
	নিজের ছেলে/ বড় হবে	৪+৪
	জ্যোতিবাবুর/ আশা	৪+২

(১৯৮৫ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন)

৩.	এ তুমি কেমন তুমি	৪+৩
	চুরির টাকায়/ ফূর্তি কর,	৪+৪
	এ কেমন কা:ণ্ড তোমার	৪+৩
	চোরের জন্য/ মিছিল কর।	৪+৪

(২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দল তৃণমূলের সৎ ইমেজকে ব্যঙ্গ করে বামফ্রন্টের ছাত্র সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই-এর দেওয়াল লিখন)

৪.	নিয়াজিরে/ নিয়াজি	৪+৪
	তোরে খামু/ পিঁয়াজি	৪+৪
	তোরে দিমু/ শিক্ষা	৪+২
	বুড়ি গঙ্গায়/ ফিক্কা।	৪+২

(বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত ছড়া)

উক্ত ছড়াগুলি অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক। মূলত এই ধরনের দেওয়াল লিখনের ছড়াগুলির স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না, ব্যক্তি নামের পরিবর্তে গুরুত্ব পায় দলের নাম। কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মীদের দ্বারা এই সকল ছড়ার সৃষ্টি। এই সকল ছড়াকারগণের বেশিরভাগই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক নন কিন্তু তাদের শব্দচয়ন ও ছন্দনৈপুণ্য কোন অংশে কম না।

৬.২. কবিত্বগুণ:

ছড়াগুলিতে কবিত্বের ভূমিকা কতখানি সেই প্রসঙ্গে আসার আগে ছড়া বলতে ঠিক কি বুঝি তা আলোচনা দরকার। ছড়ার উদ্ভব ইতিহাস আমাদের কারোরই বোধ হয় সঠিকভাবে জানা নেই। কে কবে কখন এই ছড়ার উৎপত্তি ঘটিয়েছে তার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, মূলত শিশুর ভালোলাগা, আনন্দদান, শিশুর মনে কৌতুহল সৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসা ও জানবার ইচ্ছা ইত্যাদির বিকাশ ঘটানোর মানসিকতা থেকেই ছড়ার উৎপত্তি। যদিও শিশু মনের তাগিদে ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। ছড়া মূলত শিশু সাহিত্যের প্রাচীনরূপ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ছড়া এখন আর শুধু শিশুকেন্দ্রিক নয় তার মধ্যে অনেক বিবর্তন ধরা পড়েছে।এই বিবর্তনের সূত্র ধরে ছড়ার বিন্যাসও বিস্তৃত হয়েছে। কাজেই ছড়া বলতেই সব সময়েই শিশুসাহিত্যের সীমানায় তাদের আবদ্ধ রাখা যথাযথ নয়। শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত ছড়াগুলির মধ্যে যতখানি ধ্বনি সৌষম্য, শব্দঝঙ্কার চিত্রধর্মিতা রয়েছে ততখানি ভাবব্যঞ্জনার স্পর্শ নেই। ছড়ার রচয়িতা অজ্ঞাতনামা, দেশ-কালে ছড়ার ভাষা ও বিষয়ের বিবর্তন ঘটেছে, তবুও ছড়া কিন্তু তার গৌরব হারায় নি; আধুনিক কলে ছাঁটা সভ্যতার অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও ছড়ার সমাদর এখনও যে রয়ে গেল, তার মুখ্য কারণ এর কাব্যরস। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: "আমাদের ভাষা এবং সমাজ ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল"।[৩]

এই প্রসঙ্গে উঠে আসে কবিত্বের কথা। এমন কথা অনেকেই বলেন যে, বাংলা ছড়ায় কবিত্বের স্পর্শ কতখানি আছে ? কেননা ছড়ামাত্রই শিশু মনোরঞ্জনের ব্যাপার। যেখানে শব্দ মাধুর্য, ছন্দের দোলা যতখানি অবলীলায় স্থান পায় ততখানি কাব্যিক ব্যঞ্জনার স্থান নেই। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে কোন কোন কাব্যগুণ থাকলে তা যথার্থ কাব্য হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আলংকারিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল:

১. 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'- বামন (নবম শতক)। রীতি মানে লেখার স্টাইল, ছড়ার এই রীতির ব্যাপারটা লোকছড়ার ক্ষেত্রে তেমন প্রাধান্য পায়নি। কেননা লোকছড়ার সৃষ্টি লেখার মধ্য দিয়ে নয়, মৌখিক সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যিক ছড়ার ক্ষেত্রে স্টাইল প্রাধান্য লাভ করেছে।

২. 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'- বামন। অর্থাৎ অলংকার মাধুর্যই প্রকৃত কাব্যত্ব। কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টিতে অলঙ্কারের ভূমিকা আছে কিনা সেটাই সব নয়। তাহলে? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল-

৩. 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'- অর্থাৎ ধ্বনিই হল কাব্যের আত্মা, যা পাঠ করলে আমাদের মনে রস বা আনন্দের সঞ্চার হয়।

অর্থাৎ ছন্দমাধুর্য, অলংকার সৌন্দর্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে অতিরিক্ত এক আস্বাদনই হল কাব্যত্ব। সংস্কৃত আলংকারিকেরা যাকে বলেন ব্যঞ্জনা যা রমণীদেহের লাবণ্যের মত দেহসৌন্দর্য, অলংকার ইত্যাদির অতিরিক্ত এক মনোমুগ্ধকর অনুভব।

সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যত্বের এই চুল-চেরা বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কাব্য-সাহিত্যের মাপকাঠিতে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে, শব্দ মাধুর্য, ছন্দ প্রয়োগ, অলংকার সুষমা, ধ্বনি ঝংকার সব মিলিয়ে এক আস্বাদ্যময় শ্রুতিসুখকর রচনা হল ছড়া। স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা যদি কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, আধুনিক যুগের কাব্যরসিক পাঠক যদি তাতে কবিত্বের স্পর্শ পায়, তবে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে কবিত্বের সন্ধান করা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজের মৌখিক ধারার প্রবহমান লৌকিক ছড়ার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনের ভাব, ভাষা, রূপ ও ছন্দে প্রভাবিত হয়ে আধুনিককালে কবি ও সাহিত্যিকগণ যেসব ছড়া রচনা করেছে সেগুলি হল সাহিত্যিক ছড়া। সাহিত্যিক ছড়া রচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও বৈদগ্ধের ভূমিকা কিছু পরিমাণ থাকলেও সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে যে একটা শৈশবোচিত প্রকৃতি আছে সেটাই অনেক বেশি দায়ী। বাঙালি শিশু মাতৃদুগ্ধের সহিত মায়ের মুখের নানা প্রকার ছড়া কবিতার যে রস পান করিয়া থাকে, তাহার সংস্কার সে কোন দিনই ভুলতে পারে না। দোলনার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার ছন্দের যে দোল তাহার রক্তের মধ্যে জাগিয়া যায়, তাহার সংস্কারকে ভুলিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সাহিত্যিক ছড়ার জন্ম সম্ভব হয়।

লোক ছড়ায় অসংলগ্ন চিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও রাজনৈতিক ছড়ায় তা দেখা যায় না। এছাড়া রাজনৈতিক ছড়ায় নাটকীয়তা এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের একটি ছড়ার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা হলঃ

বললে রাজা, মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ ?

মন্ত্রী বলে, সেন্ট দিচ্ছি-গন্ধ তো নয় মন্দ!

রাজা বলেন, মন্দ ভালো দেখুক শুঁকে বদ্যি,

বদ্যি বলে, আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।

রাজা হাঁকেন বোলাও তবে, রাম নারায়ণ পাত্র;

পাত্র বলে, নস্যি নিলাম এক্ষুনি এই মাত্র।

'গন্ধবিচার': সুকুমার রায়।

অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত অপর একটি রাজনৈতিক ছড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

প্রথম পক্ষ(কংগ্রেস): চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

কদম তলায় কে ?

প্রমোদ নাচে কেষ্ট নাচে

জ্যোতি বসুর বে।

দ্বিতীয় পক্ষ(সি পি আই এম): ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস,

ঠিক বলেছিস ভাই।

১১ মার্চ ইন্দিরাকে

সাজিয়ে আনা চাই।

উক্ত ছড়াদুটি (পক্ষে-বিপক্ষে) ১১ মার্চ ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে রচিত হয়। সে সময় কলকাতার দেওয়াল জুড়ে এই নাটকীয়তা চরমে পৌঁছয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা লিখিত ছড়ার সৃষ্টি কর্তাদের মননে অনিবার্যভাবে সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতার প্রভাব বিদ্যমান তা থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যে ও সংস্কারের লৌকিক ধারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সাহিত্যিক ছড়ায় ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের কটুরস মিশিয়ে সমাজের কথা, রাজনীতির কথা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের মাত্রা ও ভাঙা গড়ার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশন করে চলেছেন। এমনিভাবে সাহিত্যিক ছড়া হয়তো অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনায় প্রয়াসী হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছড়ার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় কীভাবে তিনি রূপকথার লৌকিক আমেজ বজায় রেখেও রাজতন্ত্রের রূপান্তরের অনিবার্য রাজনৈতিক সচেতনতাকে বিদ্রুপ সহকারে পরিবেশন করেছেন:

এক যে ছিল রাজা-
রাজত্বটা মস্ত
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্টে
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।...

সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁৎকে
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ রয়েছে আঁটকে।[৪]

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধি ভোটে হারার পর জনতা পার্টি জোট সরকার গড়ে। প্রধানমন্ত্রী হলেন মোরারজি দেশাই, কিন্তু জোট সঙ্গীদের সমর্থনের অভাবে মোরারজি পদত্যাগ করলে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরাজি পুনরায় নির্বাচিত হলেন। মাত্র আড়াই-তিন বছরের ব্যবধানে ইন্দিরা গান্ধির পুনরুত্থানের নেপথ্যে ছিলেন তার ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধি। ইন্দিরার এই জয়কে কটাক্ষ করে সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকগানের আঙ্গিকে বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন-

বড় লোকের বেটিলো

সাদা কালো চুল।

বাপের কোটে গোঁজা ছিল,

লাল গোলাপ ফুল।

সেই বেটির বেটালো,

পাতলা পাতলা চুল।

দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল,

হলুদ সরষে ফুল।[৫]

দেওয়ালের পরিসর স্বল্প তাই রাজনৈতিক ছড়া আকারে ছোট হয়ে থাকে। এই সকল ছড়াতে কল্পনা বা আবেগের কোন স্থান নেই, এখানে আছে কঠোর বাস্তবতা। রাজনৈতিক ছড়ায় ব্যবহৃত ভাব বা অর্থের মেলবন্ধন হয়ত ছড়ায় যথাযথ পাওয়া সম্ভব হয় না, তবে শব্দগুচ্ছে ব্যবহৃত ঝঙ্কারবহুল অনুপ্রাস যেন কবিত্বেরই একটি দিককে স্পর্শ করে:

ক. লড়াই লড়াই লড়াই চাই

লড়াই করে বাঁচতে চাই।

খ. ভয় ভুক আর ভ্রষ্টাচার

মূল্যবৃদ্ধি বার বার

জন জন করে পুকার

চাই একবার বাম সরকার।

গ. হাত হাতুড়ি পদ্ম ভুলে

ভোট দিন জোড়া ফুলে।

উদ্ধৃত ছড়াগুলি থেকে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, প্রাঞ্জল ভাষা, অন্ত্যমিল, ধ্বনিঝংকার ও অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহার ছড়াগুলির কাব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে।

স্পষ্টত বলা যায় লোকছড়ায় কবিত্বের উদাহরণ খুব সামান্য পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ছড়া রচনা করতে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে বাস্তবের স্পর্শ থাকাটাও জরুরি। শিশু মনোরঞ্জনের জন্য যে সকল ছড়া সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কবিত্বের ব্যাপারটি গৌণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনৈতিক ছড়ায় থাকে কঠিন বাস্তবতার চিত্র, যেখানে সমাজ ও ইতিহাসের নানা ঘটনা অত্যন্ত সুচারুভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এগুলি সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় দেওয়ালের স্বল্প পরিসরে রচিত হয়, যা রাজনীতি সচেতন মানুষের মনে স্থায়িত্ব লাভ করে।

৬.৩. চিত্রকল্পের ব্যবহার:

'চিত্রকল্প' কথাটিকে আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য 'Imagery' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্য এবং নন্দনতত্ত্বে 'Image' এবং 'Imagery' শব্দদুটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। Ezra Pound বলেছেন: "An image is that which presents and intellectual and emotional complex in an instant of time." পাউণ্ড চিত্রকল্পের মধ্যে দেখেছেন, কবির সৃজনক্রিয়ার তাৎক্ষণিক মুহূর্তে বোধ ও আবেগের এক জটিল যৌগ। সে হল কবির জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার পরতে পরতে সঞ্চিত নানা চিত্রল উপাদানের বাঙ্ময় প্রকাশ।

'Princeton Encyclopaedia' গ্রন্থে লেখা হয়েছে: "More Specifically, in literary usage imagery refers to images produced in the mind by language, whose words and statements may refer either to experiences wich could produce physical perceptions or to the sense impressions themselves" এর তাৎপর্য- চিত্রকল্প ভাষারচিত মানসচিত্র। এর শব্দ আর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত উপলব্ধি, অথবা ইন্দ্রয়জ ধারণা, এ জন্য কবির চিন্তার ছবি আঁকে চিত্রকল্প, তাকে উজ্জ্বল করে তোলে আর অলংকারে (রূপকে অথবা অতিশয়োক্তিতে) সাজায়। তখন বাস্তবের অভিজ্ঞতালোক আর কবির স্মৃতিলোক এক বিন্দুতে মিলে যায়।

কবিকল্পনার রূপময় জগৎ সৃষ্টির উপাদান যে চিত্রকল্প তাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, Premordial or Archetypal Imagery বা প্রত্নচিত্রকল্প। দ্বিতীয়ত, 'Sensuous Imagery' বা ইন্দ্রিয়বেদনময়। আর তৃতীয়ত, 'Imagery of Synesthesia' বা ইন্দ্রিয় সমন্বয়।[৬]

কাব্যসাহিত্যের ব্যঞ্জনা হল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হল বাংলা রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত এই সকল ছড়ায় মূলত তাৎক্ষণিকতাকে তুলে ধরা হয়। তাই এই ধরনের ছড়াগুলিতে পাশ্চাত্য Imagery-র আদর্শ এ স্বরূপের সঙ্গে সবটা মেলানো যায় না। তবে এদের চিত্রকল্পনায় যে সৌন্দর্য আছে তা সাধারণভাবে Imagery বা চিত্রকল্পই রচনা করেছে।

বাংলা লৌকিক ছড়ায় কখনো কখনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা পাত্র-পাত্রী চিত্রকল্প রচনা করেছে। যেমন এই সুপরিচিত ছড়াটিতে-

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।।

১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র থেকে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গীরা, 'চৌথ' বা রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায় করার জন্য বাংলায় অভিযান করে। তারা চৌথ আদায় করা ছাড়াও স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। বর্গীর অত্যাচারের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি আলোচ্য ছড়াটির চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে।

অনুরূপ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম গণহত্যার অভিযান। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকেও ছড়ার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম খল চরিত্রকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ইলিশ মাছের ত্রিশ কাঁটা

বোয়াল মাছের দাড়ি

টিক্কা খান ভিক্ষা করে

শেখ মুজিবের বাড়ি।

১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ অকংগ্রেসী ও যুক্তফ্রন্ট নামাঙ্কিত কোয়ালিশন সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একটানা কুড়ি বছরের শাসনে ছেদ পড়ে। বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন 'হাত' হলেও সে সময় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'জোড়া বলদ' । আর এই প্রতীক চিহ্ন 'জোড়া বলদ'-এর প্রশংসা ও বিরুদ্ধ দল যুক্তফ্রন্টের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে পক্ষে-বিপক্ষে রচিত দুটি ছড়ায়- জোড়া বলদ টানছে মই,

উড়কি ধানের মুড়কি খই।

জোড়া বলদ করছে চাষ,

দ্বিগুণ ফসল বারোমাস।

-কংগ্রেস

বিপক্ষে- জোড়া বলদ মারছে লাথ,

গরিবের নাই পেটে ভাত।

কোথায় দুধ কোথায় দই,

গাছে তুলে কাড়ছে মই।

-যুক্তফ্রন্ট

১৯৬২ সালে চীন ভারতকে আক্রমণ করলে দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। এই সময় কংগ্রেসীরা বামেদের অবস্থানকে কটাক্ষ করে ছড়া লিখলেন- চিনের চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি

পাকিস্তানের তারা,

চিনের মন্ত্রে দীক্ষা যাদের

তারাই সর্বহারা।

কিংবা- চিনের চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি

পাকিস্তানের তারা,

এখনও কি বলতে হবে

দেশের শত্রু কারা?

এখানে ছড়াকারের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। ভারতের দুই প্রতিবেশীর মধ্যে চিরশত্রু পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার 'তারা' ও চিনের শাসক কমিউনিস্ট পার্টির চিহ্ন 'কাস্তে হাতুড়ি'-র মধ্যে তৎকালীন ভারতের প্রধান বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক চিহ্নের মধ্যে মিল থাকায়

শাসক কংগ্রেসের থেকে এই ধরনের আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল, যা উক্ত ছড়া দুটিতে খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

সে অর্থে ছড়া কোন গ্রন্থিবদ্ধ রচনা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যমুখী। শিশুকে ভোলানোও যেমন সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে, তেমনি খেলায় ছন্দ আনার জন্যও ছড়ার আদর। আবার নারীর ব্রত পালনের অনুষঙ্গে ছড়ার প্রয়োজন সংসারের কল্যাণ কামনায়, তেমনি ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি জনগণকে রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক দিক থেকে সচেতন করার জন্য রচনা করেন রাজনৈতিক ছড়া। ছড়াগুলি সাময়িক প্রতিভাস, সেই অর্থে দীর্ঘ মেয়াদী কোন অনুরণন নেই, নেই কোন দীর্ঘ প্রভাব। ভাবের খণ্ডতাও যেমন ছড়ার আরেক বৈশিষ্ট্য, স্বল্পমেয়াদী অনুকরণও তেমনি ছড়ার আরেক বৈশিষ্ট্য। নেই কোন ভাবের প্রসারতা, আছে খণ্ড খণ্ড চিত্র যা রঙের মাধুর্যে রঙিন, বর্ণময়। এ যেন অনেকটা কোলাজের মতো, ভাবের ধারাবাহিকতা না থাকলেও আছে অন্তর্লীন এক সংঘবদ্ধতা যা অস্পষ্ট অথচ প্রাঞ্জল, অনেক দিনের চেনা কিছু খণ্ড ছবি, মনকে দোলা দেয়, স্মৃতির পাতায় মুহূর্তের মর্মর, তারপর যেন সবকিছুই স্পষ্ট, প্রাঞ্জল। ছড়ায় ছবির কোলাজ কেমন করে গড়ে ওঠে তার একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘গিন্নী বলেন’ ছড়াটি থেকে:

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি

সকলের মূলে কমিউনিস্টি।

মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি

গোড়ায় কে তার ? কমিউনিস্টি।

পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি

তলে তলে কেটা ? কমিউনিস্টি।

কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি

নিয়ে এল প্লেগ কমিউনিস্টি। ...

রাজ্যের সকল অনিষ্টের মূলে কমিউনিস্টরা আছে, এমন দাবি যে অমূলক তা স্পষ্ট করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। ছোট ছোট ঘটনার খণ্ড ছবি তুলে ধরেছেন খুব সুন্দরভাবে, মুর্শিদাবাদে অনাবৃষ্টি বা খরা এবং পাবনার অতিবৃষ্টি বা বন্যা পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রকৃতি নয় কমিউনিস্ট পার্টি। আবার 'প্লেগ' মহামারীর জন্যও দায়ী করা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিকে। অসংলগ্ন কয়েকটি ঘটনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে ছড়াকার দেখিয়েছেন আপাত খণ্ড খণ্ড ছবির কোলাজ তৈরি করে এক বিমূর্ত আবহ। যদিও ইঙ্গিত থাকে এক সমগ্রতায়, অনেকটা অস্পষ্ট অথচ মনে হয় বড় স্পষ্ট।

২০০৯ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূলে 'আয়লা' নামক বিধ্বংসী ঘূর্ণীঝড়ে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি থেকে শুরু করে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। চাষের জমি, ঘর-বাড়িরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে অনুরূপ আর একটি সামুদ্রিক ঝড় 'লায়লা' বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে, ফলস্বরূপ সেখানেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এই দুটি ভয়াবহ ঝড়ের তাণ্ডবে সে সময় দুই বাংলার উপকূলবর্তী মানুষের জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট করে দেয়। এই ভয়াবহ ঝড়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূলের রচিত দেওয়াল লিখনে। যেমন-

আয়লা নয়, লায়লা নয়

এবার এসেছে মমতা।

পালা বুদ্ধ, পালা বিমান

আর পাবি না ক্ষমতা।

রাজনৈতিক ছড়ার বিবিধ চিত্রকল্প আমরা দেখলাম। এই শ্রেণীর ছড়ায় Emotion বা আবেগের স্থান নেই। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিত্রকল্পগুলিতে Intellect বা বোধির বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। তবে তাৎক্ষণিক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের ছড়া রচিত হওয়ার কারণে তা জনগণের মনে সাময়িক প্রভাব ফেললেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে না।

৬.৪. নান্দনিকতা:

মানুষ তার জীবনে কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্র-গৃহের সংস্থানেই তুষ্ট থাকতে পারে না, সে চায় আর অতিরিক্ত কিছুর মধ্য দিয়ে অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে। সৌন্দর্য আস্বাদনই হলো সেই মাধ্যম। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যখন কমবেশী সব মানুষই ব্যস্ত, উপযোগিতার গোলক ধাঁধায় সকলেই ঘুরছে তখন যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের মন হয়ে ওঠে সুন্দরের অভিসারী। সৌন্দর্যের কিছু বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ অবশ্য বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। যেমন 'নন্দনতত্ত্ব', 'শিল্পতত্ত্ব', 'Aesthetics' প্রভৃতি।

Dr. Bosanquet তাঁর 'A History of Aesthetics' গ্রন্থে তাই বলেছেন 'There is no definition of beauty Which Canbe Said to have met with universal acceptance.' যে অনির্দেশ্য গুণের জন্য কোন কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে তাকে ঘিরেই তাত্ত্বিকরা গড়ে তুলেছেন নানা মতবাদ। যেমন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নিজের মত করে সৌন্দর্যতত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বামনের মতে অলংকার ও সৌন্দর্য অভিন্ন, আবার বহুকাল পর মার্কস সৌন্দর্যতত্ত্বের যে ধারণা গড়ে তোলেন, সে ধারণা একান্তভাবেই হয়ে উঠেছে সমাজ তথা বাস্তবজীবন সম্পৃক্ত। তাঁর মতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা সমাজ জীবন থেকেই এসেছে। মার্কস বলেছেন পারিপার্শ্বিক জগতে, জীবন ও শিল্পে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষ লাভ করেছে কর্মের মধ্যে দিয়েই। সুতরাং বাঁচার তাগিদে সৌন্দর্যচেতনা এ দুটি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ব্যাপার।[৭]

পরিশীলিত সাহিত্যই হোক অথবা লোকসাহিত্যই হোক যে কোন শ্রেণীর সাহিত্যেই দুটি দিক থাকে। একটি তার বিষয়গত দিক বা Content এবং আর একটি তার রূপগত দিক বা form, সাহিত্যে এই দুটি দিককে ঘিরেই নান্দনিকতার অন্বেষণ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন সাহিত্যের বিষয়গত সৌন্দর্য আছে, কিন্তু রূপগত সৌন্দর্য তেমনভাবে কিছু নেই। আবার কোন কোন সাহিত্যের রূপগত সৌন্দর্য আছে কিন্তু বিষয়গত সৌন্দর্য তেমন নেই। আবার এমন সাহিত্যও আছে যেগুলির বিষয়গত ও রূপগত সৌন্দর্য দুই-ই সমান ভাবে বিদ্যমান। আবার এমন সাহিত্যও আছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনিক কারণেই রচিত হয় এবং তা বিষয়গত ও রূপগত এই দুই সম্পর্কেই অসচেতন।

সাহিত্যের ইমারত নির্মিত হয়েছে মানবতার উপর ভিত্তি করে। ছড়া যেহেতু বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা, তাই স্বাভাবিকভাবে ছড়ার প্রাণেও মানবতার স্পর্শ অনুভূত হবে। বিশেষ করে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া। মূলত বিবেক এবং মনুষ্যত্ব শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ শব্দ মানবতা। যেখানে বিবেক ভোঁতা কিংবা মনুষ্যত্ববোধ শূন্য; সেখানে মানবতা অসুস্থ অথবা মৃত। অর্থাৎ মানবতাহীনতায় সাধারণ মানুষ হয়ে যায় অধিকার বঞ্চিত, অসহায় ও উপেক্ষিত। মানুষের এই বঞ্চনা, অসহায়ত্ব কিংবা উপেক্ষা কবি-সাহিত্যিকদের করে আহত। তারা উদারতার পরাকাষ্ঠায় সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচানোর দায়বদ্ধতা অনুভব করেন। তাঁরা নানাভাবে ছড়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ বা অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছড়া-

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার

অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।

সেই অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে

ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।[৮]

বলাই বাহুল্য উপরোক্ত ছড়াটি শোষিত মানুষের দাবি আদায়ের একটি ইস্তেহার বা দলিল। শুধু তাই নয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দুঃখী মানুষ, ক্ষুধার্ত মানুষ এবং লড়াকু মানুষের সহমর্মী ও সহযোদ্ধা। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম রসদ হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। আর এই ক্ষুধার অন্নে যারা বিষ মেশায় কিংবা কেড়ে নেয় তাদের সমূলে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন কবি। ছড়াটির প্রথম দুটি চরণে 'অন্ন' শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং চরণ দুটির শেষে অন্ত্যমিল থাকায় এটি একটি অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। 'ধ্বংস করো' শব্দবন্ধটি পরপর তিনবার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন এটি চরম সত্য বা তিন সত্যি, এর ফলে কবির দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছে। ষাটের দশকে চরম খাদ্যসংকটের মধ্যে একদল কালোবাজারি মুনাফালোভী মানুষের মুখোশ খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ছড়াটি হয়ে উঠেছে নান্দনিক অনুভূতির আধার।

সমকালের আর এক বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় একটি ছড়া 'দেওয়াল লিখন' নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি

মন্ত্রী মশাই, করেন কী ?

পরের ধনে পোদ্দারি।

হাকিম সাহেব করেন কী ?

খোদার উপর খোদকারি।

... ...

কান কাটাদের রাজ্যে

ঠোঁট কাটারা যাই বলুক না

আনে না কেউ গ্রাহ্যে।৯

বর্তমান সময়টা বড় গোলমেলে। রাজনৈতিক কোন কিছু না করে যে যা পারছে হাতিয়ে নিচ্ছে। একেবারে খোলা মঞ্চে নির্লজ্জের মত রঙ বদলাচ্ছে, কোন কিছু নীতি নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে। এরা সব বহুরূপীর দল। রাজনীতি ব্যাপারটা এখন পেশাদারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা কথা বলতে জানে না তারা ভাষণ দেয়। যারা কোন কথা কানে তোলে না, তারা শোনে, অর্থাৎ কবি জীবনানন্দের ভাষায় 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ'। জনগণের ভোটে জিতে মন্ত্রী হওয়ার পর, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা, আর কানে তোলার নেই বরং মন্ত্রী মশাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আলোচ্য ছড়াটির মধ্য দিয়ে ছড়াকার তিনটি বিষয় পরিস্ফুট করেছেন, প্রথমত জনগণের টাকায় জনপ্রতিনিধিদের গাড়ি, বাড়ি, বিলাসিতা, দ্বিতীয়ত সঠিক বিচার না করে নিজেকে 'খোদা' বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে ভাবা অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার অবনতি, তৃতীয়ত যারা অসৎ তাদের কানের কাছে যতই সততার বাণী আওড়াওনা কেন তারা তা গ্রাহ্য করে না। সবদিক থেকে বর্তমান সমাজের একটি অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং সুস্থ, সুন্দর সমাজ নির্মাণে আমাদের সকলের এগিয়ে আসা আশু কর্তব্য। আর এই কারণেই ছড়াটির নান্দনিক মূল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্ট সরকার। সে সময় যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক ছিলেন বামফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট নেতা জ্যোতি বসু ছিলেন এই সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী। সে সময় যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা কেন ছিল তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে বামফ্রন্টের লিখিত একটি ছড়ায়-

আমার কথাটি ফুরা'ল

কংগ্রেস এবার ডুবিল

ক্যান রে কংগ্রেস ডুবিল?

ফ্রন্ট কেন হল?

ক্যান রে ফ্রন্ট হলি?

মানুষ কেন চায়।

ক্যান রে মানুষ চাস?

কংগ্রেস কেন মারে।

ক্যানরে কংগ্রেস মারিস?

খেতে কেন চায়।

ক্যান রে মানুষ খেতে চাস?

খিদে কেন পায়?

খিদে পাবে ভালো হবে-

কংগ্রেসের পিঠে সবাই ডুগডুগি বাজাবে।[১০]

উক্ত ছড়াটি বাংলার চিরকালীন রূপকথা 'ঠাকুমা'র ঝুলি'-র শেষে ফুরা'ল ছড়াটির অনুকরণে রচিত হয়েছে। অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের দ্বারা রচিত হলেও নাটকীয় ভঙ্গীতে ষাটের দশকের রাজনৈতিক চালচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ছড়াটিতে। ১৯৬৬ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয়, ফলস্বরূপ খাদ্যের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় আন্দোলন শুরু হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ১৯৬৭-এর নির্বাচনে। লোক আঙ্গিককে ব্যবহার করে ছড়াকার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা অন্য এক নান্দনিকতার স্তর স্পর্শ করেছে।

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান, নিরাপত্তা ও মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে কংগ্রেসের রচিত একটি ছড়ায়-

ভাইয়ের আয়ু বাড়বে বলে

ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ,

বোনের জন্য থাকে কেবল

ইভটিজিং আর ধর্ষণ।

কোন স্বীকারোক্তি যে এতখানি সারল্যমণ্ডিত হতে পারে তার যোগ্য নিদর্শন এই ছড়াটি। আমাদের সমাজের এক গভীর সত্যকে উপস্থাপন করেছেন ছড়াকার কিন্তু বাচন প্রণালীটি একেবারেই অগভীর। ভাই বোনের সম্পর্কের মাধুর্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে উক্ত ছড়াটিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না ছড়ায় উপস্থাপিত বাক্‌রীতির নান্দনিকতা এক ভিন্ন স্বাদ এনে দেয় পাঠককে। তাছাড়া ছড়াটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্ত্যমিল সৃজনের ক্ষেত্রে শব্দচয়নও সার্থক হয়েছে।

তবে রাজনৈতিক ছড়ার নন্দনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত বিষয়গত নন্দনতত্ত্ব এর মধ্যে থাকলেও আঙ্গিকগত নন্দনতত্ত্বের অন্বেষণ অনেক সময়েই জটিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ছন্দ, অলংকার, ধ্বনির কারুকার্য, জটিল চিত্রকল্প ইত্যাদি যে বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে তার অনেকগুলিই এসব ছড়ায় অনুপস্থিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক ছড়ায় বিষয়গত নন্দনতত্ত্বের অন্বেষণ অনেক ক্ষেত্রে যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে জটিল। কেননা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হল রাজনৈতিক ছড়া, যা মূলত নিছক প্রয়োজনগত কারণে রচিত হয়ে থাকে। যেমন নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত দেওয়াল লিখনের ছড়াগুলি, যেখানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটুকুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের দ্বারা রচিত রাজনৈতিক ছড়ার উপযোগিতা সুদূরপ্রসারী সে কথা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা ছন্দ, বীথিকা ঘোষ, টিচার্স কনসার্ন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৯, পৃ. ৮১।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, ছন্দের অর্থ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, প্রবোধ চন্দ্র সেন সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৬৯-৭০।

৩. ছেলেভুলানো ছড়া-১, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-১০, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ. ১৪৭।

৪. ছড়াসংগ্রহঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা- প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ২০১৪, রবিবাসরীয়, ভোটের ছড়া শীর্ষক আলোচনা, পৃ. ৯।

৬. বাংলা ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা-সৌগত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, গ্রন্থের অন্তর্গত কাননবিহারী গোস্বামী-র লেখা 'ছড়ার চিত্রকল্প' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

৭. বাংলা ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা-সৌগত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, গ্রন্থের অন্তর্গত কোয়েল চক্রবর্তী-র লেখা 'ছড়ার নন্দনতত্ত্ব' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ২২১-২২২।

৮. নির্বাচিত কবিতা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮।

৯. আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম, মন্টু মিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪০।

১০. ভোটের রঙ্গ-রসিকতা, আবির কর, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪০।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষত যেখানে বহুদলীয় প্রথা কায়েম আছে, সেখানে জনমত গঠনের, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের স্বরূপ উন্মোচনে কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের জনদরদী ভূমিকার অন্তরালে যে শোষকের ভূমিকা সেই স্বরূপকে চিহ্নিত করতে, বিশেষত নির্বাচনের সময় ভোটারদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ছড়ার সৃষ্টি। এই সকল রাজনৈতিক ছড়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সমসাময়িক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাদা পোশাকের পিছনে কালো মুখোশ, আর্থিক অনিয়ম, বেকারত্ব, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নারী নির্যাতন, স্বজন-পোষণ, মূল্যবৃদ্ধি প্রমুখ জনবিরোধী কার্যকলাপের চিত্র। প্রশ্ন উঠবে রাজনৈতিক দলগুলি কেন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বিশেষ করে ছড়াকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন? এর উত্তর খুব সহজ ও স্পষ্ট। এর গণমাধ্যম রূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা। ছড়া মানেই ছন্দবদ্ধ রচনা। যা ছন্দবদ্ধ তা সহজেই পাঠক বা শ্রোতার মনে গাঁথা হয়ে যায়। শত বক্তৃতা কিংবা ইস্তেহার প্রকাশে যে কাজ না হয় দু-চার পঙ্ক্তির ছড়ায় তার বহুগুণ ফল মেলে। ছড়ার আঙ্গিকটি সাধারণের কাছে পরিচিত। কেবল সেই আঙ্গিকের সাহায্যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়। তাই শুধু বাংলায় নয়, বিদেশেও সমসাময়িক ঘটনা প্রাবল্যের থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এমনকি নির্বাচনী প্রচারেও রাজনৈতিক ছড়ার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা রাজনৈতিক ছড়া নিয়ে ইতিপূর্বে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই এই সকল ছড়ার সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ আশু প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে যে টুকরো টুকরো ছবি আছে তার মধ্যে নিহিত থাকে সমাজ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এছাড়া এই ছড়াগুলি বহন করে সমাজ বিবর্তনের চিত্র।

প্রথম অধ্যায়টি গবেষণাকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সমগ্র গবেষণাকর্মটির মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার উৎসের সন্ধান আবশ্যক। আর এই উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। আমরা জানতে পেরেছি রাজনৈতিক ছড়াগুলি নির্দিষ্ট কোন 'লোক' বা 'গোষ্ঠীর' দ্বারা তৈরি হয় না, অথবা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোকছড়ার সমগোত্রীয় নয়, এই সকল ছড়া সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য জনমত গঠন করা। মূলত এই ধরনের ছড়াগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত হয়। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদেরই প্ররোচনা দিক না কেন, সংস্কৃতির অন্তর্বিলীন কাঠামোর মধ্যে বস্তুতপক্ষে সে ধরনের কোন বিচ্ছিন্নতাই নেই। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি আর শহরের পরিশীলিত আধুনিক কৃষ্টি কলার মধ্যে সম্পর্কটা প্রভেদের নয় বিবর্তনের।

বিশ শতকে পৌঁছে শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি সংগঠিত হয়েছে, ততই তীব্র হয়েছে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয়, ভারতবর্ষেও। বিশেষত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যখন আফ্রিকা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরাজয় ঘটতে থাকে ঠিক তখনই জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদির ব্যাপকতা দেখা গেছে নানা দেশে, ভারতবর্ষেও তার অন্যথা ঘটেনি। আর এই সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী গণসঙ্গীত ও রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। যদিও রাজনৈতিক ছড়ার উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট সাল আমাদের অজ্ঞাতই থেকে গেছে, তবু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি কোন কালপর্ব থেকে এই সকল ছড়ার উদ্ভব।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যত বেড়েছে, সেই আন্দোলনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহারও ততই বেড়েছে। মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল ও তার পরে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনেও আধুনিক আঙ্গিকে এই সকল রাজনৈতিক ছড়া ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। বর্তমানে এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলি রচিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শকে তুলে ধরার জন্য এবং শাসকদলের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ছড়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক কিংবা বিরোধী উভয় দলই পক্ষে বিপক্ষে এই ধরনের ছড়ায় দেওয়াল ভরিয়ে তোলেন এবং দেওয়াল দখলের যুদ্ধে মেতে ওঠেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ছড়ার ভূমিকা। এই আলোচনা থেকে আমরা পেলাম, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রাক্‌লগ্নে এত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রমরমা ছিল না, তখন নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল রাজনৈতিক ছড়া। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম অর্থাৎ টিভি, রেডিও, মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজলভ্য হলেও নির্বাচনী প্রচারে বাংলা রাজনৈতিক ছড়া তার ঐতিহ্য হারায়নি বরং আগের তুলনায় আরও বেশি দেওয়াল লিখন লক্ষ্য করা যায়। কারণ জনমানসের কথা মনে রেখে নিতান্ত পরিচিত বক্তব্যকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সহজেই রাজনৈতিক ছড়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষ এইসব ছড়া পাঠ করে বা শুনে বিচিত্র আনন্দ পায়। তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ব্যঙ্গে এগুলি হয় মর্মভেদী। তাই প্রচার মাধ্যম হিসাবে রাজনৈতিক ছড়ার জুড়ি মেলা ভার।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজনৈতিক ছড়ার ছড়াকার বা স্রষ্টার পরিচয়। এই সকল ছড়ার স্রষ্টার পরিচয় খুঁজতে গিয়ে যা পেলাম তা হল- সচরাচর রাজনৈতিক ছড়ার ব্যবহার দেওয়াল লিখনে লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারাও প্রচুর রাজনৈতিক ছড়া মুদ্রিত হতে দেখা যায়। আমরা এই সকল রাজনৈতিক ছড়াগুলিকে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছি। অপরদিকে নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত দেওয়াল লিখনের ছড়াগুলিকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কারণ দেওয়াল লিখনে যে সকল রাজনৈতিক ছড়া লক্ষ্য করা যায়, তার কোনটাতেই স্রষ্টার উল্লেখ থাকে না। কেবলমাত্র দলীয় প্রতীক চিহ্ন, প্রার্থীর নাম, দলের নাম ইত্যাদি থাকে। যার ফলে এই সকল ছড়াগুলি কোন ব্যক্তি নামে প্রচারিত না হয়ে কেবলমাত্র দলের নামে প্রচার লাভ করে, যে কারণে এই সকল ছড়াগুলিকে অজ্ঞাতনামা ছড়াকারের রচিত রাজনৈতিক ছড়া হিসাবে চিহ্নিত করা হল।

লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক হল ছড়া। যেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আর সমষ্টিগত মানুষের সেই ছন্দিত ফসল আজ আকর্ষণ করে আধুনিক কবি-মানসকে। সাম্প্রতিককালের কবিরাও অনেক সময় ছড়ার মত জনপ্রিয় আঙ্গিককে ব্যবহার করে মানুষের আরো কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। আর যে কারণে ছড়া রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এবং পরবর্তীকালে তাঁর দেখানো পথে প্রায় সকল বড় কবিই অনায়াসে পদচারণা করেছেন। ফলস্বরূপ গ্রামীণ ছড়ার মধ্যে এসেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং লোকায়ত শিল্পে লেগেছে ব্যক্তিগত রং। এই ধারাতেই অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরি প্রমুখ কবিগণ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক।

আলোচিত এই অভিমুখগুলির মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করলাম কয়েকটি সিদ্ধান্ত। প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারগণ ছড়ার মত সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যমকে হাতিয়ার করে যেতে চেয়েছেন জনমানসের কাছাকাছি। তাছাড়া ছড়ার ছন্দে ও চালে আছে লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার নিজস্ব ও ব্যাপক ক্ষমতা। ছড়ার এই শক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন আধুনিক কালের প্রায় সকল ছড়াকার। তবে ছড়া চর্চার পিছনে নিহিত আছে তাঁদের ঐতিহ্যবোধও। প্রাচীনকাল থেকে ছড়ার মধ্যে যে স্বপ্ন ও সংগ্রাম, আশা ও প্রতিবাদ এবং জীবনময়তার ওম জড়িয়ে আছে, ঐতিহ্যবোধে তার নব রূপায়ন ঘটাতে চেয়েছেন উক্ত ছড়াকারগণ।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ছড়া রচনার প্রেক্ষিত। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যতগুলি নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, প্রত্যেকটি নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি কিভাবে দেওয়ালে

ফুটে উঠেছে বা ছড়ার আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। নির্বাচন মানেই কী তত্ত্বের কচকচানি, বিরোধীদের কড়া সমালোচনায় কোণঠাসা করার চেষ্টা নাকি প্রতিশ্রুতির বন্যা? নিন্দুকেরা এসব বললেও নির্বাচনের সঙ্গে জুড়েছে কবিতা, ছড়া, কার্টুন চিত্র ও সৃষ্টিশীলতার নানা দিক। সেটা দেওয়ালের রং দিয়ে প্রার্থীর প্রচার হোক বা মিছিলের নতুন ধরনের সে স্লোগান। এই দেওয়ালের প্রচার যুদ্ধ তো আর ঘোড়ায় চড়ে হয় না। তাই ছড়ায় চড়ে হাজির হন প্রার্থীরা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গ করে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে অস্ত্র হয় ছড়া।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক ভোটের আগে এই ধরনের দেওয়াল লিখন চোখে পড়ে। শহুরে কিংবা গ্রামের মানুষ উদাসীন কিংবা সিরিয়াস ভোটার, সকলের কাছে পৌঁছতে ছড়ার চেয়ে নিশ্চিত অথচ সহজ পথ আর নেই। ছন্দের কারণেই তা মনে থেকে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজ্যে ভোট শুরু হলে চায়ের দোকান উত্তপ্ত হবে, দেওয়াল জুড়ে চুনকামের পোঁচ পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাতে লাল, সবুজ, গেরুয়া নানা রঙের লড়াই। নানা ফুল, হাতুড়ি, কাস্তে, হাতের সমাহার। অবাক হলে চলবে কেন! রাজ্যে ভোট শুরু হয়েছে অথচ দেওয়াল শান্ত থাকবে তা কি করে হয়? ভোটের আঁচে তাও বর্ণময়, বিশেষ করে ছড়াময়। হাল সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার কিংবা চ্যানেলে প্রচার এসব এসেছে বটে কিন্তু সে আর কদিনের? এখনও ভোট প্রচারের ট্র্যাডিশনাল মাধ্যম তো দেওয়ালই।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সেটি হল মূলত সত্তরের দশক থেকে বাংলা রাজনৈতিক ছড়ার ভাষা একটু একটু করে শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে থাকে। নির্বাচনী চাপান-উতোর দলকে অতিক্রম করে ব্যক্তি আক্রমণে পর্যবসিত হয়। আর এই ভাষা দৌরাত্ম্যের খেলায় মেতে উঠেছেন বর্তমান রাজনীতিকরা। যুযুধান দল একে অপরকে বিদ্ধ করবে, রাজনীতির কারবারিরা পরস্পরের দিকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করবেন- তা তো বটেই। তবে বিদ্ধ করার অস্ত্র হবে যুক্তি এটাই প্রত্যাশিত। প্রথা, শিষ্টাচার এটাই দাবি করে। কিন্তু নির্বাচনের মরশুম এলে নেতাদের মুখের আগল খসে পড়ে। শালিনতাবোধের তোয়াক্কা না করে চলে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও ব্যক্তিগত আক্রমণের পালা। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়।

পঞ্চম অধ্যায়টিতে দেশভাগের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও পাকিস্তানি শাসনে তৎকালীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যে দুর্দশার চিত্র ছড়ার মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পেলাম সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ছড়াগুলি অর্থবোধে কালোপযোগী বিবর্তিত হয়। আর এই বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায় ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস ধরা পড়েছে। তবে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি রাজনৈতিক ছড়া তৈরি

হয়েছে। তার কারণ যুদ্ধের সময় মুক্তি যোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য এবং অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ছড়া রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

রাজনীতি মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য। রাজনীতির এই মূলমন্ত্র খুব কম সংখ্যক লোকই এই পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। খুব কম সংখ্যক লোকই রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন গড়েছেন। তেমনি একজন বিরল রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দল ও সেই দলের নীতি আদর্শ জনগণের মনোজগতে প্রভাব ফেলে। তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায়। এছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছড়ায় দুর্নীতি কিংবা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক ছড়া রচিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ও প্রার্থীর গুণগান করে।

আমাদের গবেষণার শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যগুণের নিরিখে রাজনৈতিক ছড়া। এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যে অভিমুখগুলি উঠে এসেছে তা হল- প্রথমত সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যতত্ত্বের এই চুল-চেরা বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কাব্য-সাহিত্যের মাপকাঠিতে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে, শব্দ মাধুর্য, ছন্দ প্রয়োগ, অলংকার সুষমা, ধ্বনিঝংকার সব মিলিয়ে এক আস্বাদ্যময় শ্রুতিসুখকর রচনা হল ছড়া। স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা যদি কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, আধুনিক যুগের কাব্যরসিক পাঠক যদি তাতে কবিত্বের স্পর্শ পায়, তবে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ছড়ার মধ্যে কবিত্বের সন্ধান করা যায়। দ্বিতীয়ত এই ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ বাঙালির, বাংলার একেবারে নিজস্ব ছন্দ, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশের স্পর্শরহিত নানান লৌকিক উৎস এর প্রাণ। এই ছন্দই পরম্পরায় বাহিত হয়ে শক্তিশালী করেছে পরবর্তীকালের কবিতার ছন্দের একটি ধারাকে। তাই আধুনিক পর্বে রচিত যে সৃজিত দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলি দেখি তার পূর্ব উৎস লৌকিক ছন্দই। অনুরূপভাবে বাংলা রাজনৈতিক ছড়াগুলি লোক আঙ্গিকের ছন্দ গ্রহণ করলেও শব্দচয়ন আধুনিক। নিম্নে রাজনৈতিক ছড়ার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

চিনের চিহ্ন/ কাস্তে হাতুড়ি   ৪+৪

পাকিস্তানের তারা   ৪+২

এখনো কি/ বলতে হবে   ৪+৪

দেশের শত্রু/ কারা?　　　৪+২

(১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনী ছড়ায়। উক্ত ছড়াটি তৎকালীন কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন।)

তৃতীয়ত কাব্যসাহিত্যের ব্যঞ্জনা হল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হল বাংলা রাজনৈতিক ছড়া। নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত এই সকল ছড়ায় মূলত তাৎক্ষণিকতাকে তুলে ধরা হয়। তাই এই ধরনের ছড়াগুলিতে পাশ্চাত্য Imagery-র স্বরূপের সঙ্গে সবটা মেলানো যায় না। তবে এদের চিত্রকল্পনায় যে সৌন্দর্য আছে তা সাধারণভাবে Imagery বা চিত্রকল্পই রচনা করেছে। তবে রাজনৈতিক ছড়ার নন্দনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে ভারতে এবং তার অংশ হিসেবে বঙ্গে আধুনিক যুগের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ গণতান্ত্রিক চেতনারই অংশ। লক্ষণীয় যে, আধুনিক ছড়ার রচয়িতাগণ সকলেই মধ্যবিত্ত এবং ভারতীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ আধুনিক রাজনৈতিক ছড়ায় লাভ করেছে বিস্তৃত আয়তন। আমাদের গবেষণার সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই অভিমুখগুলিকেই চিহ্নিত করলাম। যদি আমাদের এই সিদ্ধান্তসমূহ ভবিষ্যতের গবেষকদেরকে উৎসাহিত করে তাহলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: নির্বাচন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তালিকা

❖ স্বাধীন ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনের সময়কাল (বর্ষ):

❖ ভারতের লোকসভা নির্বাচন: ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯...

❖ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন: ১৯৬৯, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬, ২০১১, ২০১৬...

❖ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন: ১৯৬৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮, ১৯৯৩, ১৯৮৮, ২০০৩, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৮...

❖ **পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণের তালিকা:**

	মুখ্যমন্ত্রীগণ	দলের নাম	সময়কাল
১.	ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ	কংগ্রেস	১৯৪৭- ১৯৪৮
২.	ডঃ বিধান চন্দ্র রায়	কংগ্রেস	১৯৪৮- ১৯৬২
৩.	প্রফুল্ল সেন	কংগ্রেস	১৯৬২- ১৯৬৭
৪.	অজয় কুমার মুখার্জী	যুক্তফ্রন্ট	১৯৬৭
৫.	ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ	পি ডি এ ফ্রন্ট	১৯৬৭- ১৯৬৮
৬.	অজয় কুমার মুখার্জী	যুক্তফ্রন্ট	১৯৬৯- ১৯৭১
৭.	সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়	কংগ্রেস	১৯৭২- ১৯৭৭
৮.	জ্যোতি বসু	বামফ্রন্ট	১৯৭৭- ২০০০
৯.	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	বামফ্রন্ট	২০০০-২০১১
১০.	মমতা ব্যানার্জী	তৃণমূল কংগ্রেস	২০১১...

❖ স্বাধীন ভারতবর্ষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ঘটনাপঞ্জী:

১৯৬২—১ জুলাই কর্মরত অবস্থাতেই বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তরাংশে চিনভারত সংঘর্ষ শুরু হয়।-

১৯৬৫— অজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে এসে 'বাংলা কংগ্রেস' গঠন করলেন।

১৯৬৭' —জন সংযুক্ত বাম মোর্চা' ও (PULF) 'সংযুক্ত বাম মোর্চাগঠিত হয়। এই (ULF) ' ও বাম দলগুলির সমর্থনে 'বাংলা কংগ্রেস' বছরেপ্রথম গঠিত হয়। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার'

১৯৬৮ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় এবং এই রাষ্ট্রপতি শাসন চলে ঠিক ২০—এক বছর।

১৯৬৯গঠিত 'যুক্তফ্রন্ট সরকার' অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয়— হয়।

১৯৭১মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। একই সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ —ডিসেম্বর ভারত পাক যুদ্ধের অবসান ঘটে। **১৭**সংঘটিত হয় এবং

১৯৭২সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার বাংলার ক্ষমতা দখল করে।—

১৯৭৫২প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি —৫ জুন সারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করেন।

১৯৭৭' মার্চ ২৭—জরুরি অবস্থাজুন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্ ২১প্রত্যাহার করা হয়। 'রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে।

কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রতীক (১৯৫২-১৯৭৭)

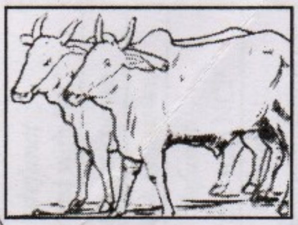

১৯৫২-৬৯ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রতীক (জোড়া বলদ)।

১৯৫২-প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতীক।

১৯৫২-সোস্যালিষ্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতীক (গাছ)।

১৯৫২-স্বতন্ত্র পার্টির নির্বাচনী প্রতীক।

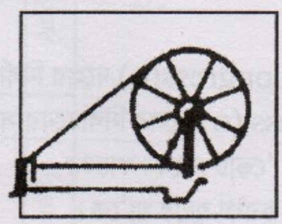

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চিরন্তন প্রতীক (নির্বাচনী প্রতীক নয়)- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক-চরকা।

১৯৬৯- কংগ্রেসর দলের বিভাজনের পর কংগ্রেস (ও) আদি কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রতীক-চরকা হাতে মহিলা।

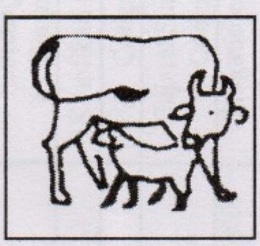

১৯৭১-৭৭ ইন্দিরা কংগ্রেস (ই) দলের নির্বাচনী প্রতীক-গাই বাছুর।

১৯৫২-ভারতীয় জনসংঘ দলের নির্বাচনী প্রতীক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ।

১৯৭৭ - জনতা দলের নির্বাচনী প্রতীক- লাঙল কাঁধে কৃষক।

পরিশিষ্ট-২: রাজনৈতিক ছড়ার চিত্রপঞ্জি

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্ নির্বাচনী চিত্র

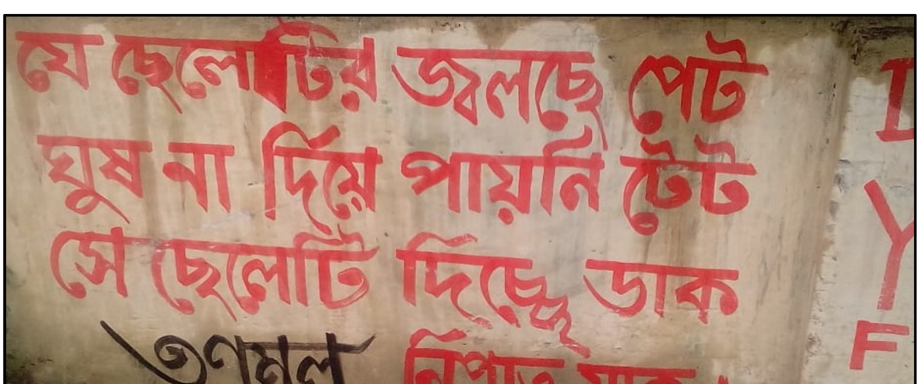

১৯ মে, ২০১৬, নরেন্দ্রপুর স্টেশন সংলগ্ন পাঁচিল থেকে চিত্রটি গৃহীত

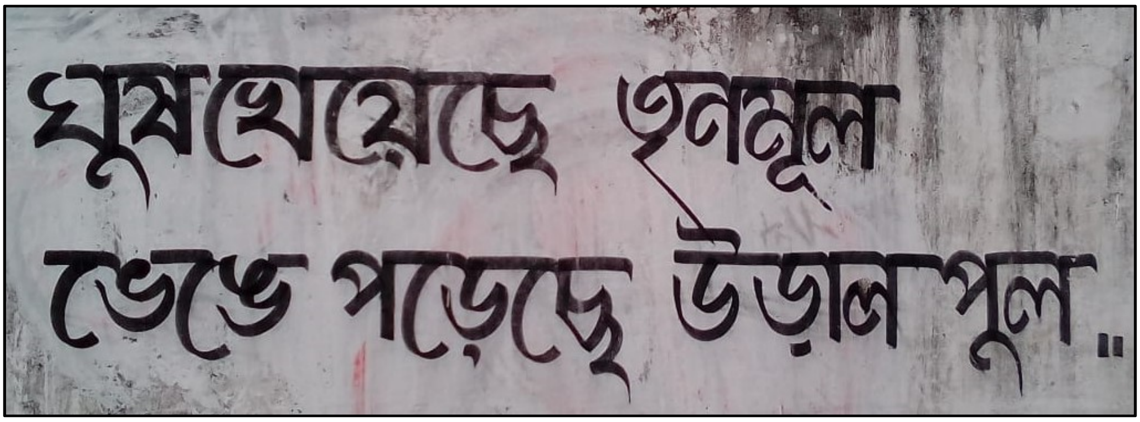

২৪ জুন, ২০১৬, কালিকাপুর সাউথ গড়িয়া রোডের পাশের দেওয়াল থেকে গৃহীত।

আনন্দবাজার পত্রিকা • ৬ বৈশাখ ১৪২১ রবিবার ২০ এপ্রিল ২০১৪ XXCE

রবিবাসরীয়

মারলে তুমি এন্ট্রি, বাজল হৃদে ঘন্টি
(যেন) রবিবাসরীয়র তুমি জেল্লা-তুতো বোনটি

১৯৯১ সালের একটি দেওয়াল লিখন

মা-মাটি-মানুষ এক্সপ্রেস ঐ প্ল্যাটফর্মে আসছে।' এটা ছড়া নয়, কিন্তু তা বলে এটি উদ্ধৃত করার লোভ ছাড়া যায়?

'পরিবর্তন' আসার পর, মুঠোফোন থেকে মুঠোফোনে ছড়াল: 'কাল ছিল লাল খালি/ আজ ফুলে যায় ভরে।' অবশ্য এসএমএস বা ফেসবুকের ওয়াল-এ লেখাকে 'দেওয়াল লিখন' ধরে নিলে, ঝুলি উপচে পড়বে। তখন আমাদের পুলকিত করবে এই টু-লাইনার: 'কী পরিবর্তন আনলে কাকা/ বাজার করতে পকেট ফাঁকা!'

এ বারের ভোটে, বামফ্রন্টের দেওয়াল লিখন স্বাভাবিক ভাবেই অ্যাগ্রেসিভ: 'মানুষের পাশে আছে কাস্তে হাতুড়ি/ সেই দেখে মুষড়ে পড়েছে মুকুল/ দিল্লির স্বপ্ন দেখো না দিদিমণি/ বাংলার মানুষ করবে না আর ভুল।' কিংবা: 'যে বেকারের জ্বলছে পেট/ ঘুষ না দিয়ে পায়নি টেট/ সেই বেকারেরা দিচ্ছে ডাক/ তৃণমূল সরকার নিপাত যাক।' অথবা 'ভাইয়ের আয়ু বাড়বে বলে/ ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষণ/ বোনের জন্য থাকে কেবল/ ইভ-টিজিং আর ধর্ষণ।' আর তৃণমূলের 'সৎ' ইমেজকে ব্যঙ্গ করে: 'তৃণমূলের ৩৪ মাস/ মানুষের সর্বনাশ/ দিদির পায়ে হাওয়াই চটি/ দিদির ভাইয়েরা সব কোটিপতি।'

তবে বিজেপি-ও পিছিয়ে নেই। লিখছে: 'বন্ধু, পরিবর্তন কাহারে কয়!/ CPI(M) হল তৃণমূল/ প্রকৃত তৃণমূল হল নির্মূল/ 'মা' সইবে না আর ভুল/ 'মাটি'-তে ফুটবে না আর জোড়া ফুল/ 'মানুষ' করবে না আর ঐতিহাসিক ভুল/ এখন একমাত্র বিকল্প হল পদ্মফুল।' আবার, নরেন্দ্র মোদীর ইমেজকে ব্যবহার করে: 'দুপুর গেল সন্ধ্যা হল/ ফিরল পাখি বাসায়/ পথ চেয়ে বসে আছি/ নরেন্দ্র মোদীর আশায়।/ ঢোল

আনন্দবাজার, ২৩ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ১৮।

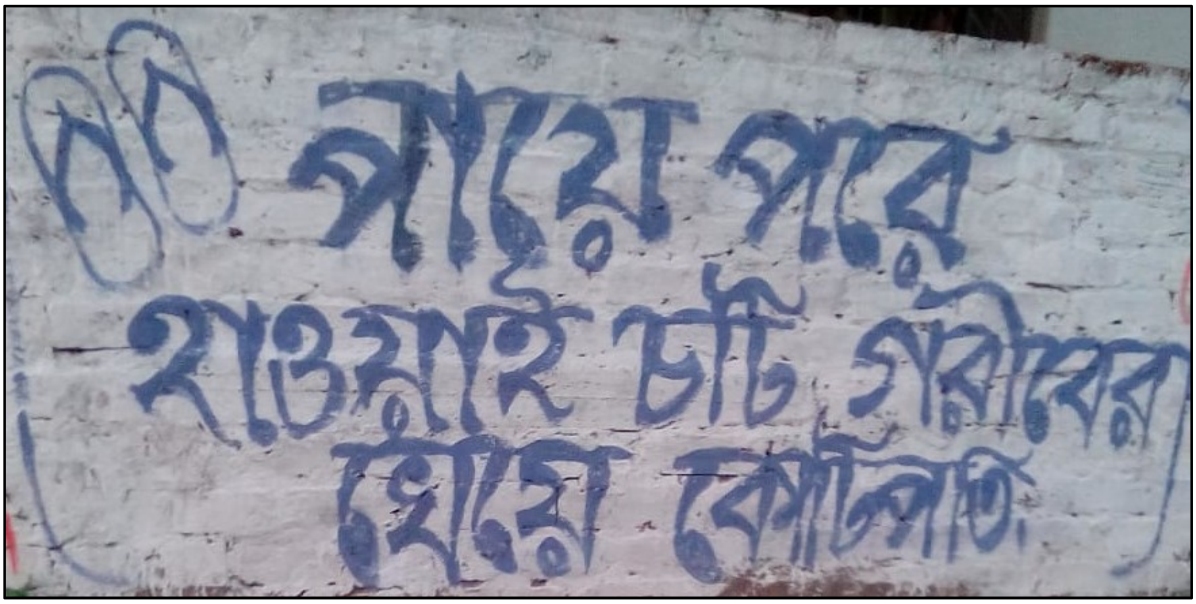

৯ মে, ২০১৬, সারদা ইস্কুলের পাঁচিল, বরাহনগর।

কার্টুন, ছড়ায় কোন্নগরে দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল

হুগলিতে দেওয়াল জুড়ে তৃণমূলের ছড়া, ব্যঙ্গচিত্র — মৃণাল বসু

দেওয়াল লিখে দিনভর ব্যস্ত শিল্পী শম্ভুনাথ

তপন মণ্ডল ■ বসিরহাট

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লে দম ফেলার ফুরসত থাকে না বসিরহাট সুভাষ পল্লির বাসিন্দা শম্ভুনাথ সরকারের। আজ থেকে নয়, প্রায় তিরিশ বছর ধরে পেশাদারিত্বের সঙ্গে এ কাজ করে চলেছেন তিনি। প্রথমে অবশ্য শখ করে, আর বামপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। শখ করে দেওয়াল লেখা শুরু করেন, সেই ১৯৭৬ সালে। তখন বুর্জোয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, সর্বহারা সিপিএমের হয়ে লিখেছেন। এত দিনে তারা এক হয়ে গিয়েছে, লড়ছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ময়দানে আছে বিজেপিও। সে কথা থাক।

আর্ট কলেজে শেখা তো দূরস্থান, কোনও দিন কোনও শিক্ষকের কাছে পর্যন্ত তালিম নেননি শম্ভুনাথ। তা বলে বসিরহাটে ভোটের দেওয়াল লিখতে লিখতে নিজেকে পরিণত করে ফেলেছেন তিনি, এই পেশায়। শম্ভুনাথ যখন সপ্তম শ্রেণিতে

পাকা হাতে কাজে ব্যস্ত শম্ভুনাথ — প্রতিবেদক

পড়েন, তখন বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গম ভাঙাতে যেতেন তিনি। গম ভাঙাতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ

এইসময়, ৯ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ৬।

১৮ নদিয়া

আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার ২৩ এপ্রিল ২০১৬

গেল ভোট

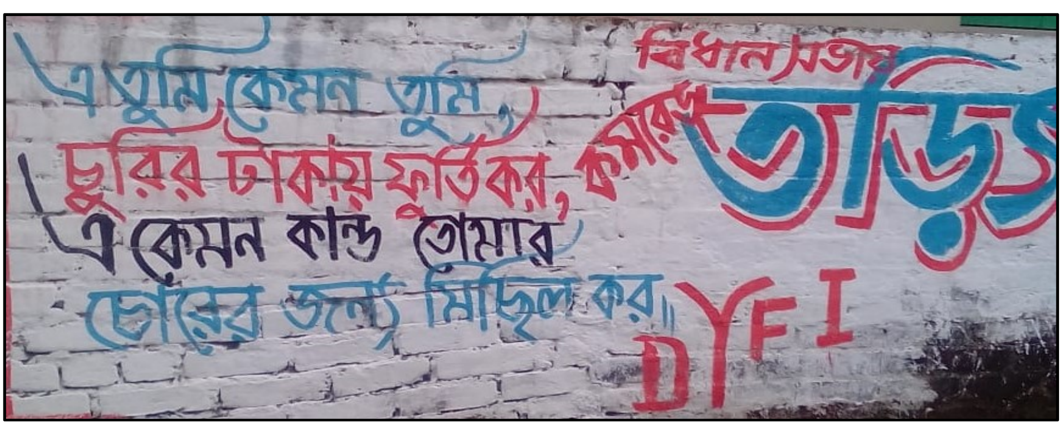

১৯ মে, ২০১৬, সোনারপুর ঘোষপাড়া অগ্রদূত ক্লাব সংলগ্ন দেওয়াল।

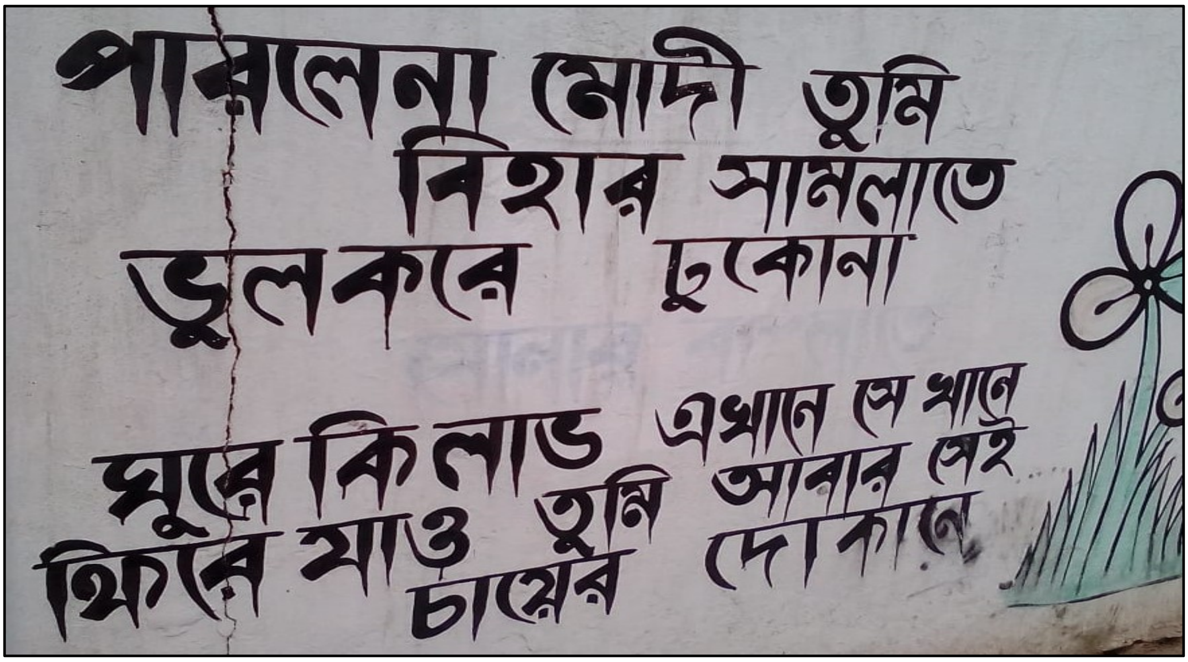

২৬ জুন, ২০১৬, নরেন্দ্রপুর মিশন ৪ নং গেটের বিপরীত থেকে গৃহীত।

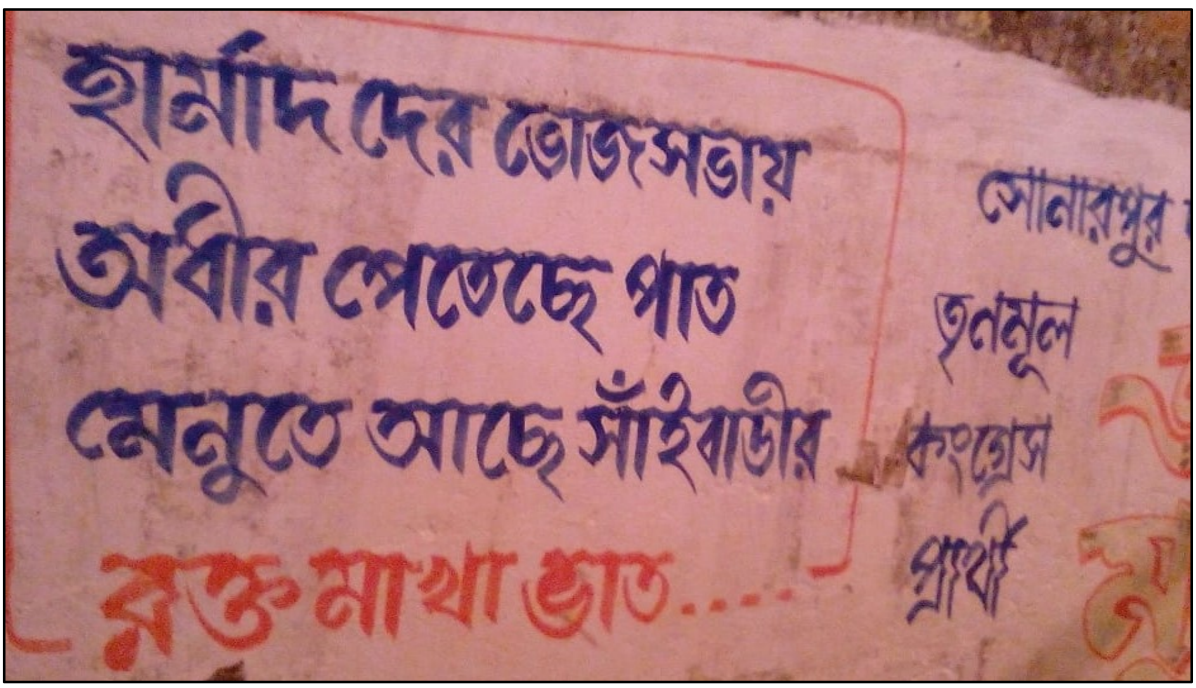

৫ মে , ২০১৬, রাজপুর অটোস্ট্যাণ্ড থেকে গৃহীত।

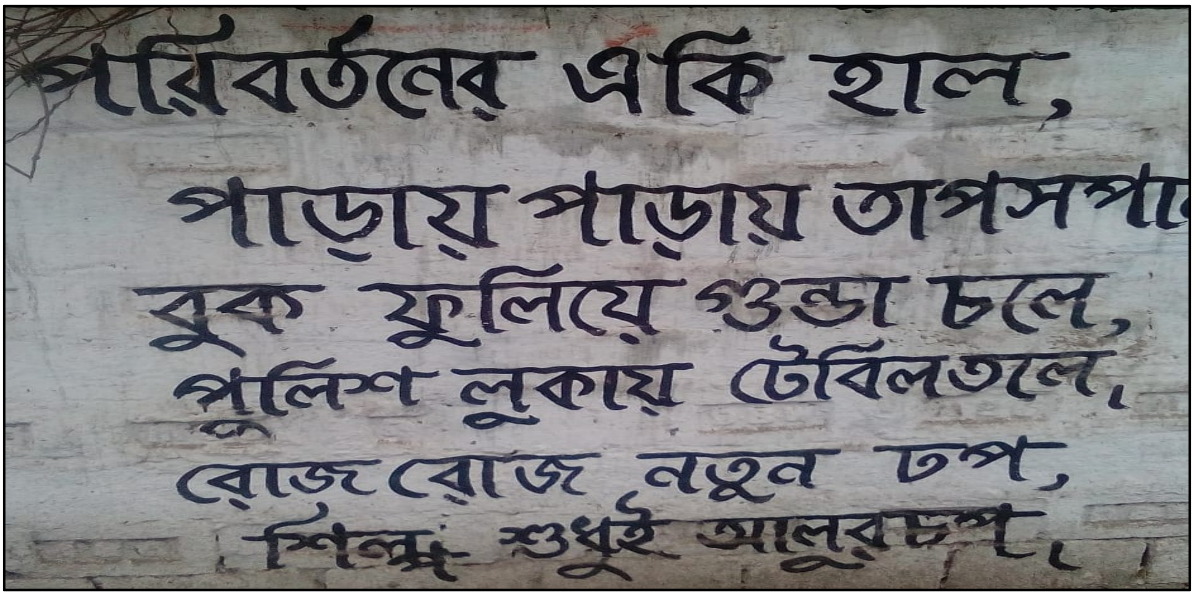

৩১ মার্চ, ২০১৬, কালিকাপুর স্টেশান সংলগ্ন দেওয়াল থেকে গৃহীত।

রইল দেওয়াল

দেওয়ালে চুনকাম করে লাল-সবুজ পোঁচ মারার আগে কতই না মাথাব্যথা। ভোট মেটার পরেই সেই সব দেওয়ালের হাল কে ফেরাবে? ভোট-রসিকেরা অবশ্য বলছেন, ক্ষতি কী! রঙচটা শ্যাওলা পড়া দেওয়ালের চেয়ে চিমকি কাটা ছড়া অথবা কার্টুনের ফস্টিনস্টি অনেক ভাল। থাক না, যত দিন না বৃষ্টি আসে, রং ধুয়ে যায়।

আনন্দবাজার, ২৩ এপ্রিল, ২০১৬।

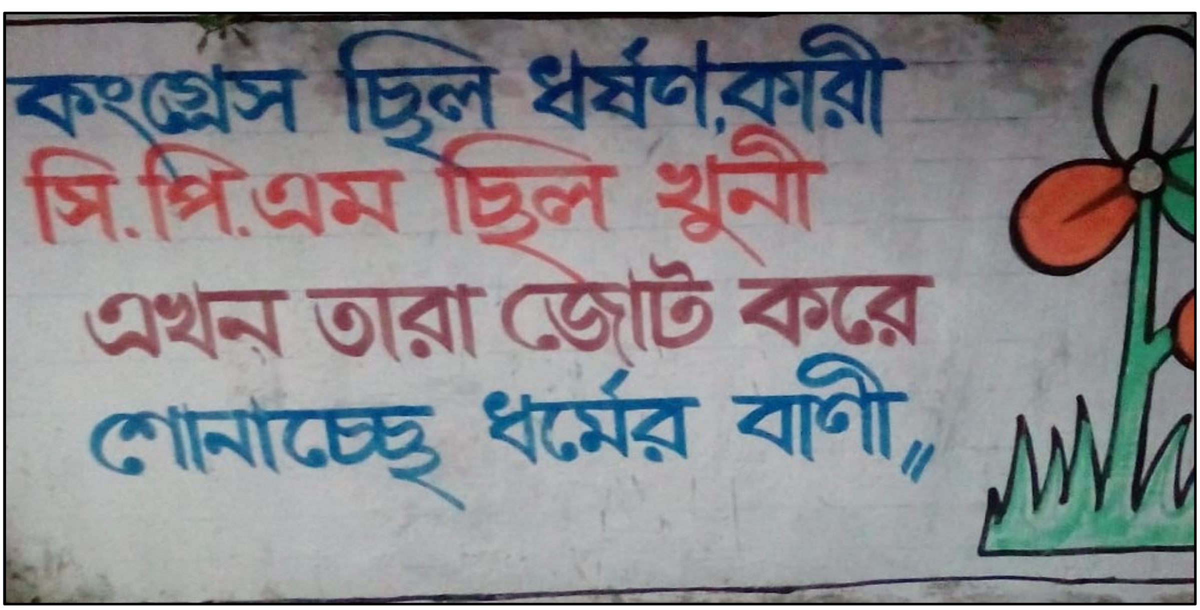

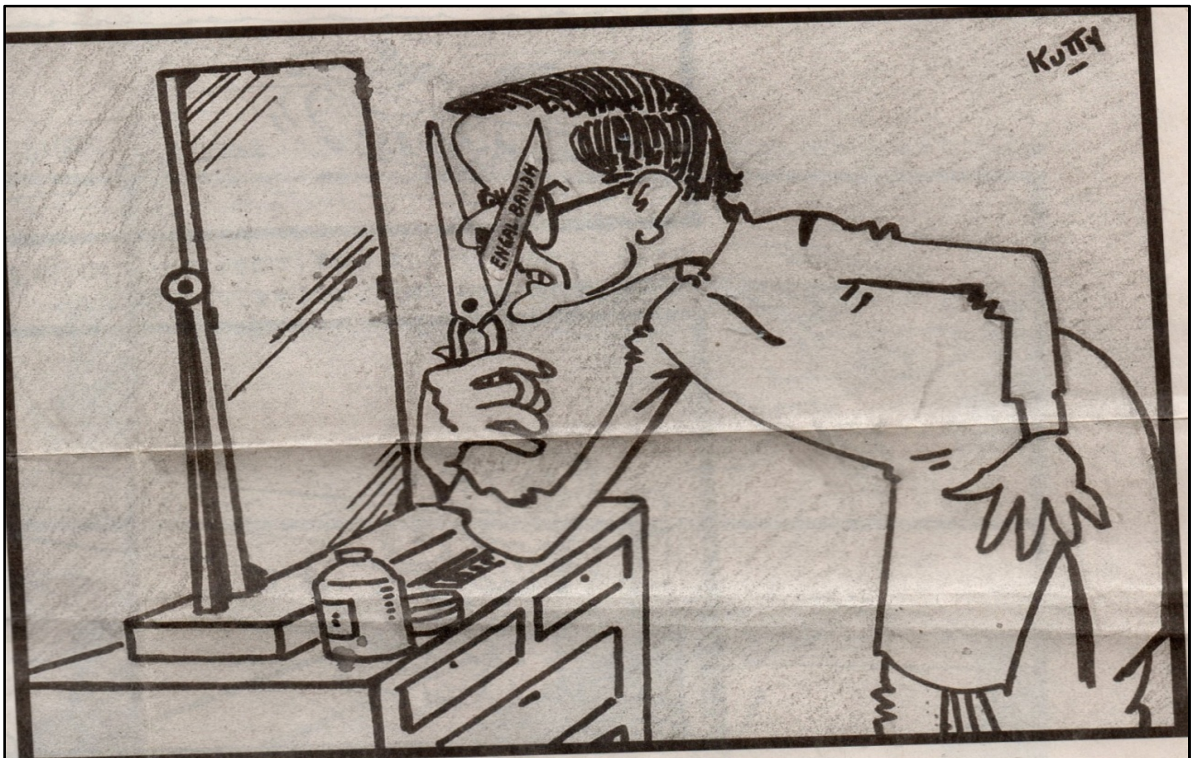

অক্টোবর, ১৯৮০। ক্ষমতায় এসেও বন্‌ধ-এর বন্ধ্যা রাজনীতি থেকে বেরোতে পারেনি বামেরা। জ্যোতি বসু তখন মুখ্যমন্ত্রী। বন্‌ধ-এর উদ্যোক্তা শাসক বামফ্রন্ট।

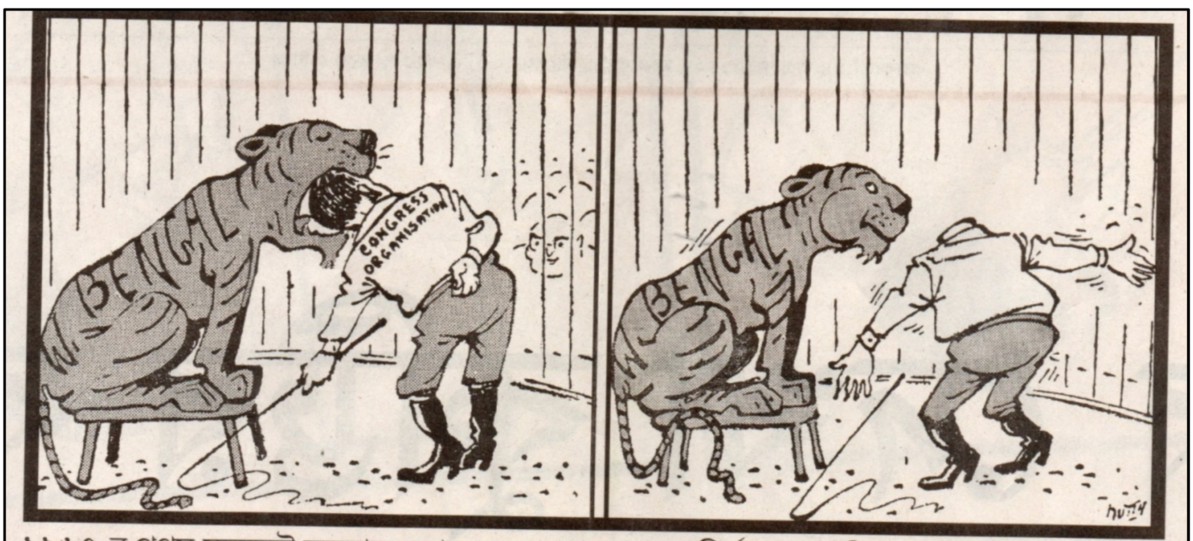

১৯৬৭-র প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে ১৯৬৯-র নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না কংগ্রেস। বাঘের মতো ফিরে এল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট।

কুট্টির রাজনৈতিক কার্টুন চিত্র, আনন্দবাজার, ১ ডিসেম্বর ২০১৫।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ(বাংলা):

১. অভিজিৎ রায়, *প্রফুল্ল সেন- অতুল্য ঘোষ ও সমকালীন রাজনীতি,* সাগর বুকস, কলকাতা, ১৪২০।

২. অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর(১৯৪৭-১৯৯৭),* এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩. অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক,* রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২।

৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. অরুণ ঘোষ(সম্পাদিত), *জনযুদ্ধ, দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দলিল সংগ্রহ-৪ (১৯৪৬-১৯৪৭),* সেরিবান, কলকাতা, ২০০১।

৬. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।

৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *ছড়াসমগ্র,* বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩।

৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, *মুক্তবঙ্গের স্মৃতি,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪০৫।

৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, *কাঁদো প্রিয় দেশ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

১০.অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

১১. আবীর কর, *ভোটের রঙ্গ-রসিকতা,* বর্ণপরিচয়, পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২২।

১২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য(১৭৫৭-১৯১৮),* প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০১।

১৩. আলম তালুকদার, *বঙ্গবন্ধুর ছড়া,* অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

১৪. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

১৫. আবুল হাসিম, *আমার জিবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩।

১৭. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য,* প্রথম খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২।

১৮. ইসরাইল শেখ, *কত ছড়া কত রঙ(প্রবন্ধ),* কালের আলোয় দাঁড়িয়ে(নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮।

১৯. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়া,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮।

২০. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৪।

২১. কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

২২. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, *রক্তমাখা ছন্দ,* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩।

২৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী(১৯১৫-১৯৩০),* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪।

২৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কবি,* ভারবি, কলকাতা, জুলাই-২০১৪(পুনর্মুদ্রণ)।

২৫. জহর সেন মজুমদার, *কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি,* সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ২০১৮।

২৬. জয়গোপাল মণ্ডল, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ২০০৭।

২৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৮. দেবশ্রী পালিত, *ছড়া লোকায়ত জীবনের কারুভাষ,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।

২৯. দেবাশীষ বসু, *বাংলা ছড়ায় সমাজ-ভাবনা,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৪।

৩০. নলিনীকান্ত সরকার, *দাদাঠাকুর,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৩৮০।

৩১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, *বাংলা ছড়ার ভূমিকা,* সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৯।

৩২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০০।

৩৩. নবারুণ ভট্টাচার্য, *পুরন্দর ভাটের কবিতা,* ভাষাবন্ধ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

৩৪ নবারুণ ভট্টাচার্য, *কাঙাল মালসাট,* সপ্তর্ষি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

৩৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৬।

৩৬. পরিমল গোস্বামী, *আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০।

৩৭. প্রণব বিশ্বাস(সম্পাদিত), *ছড়াসংগ্রহ,* সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

৩৮. পবিত্র অধিকারী, *তিনশো বছরের বাংলা প্যারোডি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

৩৯. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২।

৪০ পূর্ণেন্দু পত্রী, *কালি কলম মন (প্রবন্ধ সংকলন),* ঊর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২।

৪১. ফজলুল হক সরকার, *ছড়া সঞ্চয়ন,* নান্দনিক, ঢাকা, ২০১৩।

৪২. বরুণ সেনগুপ্ত, *রচনা সংগ্রহ,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৯।

৪৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বাংলা ছড়া পরিক্রমা,* অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

৪৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬।

৪৫. বদরুদ্দীন উমর, *বঙ্গ-ভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন প্রা: লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪।

৪৬. বদরুদ্দীন উমর, *কার দিন বদল হোল,* আফসার ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১০।

৪৭. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নির্বাচিত কবিতা,* সম্পাদনা- পুলক চন্দ, কথাশিল্প, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮০।

৪৮. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৪৯. বারিদ বরণ ঘোষ, *স্মরণীয় বিংশ শতক (১৯০১-১৯৯৯),* মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০০০।

৫০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৪৪।

৫১. বিপিন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী আদিত্য মুখার্জী, অনুবাদ: আশিষ লাহিড়ী, *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে(১৯৪৭-২০০০),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৬।

৫২. *বীরেন্দ্র সমগ্র,* প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা-সব্যসাচীদেব, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

৫৩. বিশ্ব বিশ্বাস, *বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান,* বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭১।

৫৪. বিশ্ব গঙ্গোপাধ্যায়, *কার্টুন রং-বিচিত্রা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২০।

৫৫. ভবতারণ দত্ত (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলা ছড়া,* পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, ২০০৯।

৫৬. ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, *ছড়াসমগ্র,* সূর্য পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৭।

৫৭. *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫৮. মইনুল হোসেন চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য (স্বাধীনতার প্রথম দশক),* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

৫৯. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭।

৬০. মন্টু মিত্র, *আধুনিক কবিতার পাঁচ কলম,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯।

৬১. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ ইতিহাসের অ্যালবাম,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫।

৬২. *মুক্তির সংগ্রামে ভারত,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩১৪।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ শাসমল, *বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক উপাদান,* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২২।

৬৫. রামচন্দ্র গুহ, *গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ,* অনুবাদ: আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১২।

৬৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ),* মুক্তি সংগ্রাম, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০।

৬৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ),* জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১।

৬৮. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৬,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৬৯. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৭,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০০।

৭০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *জিন্না: পাকিস্তান (নতুন ভাবনা),* মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৯।

৭১. শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *বাংলা কার্টুনে ভোট গ্রন্থনা,* মনফকিরা, কলকাতা, ২০১৪।

৭২. *সাত দশক: সমকাল ও আনন্দবাজার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯।

৭৩. সালাহউদ্দিন আহমেদ, *ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭।

৭৪. সুমন চট্টোপাধ্যায়, *রাজ্যপাট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

৭৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৫ খণ্ড),* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৭৬. সুকুমার বড়ুয়া, *ছড়াসমগ্র,* সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩।

৭৭. সুস্মিতা সোম, *বাংলা ছড়ায় বাঙলা দেশের ইতিহাস,* সোপান, কলকাতা, ২০১৫।

৭৮. সুশান্ত ঘোষ, *বাংলার রাজনীতি প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬।

৭৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা,* বিজয় সিংহ, তেহাই, কলকাতা।

৮০. *সুভাষ মুখোপাধ্যায়: কথা ও কবিতা,* সম্পাদনা- শঙ্খ ঘোষ, সৌরীণ ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

৮১. সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়,* প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২।

৮২. সুমিত ঘোষ, *ভারতের রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১৫।

৮৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *১৮৫৭ এবং তাঁর পর,* অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮।

৮৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ,* বিদ্যাপ্রকাশ, ঢকা, ১৯৯৩।

৮৫. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস(১৮৫৮-১৯৬৪),* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮৬. সৌগত চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদনা), *বাংলা ছড়া ছড়ার বাংলা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

৮৭. সৌমেন সেন, *লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪।

৮৮. সৌমেন সেন, *লোকসংস্কৃতির প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।

৮৯. স্বপন বসু, *গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০।

৯০. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *আলাপ-বিলাপ,* কোরক, কলকাতা, ২০১২।

৯১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলাদেশ: সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৪০৮।

৯২. শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, *'ভোটমঙ্গল, সজীব পুতলোনাচ'*, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১২৮৯।

সহায়ক গ্রন্থ(ইংরেজি):

1. C. R. Irani, *Bengali: The Communist challenge*, Bombay, 1968.
2. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1984.
3. Jyoti Basu, *Subversion of Parliamentary Democracy in West Bengal*, Calcutta, 1972.
4. Michel Edwards, *British India(1772-1947*), Rupa and co., Calcutta, 1993.
5. Partha Chatterjee, *The present History of West Bengal: Essays in political criticism,* Calcutta, 1998.
6. Prafulla Roy chaudhuri, *Left Experiment in West Bengal,* New Delhi, 1985.

7. Rakhahari Chatterjee, *politics in West Bengal: Institutions*, Process and Problems, Calcutta, 1985.

8. Sajal Basu, *Politics of Violence: a case study of west Bengal*, Calcutta, 1982.

9. Shamsuzzaman Khan(Editor), *Folklore, New Challenger*, The Proceedings of the International folklore Conference Dhaka, Bangla Academi, Dhaka, 2013.

10. Soumen Sen, *Folklore Tradition Urbanity,* Anjali Publishers, Kolkata, 2013.

11. Sukumar Biswas, *Communal Riots in Bangladesh and West Bengal(1947-1964),* Parul, Kolkata, 2012.

পত্রপত্রিকা

১. *দেশ, বিপ্লবের শতবর্ষ সংখ্যা,* সম্পাদক- সুমন সেনগুপ্ত, ২ নভেম্বর ২০১৭, কলকাতা।

২. *দেশ, প্রিয়দর্শিনী- ১০০(ইন্দিরা গান্ধি)বিশেষ সংখ্যা,* সম্পাদক-সুমন সেনগুপ্ত, ১৭ নভেম্বর, ২০১৭, কলকাতা।

৩. *দিবারাত্রির কাব্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা,* সম্পাদক- আফিফ ফুয়াদ, ২০০৫, কলকাতা।

৪. *সাপ্তাহিক বর্তমান, আমলাগাছি সংখ্যা,* ১৬ আগস্ট ও ৩০ আগস্ট ২০১৪, কলকাতা।

৫. *বিষয় কার্টুন, বিনয় কুমার বসু স্মরণ সংখ্যা,* সম্পাদক- বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, নবম বর্ষ, চৈত্র ১৪২২, কলকাতা।

৬. *শারদ সুকান্ত, 'বিষয়: পরিবর্তন' বিশেষ সংখ্যা,* ১৪/২ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া, ২০০৯।

৭. *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৮৭- ১৮৮।

৮. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ছড়া: বিষয় ও রাজনীতি সংখ্যা,* সম্পাদক- সনৎকুমার মিত্র, ১৪০০, কলকাতা।

সংবাদপত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* ১৩৩৪, কলকাতা।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* মাঘ ১৩৩৫, কলকাতা।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* পৌষ ১৩৩৬, কলকাতা।

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* কার্ত্তিক ১৩৪১, কলকাতা।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, *কংগ্রেস সংখ্যা,* ১৩৫৫, কলকাতা।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, ভোটের ছড়া শীর্ষক আলোচনা,* ২ এপ্রিল, ২০১৪, কলকাতা।

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, *ফিরে দেখা কুট্টির কার্টুন শীর্ষক বিশেষ আলোচনা,* ১ ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা।

৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, *গেল ভোট রইল দেওয়াল,* ২৩ এপ্রিল, ২০১৬, কলকাতা।

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, *জনগণমনতন্ত্র বিশেষ ক্রোড়পত্র,* ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮, কলকাতা।

১০. আনন্দবাজার পত্রিকা, *আনন্দদর্পণ, আমরা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা,* ১৩ মার্চ, ২০১৮, কলকাতা।

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, গান্ধি ১৫০ বিশেষ ক্রোড়পত্র,* ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, কলকাতা।

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা, *রবিবাসরীয়, তোমার ক্যাডার তুমি নাচাও শীর্ষক আলোচনা,* ১৯ মে, ২০১৯, কলকাতা।

১৩. এই সময়, কার্টুন, *ছড়ায় কোন্নগরের দেওয়াল ভরাচ্ছে তৃণমূল শীর্ষক প্রতিবেদন,* ৯ মার্চ, ২০১৬, কলকাতা।

১৪. বর্তমান, *কেমন ছিল অতীত দিনের নির্বাচনী প্রচার,* ৪ মে, ২০১৪ কলকাতা।

১৫. গণশক্তি, *নির্বাচনী ছড়া,* ৩০ মার্চ, ২০১৪, কলকাতা।

১৬. দৈনিক বসুমতী, *ভোটতামাশা,* ২ জানুয়ারি, ১৯৬৯, কলকাতা।

সহায়ক অভিধান গ্রন্থ

১. *আকাদেমি বানান অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

২. *সংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯।

৩. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২।

৪. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস(সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলা ভাষার অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৯।

৫. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি(সংকলিত), *বাঙ্গালা শব্দকোষ,* ভূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৯৭।

৬. রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা(আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান),* এম সি সরকার অ্যাণ্ড প্রা: লি: কলকাতা, ১৪০৫।

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮।